ডাল লেকে মাছ ধরার দৃশ্য

নাগিন লেক

কাশ্মীর পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীশক্তিময় বিশ্বাস

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

রম্যাণি বীক্ষ্য

কাশ্মীর পর্ব

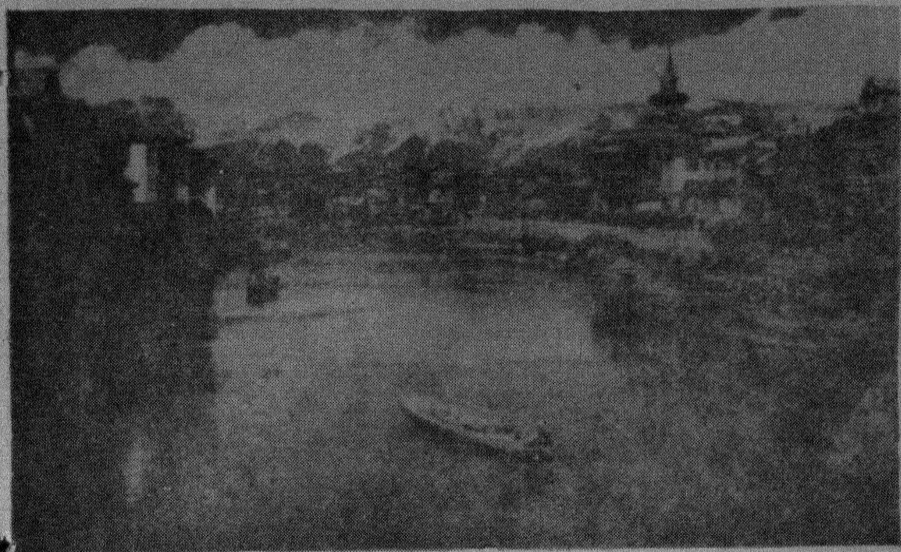
উৎসর্গ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

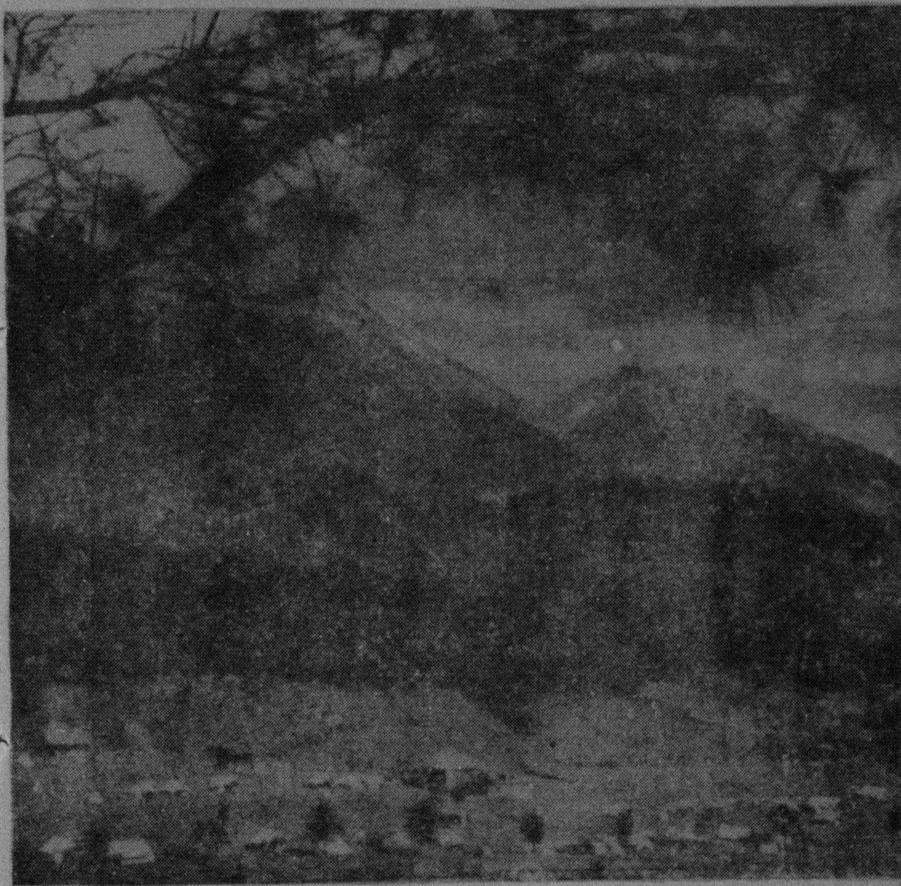
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।
যস্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা অরিষ্যতি
য ইৎ তদ্ বিদুস্ ত ইমে সমাসতে ॥
ঋ ১।১৬৪।৩৯, অ ৯।১০।১৮

The Eternal, of the hymn, existing on the supreme region
In which all Shining Ones have their being ;
What will he do with the hymn who does not know That ?
But those who have known That—they are perfect.
R. I.164.39. A 9.10.18



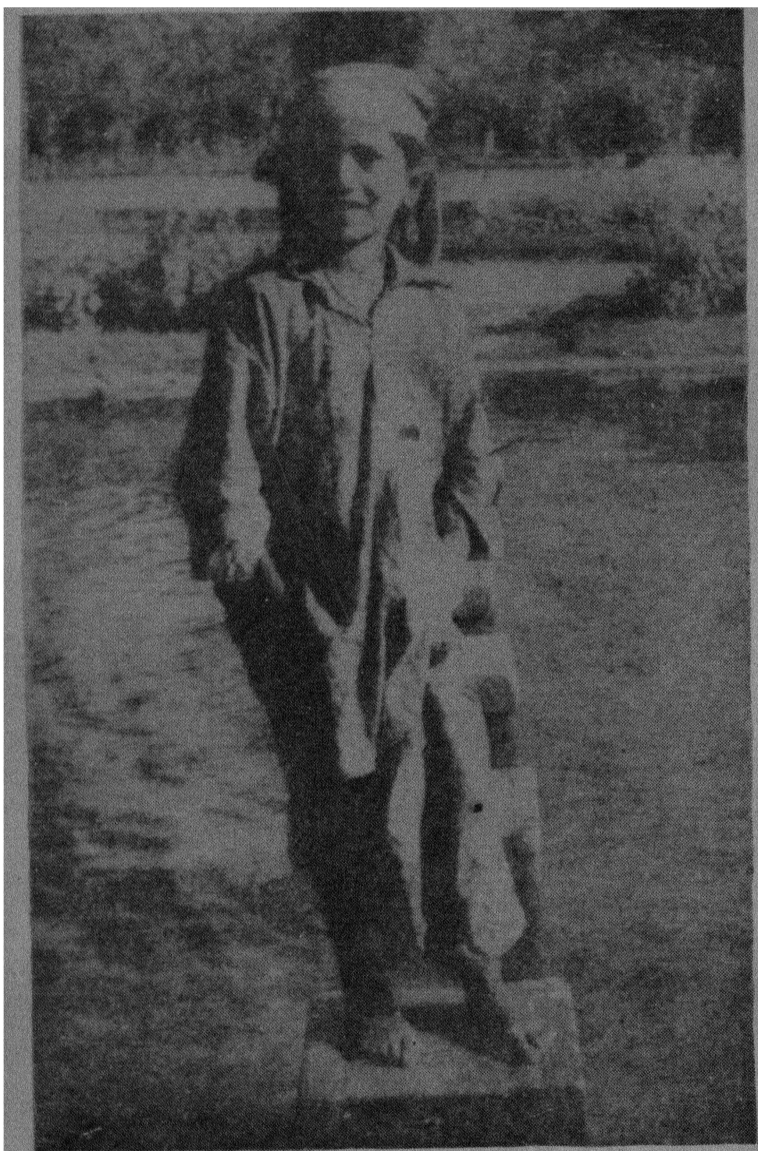
ঝিলমের তীরে শ্রীনগর শহর

ঝিলমের উপরে শ্রীনগরের সেতু



পহলগাম

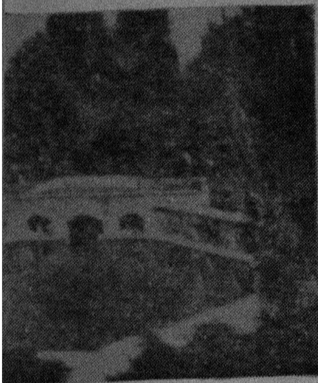
ফটো—সুধীন্দ্রকুমার বোস



কাশ্মীরকন্যা

পহলগামে লীডার নদী

মানসবল লেক



...রিনাগে ঝিলমের উৎস



কোলাহাই

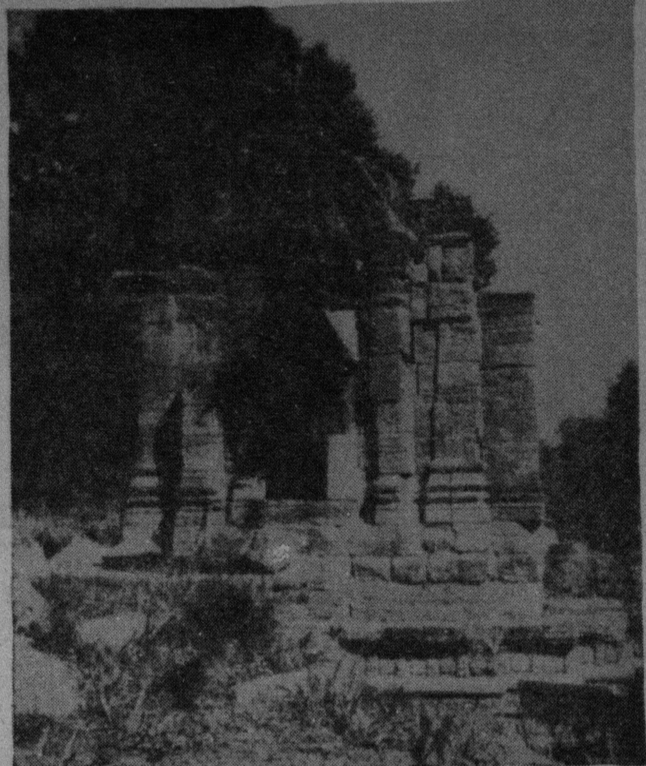
অমরনাথের পথে



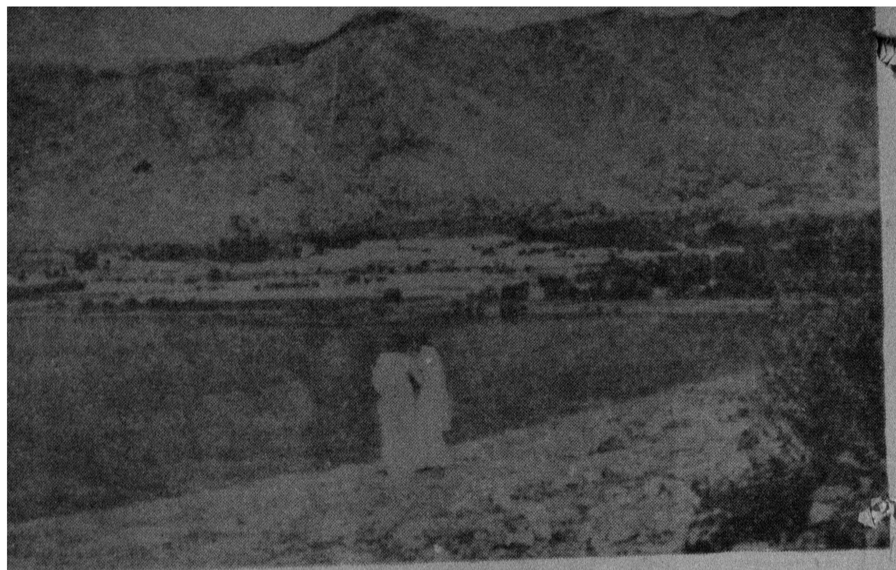
তুষার সেতু







পাটন



উলার লেক

ডাল লেকের একাংশ পিছনে শঙ্করাচার্য পাহাড়

জগতে দু জাতের মানুষ দু রকমের হিসাব রাখে। কেউ রাখে জমার হিসাব, কেউ খরচের। যারা শুধু জমার হিসাব রাখে, তারাই সংসারে সুখী। খরচের অলিখিত পাতায় জমার অঙ্ক শূন্য হয়ে গেলেও তাদের দুঃখ নেই। বলে, কী পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী। যারা অন্য জাতের, তারা তাদের জীবনের খাতায় শুধু দুঃখেরই হিসাব রাখে। তাদের ভাগ্যে সুখ জোটে না কোন দিন, অনেক পেয়েও তাদের সুখ নেই। স্বাতি আমাকে শেষের দলে ফেলেছে জেনে আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলুম: না, আমি প্রথম দলের লোক।

স্বাতিও জোর করে বলেছিল: না।

তারপর বলেছিল: এক দিন হয়তো ছিলে, এখন আর নও। এখন তুমি কী পেয়েছ, আর কী পাও নি, দুএরই হিসেব মেলাচ্ছ।

আমি বলেছিলুম: তবু ভাল।

কেন?

আমি ভেবেছিলুম, কী হারিয়েছি তুমি তারই হিসেবের কথা বলবে। খরচের হিসেব আমি রাখি না, আমি শুধু জমার হিসেবই রাখি। যারা বুদ্ধিমান, তারাই রাখে জমা ও খরচের হিসেব।

তাদের তুমি বুদ্ধিমান বল?

বলি বৈকি। তারাই তো জীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। জীবনে সার্থক মানুষ তারা।

যারা শুধু জমার বা খরচের হিসেব রাখে, তারা?

যারা শুধু জমার হিসেব রাখে, বুদ্ধিমানেরা তাদের বোকা বলে। আর কৃপণেরা রাখে শুধু খরচের হিসেব।

স্বাতি বলেছিল: নিজের কথাটা তুমি এড়িয়ে গেলে। আমি বলছি যে তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন সম্প্রতি খুব স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথা তোমার মনে পড়ছে? তুমি অফিস থেকে পালিয়েছিলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার জন্যে। কিন্তু বাড়িতে তোমার কিসের টান ছিল, আমি তা জেনে ফেলেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম: কিসের টান বল তো?

পড়ার। অনেক অধ্যব্যবসায় নিয়ে তুমি তখন পড়াশুনো করছিলে। তোমার থিসিসের জন্যে পড়াশুনো।

এ কথা আমি তাকে কোন দিন বলি নি। তাই সবিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম।

স্বাতি আমাকে সেই পুরনো গল্প মনে করিয়ে দিল। বলল: হাওড়া স্টেশনে তোমার লোকাল ট্রেন না পেয়ে তুমি ম্যাড্রাস মেল দেখতে এলে। আমরা গাড়িতে উঠেছিলুম, আর বাবা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রামখেলাওনকে খুঁজছিলেন। তোমাকে চিনতে পারলেন। তারপর—

তারপর আমি দেখলুম একটি সুন্দর ছিপছিপে মেয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: তখন থেকেই বুঝি হিসেব রাখতে শুরু করেছ!

হেসে বললুম: না। আকাশের চাঁদ দেখে কেউ হিসেব করে না। ও হিসেবের বাইরের জিনিস।

তবে?

চাঁদ যদি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে নিজে থেকেই ধরা দেয়, তবেই হয় হিসেবের শুরু।

স্বাতি বলল: আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকে। সে ধরা দেয় না। যা ধরা দেয় তা তার ছায়া।

বললুম: আমারও তাই মনে হয়।

কেন?

হাতের কাছে দেখি, অথচ হাত বাড়ালে নাগাল পাই নে

স্বাতি হেসে উঠেছিল খিলখিল করে। তারপরে আর কোন কথা

বলে নি। আর কিছু বলবার সময়ও পায় নি। কাংড়া উপত্যকায় বৈজনাথের মন্দির থেকে ডাকবাংলোয় ফেরার পথে আমাদের এই কথা হয়েছিল। অন্ধকার রাতে কাউকে না বলে স্বাতি মন্দিরে চলে এসেছিল। মামা মামী ব্যস্ত হয়েছিলেন। আর আমি মন্দিরে এসেছিলুম তাকে খুঁজতে। আমি জানতুম যে সে আর কোথাও যায় নি, সে মন্দিরে এসেছে বৈজনাথের আরতি দেখতে। ঠিকই বুঝেছিলুম। মন্দিরের একটা থামে হেলান দিয়ে সে চুপ করে বসে ছিল। আর ব্রাহ্মণেরা ভিতরে আরতির আয়োজন করছিলেন।

ভেবেছিলুম যে নিঃশব্দে আমি তার পাশে এসে বসব। কিন্তু তার আগেই সে বলল: তুমি কেন এলে গোপালদা?

তার অস্পষ্ট কথায় আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। সে কি আমার পদধ্বনি চেনে! তা না হলে সে কী করে আমার আগমনের কথা জানল! অনুভব!

তার পাশে একটু জায়গা দেখিয়ে বলল: তোমাকে ক্লান্ত দেখেই তো সঙ্গী হবার জন্যে ডাকলাম না।

মন্দিরে আসবার পথে অনেক দিন আগের কথা আমার মনে পড়ছিল। রামেশ্বরের আরতি দেখবার জন্য সেদিন আমরা দুজনে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলুম। সঙ্গে মামা মামী ছিলেন না, পথ দেখাবার জন্য একজন পাণ্ডা ছিল। তখনও আমাদের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয় নি। হাওড়া থেকে ম্যাড্রাস মেলে আমরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। আমি ছিলুম তৃতীয় শ্রেণীতে। ম্যাড্রাস শহর দেখেছি এক সঙ্গে, মহাবল্লীপুরম কাঞ্চীপুরম আর তিরুচিরপল্লীও দেখেছি এক সঙ্গে। তিরুচিরপল্লীতে আমাকে এক গাড়িতে উঠতে হল। মামা কিছুতেই অন্য গাড়িতে উঠতে দিলেন না।

সেই গাড়িতে আমি তাঁদের পরিচয় পেলুম। তাঁদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই। আমার মা মামার পাতানো বোন ছিলেন, তাঁদের মায়েরা সেকালের কায়দায় সই পাতিয়েছিলেন।

অসময়ে বাপ মাকে হারিয়ে আমার মা মানুষ হয়েছিলেন এই মামার বাড়িতে। তাঁর বিয়ের পরে আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমার বাবাই নাকি কোন সম্বন্ধ রাখতে দেন নি। তিনি অহংকারী ছিলেন, মামার মুখে আমি এই অভিযোগ সেদিন শুনেছিলুম।

মামী আমাকে ভাল চোখে দেখেন নি, আজও বোধ হয় দেখেন না। সে আমার দোষের জন্য নয়, আমার দারিদ্র্যের জন্য। তবে স্বাতির বিয়ে হয়ে গেলে তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতো সহজ আদরে গ্রহণ করতে পারবেন বলে মনে হয়। মামার ব্যবসা বাণিজ্য দেখবার জন্যে আর বুড়ো বয়সে তাঁদেরও দেখাশুনোর জন্যে আমার সাহায্য পেলে যে তিনি নিশ্চিন্ত হন, সে কথাও বুঝতে দিয়েছেন। কিন্তু এখন নয়। স্বাতির এখনও বিয়ে হয় নি। তার বিয়ের আগে আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তিনি আতঙ্কের চোখে দেখেন। তার কারণ আমি দরিদ্র, সমাজে আমার কোন প্রতিষ্ঠা নেই!

জীবনে দারিদ্র্য অভিশাপ নয়, সমাজে দারিদ্র্য অভিশপ্ত। কলকাতার অফিসে অসংখ্য কেরানীর সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করে মন, আমার সংকীর্ণ হয় নি, কোন অভাব বোধ আমার অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি। আমি আমার উত্তরপাড়ার সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও মুক্তির স্বপ্ন দেখেছি। তবু আমাকে কৃপার চক্ষে দেখে আমাদের সমাজ। সামান্য সহানুভূতি দেখিয়ে ভাবে মহত্ব দেখান হল। সমাজের এই ধারণা দেখে আমার হাসি পেয়েছে। আমি কেরানী বলেই এই হাসি গোপন করেছি। কিন্তু যদি কৃষক হতুম, কিংবা কারখানার মজুর, তাহলে প্রকাশ্যে হাসতুম। যাদের পরিশ্রমের ফসল খেয়ে তোমাদের দেহ পুষ্ট হচ্ছে, তোমরা কি তাদেরই কৃপার পাত্র নও! থাক সে কথা। আমি রামেশ্বরের আরতির কথা ভাবছিলুম।

মামী সেদিন স্বাতিকে আমার সঙ্গে একা ছেড়ে দেন নি। সঙ্গে একজন পাণ্ডা ছিল বলেই রাজী হয়েছিলেন। তারপর সেই কলেঙ্কারি হয়। মনে মনে নিজেকে আমি ধিক্কার দিয়েছিলুম।

বৈজনাথে স্বাতি একাই আরতি দেখতে এল। একাই ফিরত। মামা মামীর দুর্ভাবনার জন্যে আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। আজ মামী আমাকে ভয় পান নি। দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে সঙ্গী হিসাবে আমাকে বিশ্বাস করা যায়। দারিদ্র্যের সঙ্গে মনুষ্যত্বের যে দ্বন্দ্ব নেই, সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্বাতির সঙ্গে আমার আরও দু একটা কথা হয়েছিল। তাতে তার মনের পরিচয় খানিকটা পেয়েছিলুম। তার পাশে বসে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম: কাউকে বলে এলে না কেন?

অনুমতি!

বলে স্বাতি হেসেছিল। মন্দিরের স্বল্পালোকে আমি তার সেই হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম।

একটু থেমে সে বলেছিল: আর কত কাল আমাকে অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে হবে গোপালদা?

সহসা বেজে উঠেছিল মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা। বৈজনাথের আরতি শুরু হয়ে গিয়েছিল।

স্বাতি ওঠে নি। আমি বসে ছিলুম। কয়েক দিন আগের কথা আমার মনে পড়েছিল। চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে আমি যখন মসুরি পাহাড় থেকে ফিরছিলুম, মিত্রা আমাকে স্বাতির কথা বলেছিল। চাকরি নিয়ে স্বাতি নাকি স্বাধীন হবার কথা ভাবছে। সে কি এই অনুমতির প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে!

স্বাতি নাকি এ কথাও বলেছিল: মনের মিলনের জন্যে তো কোন উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই, অর্থ প্রতিপত্তি কেন তার প্রতিবন্ধক হবে!

মিত্রা তাই বলেছিল, স্বাতিকে যেন আমি কোন দিন ভুল না বুঝি।

তাকে ভুল বুঝবার এখন আর কোন উপায় নেই। স্পষ্ট ভাষায় সে আমাকে তার মনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সিমলার জাখু পাহাড়ে আমরা বেড়াতে উঠেছিলুম অতি প্রত্যূষে। পথে ঘাটে তখনও অন্ধকার জমে ছিল। শুধু আমরা দুজন, আর কেউ আমাদের সঙ্গে

ছিল না। উত্তরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। সামনে তুষারমৌলি হিমালয়ের অপরূপ বিস্তার। কোথাও বরফ, কোথাও মেঘ, কোথাও বা তুয়ে মিলে এক মায়াময় রূপ। আমরা শিশির ভেজা ঘাসের উপরেই বসে পড়েছিলুম।

সঙ্গে চা ছিল ফ্লাস্কে। চা খাবার পরে স্বাতি আমাকে সেই মর্মান্তিক কথা বলল। তার জন্যে সে কোন ইতস্তত করল না, কোন ভূমিকাও না। অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল: তুমি ঠিকই শুনেছ যে আমি স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করছি। কেন করছি, তাও বোধহয় বুঝেছ। সে বাবা মার সম্মানের জন্যে। লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে থাকলে তাঁরা বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হবেন। অথচ বিনা দ্বিধায় বিয়ে করতে পারি, এমন মানুষের দেখা কি আজও পেয়েছি!

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলুম, জলভরা মেঘের মতো থমথম করছে তার মুখ। খানিকক্ষণ থেমে বলেছিল: আমি তোমাকে ভালবাসি গোপালদা, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার কথা কোন দিন ভাবতে পারি না।

কেন, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি। স্বাতি নিজেই সে কথা বলেছিল: আদর্শের জন্যে নিজের সুখ তুঃখ স্বার্থ ত্যাগ করা চলে। কিন্তু দেবতার মতো পিতামাতা সকল আদর্শের ঊর্ধ্বে। তাঁদের অসম্মান করে তো কল্যাণ হবে না।

আমি এ কথা সমর্থন করতে পারি নি, প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তিও খুঁজে পাই নি। তারপরে স্বাতি নিজেই সব কিছু এলো-মেলো করে দিয়ে বলেছিল: কিছু দিন আগে আমি তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠি তুমি ফিরে গিয়ে পাবে।

কী লিখেছিলে?

তোমাকে দিল্লী আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। লিখেছিলাম যে তুমি সঙ্গে না থাকলে এবার আমরা বেড়াতে বেরব না।

কেন?

'এ কথাও কি আমাকে বলতে হবে গোপালদা।'

বলে স্বাতি তার একখানা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'এস, ক্ষিদে পেয়েছে খুব। এতক্ষণে বোধহয় ফুচকা আর হিঙের কচুরি দুই-ই তৈরি হয়ে গেছে।

আমি বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়েছিলুম। স্বাতির দৃষ্টি বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। পায়ে তার পাহাড়ী ঝর্ণার ছন্দ, আবেগ সমুদ্রের মতো। আমি তার কোন কূল দেখতে পাই নি।

এই পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় তো বেশি দিনের পুরনো নয়। পুজো এলে দু বছর পূর্ণ হবে। পুজোর আর বোধহয় কয়েকটা দিন বাকি। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে এই দু বছর আমাদের কাছে অনেক বছর বলে মনে হচ্ছে। আমাদের জীবনের স্রোত যেন কিছুতেই এগোচ্ছে না।

সেদিন রাতে আমি এই কথা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। খুঁটিনাটি অনেক ঘটনা মনে করবার চেষ্টা করেছি। তারপরে আশ্চর্য হয়েছি। দু বছরে যা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটলে তা নাটকীয় মনে হত।

দু বছর আগের পুজোয় আমরা কয়েক দিন সমগ্র দক্ষিণ ভারত ঘুরেছি। কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী, ফিরেছি মহিসুর হায়দ্রাবাদ অজন্তা ইলোরা হয়ে, গোটা দাক্ষিণাত্যটাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ফেলে। বসন্তে এসেছিলুম দিল্লীতে, বড়লোকের পোষ্যপুত্র হবার জন্য মামা আমাকে ডেকে এনেছিলেন। সেই সুযোগে এলাহাবাদ আর মথুরা বৃন্দাবন দেখেছি কালিন্দী যমুনার তীরে। তার পরের পুজোয় আবার আমাকে বেরতে হয়েছিল। জয়পুর থেকে মামা আমাকে 'তারে' ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজস্থান আর সৌরাষ্ট্র দেখেছি। দেশে ফিরেছি মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে। শীতকালে গিয়েছিলুম উৎকলে। মামা আমাকে স্বাতির

বিবাহে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে তাঁরা কলকাতায় পৌঁছবেন বড় দিনের সময়। আমি স্থির থাকতে পারি নি, আত্মরক্ষার জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিলুম। এ যে আমার দুর্বলতা তা জানতুম, কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা পাই নি।

এবারের পূজোয় এই যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিক। এবারে আমি স্বাতির চিঠি পেয়ে বেরুই নি, মামার কাছ থেকেও কোনও 'তার' পাই নি। এবারে উত্তর ভারত দেখতে বেরিয়েছিলুম বন্ধু মনোরঞ্জনের সঙ্গে। মসুরি গিয়েছিলুম এক ভদ্রলোকের কথায়। সেইখানেই দেখা হয়ে গেল চাওলী ও মিত্রার সঙ্গে। তারাই আমাকে দিল্লীতে ধরে আনল। স্বাতিরা ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়েছিল। পাঞ্জাব হিমাচল আর কাশ্মীর ভ্রমণ। কাংড়ায় হিমাচল ভ্রমণ শেষ হয়েছে। এবারে কাশ্মীর। বৈজনাথ থেকে আমরা কাশ্মীরে যাব।

ডাকবাংলোর বারান্দার রেলিং ধরে মামী দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর মামা পায়চারি করছিলেন বাহিরে। ধবলাধারের দেহে অন্ধকার মেঘ আটকে ছিল, কিন্তু বৃষ্টি আর পড়ছিল না। ভিজে পথ, ভিজে মাটি, বাতাসও ভিজে ভিজে। গরম জামা গায়ে দিয়েও অল্প অল্প শীত করছে। আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে আসতে দেখে মামা প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, বললেন: এস এস।

মুখ বাড়িয়ে মামী বললেন: কী মেয়ে বাবা!

আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে হাসলুম।

আর স্বাতি বলল: বৈজনাথের আরতি দেখে এলাম।

২

অতি প্রত্যূষে আমরা বৈজনাথের বাস স্ট্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলুম।

অন্ধকার থাকতেই আমাদের উঠতে হয়েছিল, ঘরের বাতি জ্বেলে আমরা তৈরি হয়েছিলুম। বেয়ারা কুলি ডেকে দিয়েছে, কিন্তু চা দিতে পারে নি। বলেছিল, একটু অপেক্ষা করলেই পারবে।

কিন্তু বাস! বাস তো চায়ের জন্যে অপেক্ষা করবে না!

বেয়ারা বলেছিল, বাস থামাবার ভার সে নিতে পারবে। ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে পথ যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেই মোড়ে সে বাস থামাতে পারে। যাত্রীদের জন্যে সে তাই করে থাকে। কিন্তু মামা বললেন: ওসব কায়দা কানুনের দরকার নেই। কতটুকু আর পথ! আমরা বাজারে গিয়ে স্ট্যাণ্ডেই বাসে উঠব।

মামাকে সমর্থন করে আমি বললুম: সেখানেও চায়ের দোকান আছে। সময় পেলে দোকানেই চা খেয়ে নেব।

কিন্তু মামীর একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারলুম না। এত ভোরে এখান থেকে বেরবার কী দরকার ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর। পাঠানকোটে পৌঁছে আমরা যখন শ্রীনগরের বাস ধরতে পারব না, তখন ধীরে সুস্থে বেরলেই চলত। মামীর আক্ষেপের আসল কারণ অন্য, বললেন: বাবা বৈজনাথের পায়ে পূজো দেওয়া হল্ না। হবে কী করে! তোমাদের পাল্লায় পড়ে জাত ধর্ম তো চুলোয় গেছে!

মামা বললেন: তবে আর কী, চল তাহলে ফিরে যাই। বৈজনাথের পূজো দিয়ে পেট ভরে প্রসাদ খেয়ে বেরনো যাবে।

মামীর অভিযোগ স্বাতি মেনে নিয়েছিল, বলল: গোপালদার জন্যেই এই রকম হল। এখান থেকে দুপুরবেলা বেরলেও চলত।

মামা বললেন : গোপালের দোষ দিও না, এ তো তোমারই ব্যবস্থা।

নির্বিকার ভাবে স্বাতি বলল : গোপালদাই তো প্রথম থেকে ভুল করেছেন। কাংড়া উপত্যকায় বেড়াতে হলে প্রথমেই আসতে হয় ধরমশালায়, সেখান থেকে জ্বালামুখী। ফেরার পথে কাংড়া দেখে বৈজনাথ। তারপর মণ্ডি হয়ে কুলু উপত্যকা। এই ব্যবস্থা না করে গোপালদা প্রথমেই গেলেন জ্বালামুখী, অকারণে কাংড়ায় বাস বদল করতে হল। ধরমশালা থেকে বৈজনাথ আসতেও আবার কাংড়ায় বাস বদল।

সত্যিই আমি এ ভুল করেছিলুম। কিন্তু মামা স্বাতিকে বললেন : এবারের দায়িত্ব তো তোমার ওপরেই ছিল, গোপালকে দায়ী করলে মানব কেন!

আমাদের মালপত্র বাসের মাথায় উঠেছিল। সময় ছিল কয়েক মিনিট। চায়ের দোকানে জল গরম হচ্ছে দেখে যাত্রীরা অনেকেই সেখানে ভিড় করেছে। আমরাও কথা বলতে বলতে চায়ের অপেক্ষা করছি। এ অভিযোগের উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল : গোপালদার জন্যেই আমাদের কুলু মানালি দেখা হল না। রাস্তা ভাল নয় শুনেই ভয়ে পিছিয়ে গেল।

চা-ওয়ালা চায়ের ভাঁড় একে একে এগিয়ে দিচ্ছিল। মামাও এক ভাঁড় চা হাতে নিয়ে হেসে বললেন : সকাল বেলাতেই মেয়ের মেজাজ খারাপ হয়েছে কেন!

মামী তাঁর আঁচলের তলা থেকে বিস্কুটের একটা প্যাকেট বার করে বললেন : খালি পেটে গরম চা খেও না।

বলে একে একে সকলের দিকেই এগিয়ে দিলেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ লুকিয়ে হাসল।

যথাসময়ে আমাদের বাস ছাড়ল। গদি-আঁটা নূতন ধরনের বাস। যে রকম সেকেলে বাসে আমরা পাঠানকোট থেকে এসেছিলুম, তাতে

এ অঞ্চলে এ রকমের আরামপ্রদ বাসে চড়বার আশা করি নি। মামা সবার চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিলেন। চোখ বুজে পাইপ টানতে লাগলেন।

দেখতে দেখতেই বৈজনাথের ছোট বাজার ও লোকালয় শেষ হয়ে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নামতে লাগলুম।

এক সময় স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল: দেখেছ গোপালদা, সেই নদী।

আমি চমকে চেয়ে দেখলুম, একটি ছোট নদী খাদের ভিতর দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে। অল্প জল, কিন্তু স্রোত তীব্র। বাসের গর্জনের ভিতর তার কলধ্বনি আজ শুনতে পেলুম না।

কাল সায়াহ্নে ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা মেঘের গর্জনের মতো একটা ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম। একটানা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। সামনে ধবলাধারের নগ্ন দেহ। বরফ গলে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ হয় নি। তরু-লতা-গুল্মহীন পাহাড়ের এও এক অপরূপ রূপ, তপোমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো। শীতে তুষারে ধবল হবে, তখন তার অন্য রূপ দেখব। চোখের সামনে আজ এক গভীর খাদ দেখতে পাচ্ছিলুম। খানিকটা এগিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে এই চঞ্চল স্রোতস্বিনীকে দেখতে পেয়েছিলুম। ছোট বড় পাথরের উপর দিয়ে নেচে নেচে চলেছে। আনন্দে তার কলধ্বনির শেষ নেই।

পশ্চিমে আমরা পাঠানকোটের দিকে ফিরে যাচ্ছি। পূবের পাহাড় ডিঙোলে আমরা মণ্ডি রাজ্যে পৌঁছতে পারতুম। ধরমশালার টুরিস্ট বাংলোয় মিস্টার ঘোষ আমাদের এই পথের কথা বলেছিলেন। বৈজনাথ থেকে ঘাট্টা পর্যন্ত তিন মাইল পথ ক্রমাগত উপরে উঠেছে। ওপারে মণ্ডি রাজ্য হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। বৈজনাথেই কাংড়া উপত্যকার শেষ। পনর মাইল দূরে যোগীন্দ্রনগরে লোকে হলেজ ওয়ে দেখতে যায়। পাহাড়ের এ পাশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউস, ও পাশে জলের বিরাট আধার। একটা পনর হাজার ফুট লম্বা টানেল দিয়ে সেই জল পাওয়ার হাউসে আসছে। এই আট

হাজার ফুট উঁচু পাহাড় স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করবার জন্য লোহার রেলের উপর দিয়ে ইলেকট্রিকে ট্রলি চলাচল করে। শখ করে যাত্রীরাও চড়ে। পাহাড়ের মাথায় উঠে চারি দিকের শোভা দেখে তারা মুগ্ধ হয়।

এখান থেকে মণ্ডি শহর পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বিপাশার তীরে। হিমাচল প্রদেশের এটি একটি বড় শহর। তার পরের পথ মনে হবে স্বপ্নের মতো সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। পঁচিশ মাইল পর্যন্ত বিপাশার দুই তীরেই কঠিন পাহাড় খাড়া উঠেছে হাজার হাজার ফুটেরও বেশি। এখানে কোন পথ তৈরি হতে পারে, এ কথা কেউ কল্পনাও করে নি। আগে তাই কুলু যাবার অন্য পথ ছিল। মণ্ডি পৌঁছবার আগেই নুনের খনির পাশ দিয়ে ভুবু পাস আর ডুলচি পাস হয়ে হাঁটা পথ।

এখন বিপাশার তীরে তীরে যে পথ তৈরি হয়েছে, তার উপরেও স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। একটি গাড়ি চলবার মতো সংকীর্ণ পথ, একটু অসাবধান হলেই গাড়ি বিপাশার জলে পড়ে যাবে।

তারপর কুলু উপত্যকা কিছু প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু কাংড়ার মতো নয়। বিপাশার এধারে ওধারে এক থেকে দু মাইল। বাজৌরায় এই নদীর ধারেই বশেশর মহাদেবের মন্দির। যাত্রীরা এই মন্দিরের কারুকার্য দেখে আশ্চর্য হয়।

কুলুতে দেখবার কিছু নেই। একটা ছোট সাবডিভিসনাল হেড কোয়ার্টারে যা থাকা উচিত তাই আছে। আফিস কাছারি হাসপাতাল আর বাজার। আর একখানা মস্ত সবুজ মাঠ বিপাশার তীরে উঁচু পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এইটিই কুলুর প্রাণ। সারা বছর এই মাঠে গরু চরে, আর দশেরার সময় হয় এই মুলুকের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসব দেখেই সাহেবরা এই উপত্যকার নাম দিয়েছে ভ্যালি অফ গডস্। হিমালয়ে এত বড় মেলা কোথাও হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতা আসে লাদাখ ও ইয়ারখন্দ থেকেও। সুসজ্জিত পালকিতে চেপে বিচিত্র সব দেবতাও আসেন। সঙ্গে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, কথাবার্তা নৃত্যগীত সবই

বিচিত্র। এই উৎসব শুরু হয় নি বলেই কুলু না দেখে আমরা ফিরতে পারলুম।

মিস্টার ঘোষ আমাদের এই উপত্যকার আরও অনেক জায়গার নাম শুনিয়েছিলেন। রায়সন ও কাটরাইনের ফলের বাগান ও ট্রাউট মাছের হ্যাচারি, নাগরের মন্দির, মণিকরণের উষ্ণ প্রস্রবণ, গুজরদের গ্রাম চান্দেরখনি ছাড়িয়ে সেই আদিম জাতির দেশ মালানা। মানালি কুলু থেকে তেইশ মাইল উত্তরে। এক দিকে বিপাশা, অন্য দিকে মানালসু নদী। ফলের বাগান আর বরফের পাহাড়। কিছু দূরে হিড়িম্বার মন্দির।

রোটাং পাস পর্যন্ত আজকাল পথ তৈরি হয়েছে। পথে গন্ধকের প্রস্রবণ বশিষ্ঠ কুণ্ড, ব্যাসঋষি শৃঙ্গ। তারপরে লাহৌল ও স্পিতি উপত্যকা। হিমাচল ভ্রমণের সময় আমরা এই সব জায়গার গল্প মিস্টার ঘোষের কাছে শুনেছিলুম।

প্রভাতের প্রথম রৌদ্র তখন পথের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসের শিহরণ যাচ্ছে ফুরিয়ে। যাত্রীদের কেউ উপত্যকার শোভা দেখছেন দু চোখ ভরে, কেউ এই মধুর পরিবেশের আবেশ উপভোগ করছেন চোখ বুজে। আমার মন কুলু থেকে কাংড়ার উপত্যকায় এল ফিরে। ডান দিকের প্রান্তর পেরিয়ে নীল ধবলাধার প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মতো মাথা নয়, আকাশের মতো মাথা। তার শেষ নেই। বৈজনাথে দেখেছি, এখনও দেখছি। আরও কত দূর দেখতে পাব তা মনে পড়ছে না।

সহসা স্বাতি কথা কইল, বলল: কী ভাবছ গোপালদা?

আমি কোন প্রশ্ন শোনবার জন্য তৈরি ছিলুম না। উত্তর দিলুম: কী ভাবব, তাই ভাবছি।

মামা আমার পাশে বসে ছিলেন। আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন।

আমি অপ্রস্তুত হই নি এই কথা প্রমাণ করবার জন্য বললুম: সত্যি কথা আজকাল হাসির কথা বলে মনে হয়।

কেন ?

মিথ্যা কথা শোনায় লোকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মামা প্রতিবাদ করলেন না, বললেন : তা নেহাৎ মিথ্যে বল নি।

স্বাতি বলল : তাহলে এবারে কী ভাববে তাই বল।

বললুম : যে কথা মনে আসছে, সে আমার ভাবনা নয়।

কী মনে আসছে ?

পাঠানকোটে পৌঁছে আমরা কী করব ?

স্বাতি তৎপর ভাবে উত্তর দিল : রিটায়ারিং রূমে উঠব।

তারপর ?

স্বাতি বলল : বুঝেছি। কাশ্মীরে যাওয়া হবে, না অন্য কোথাও, সেই কথা ভাবছ।

মামী বললেন : আবার অন্য কোথায় যাবে ?

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা বললেন : যাবার জায়গা আছে। কী উপত্যকা তার নাম ?

স্বাতি বলল : চাম্বা।

আমি কোন কথা বললুম না। মামাও নীরব হয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি আবার বলল : ডালহৌসি যাওয়া হবে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে।

মামী বললেন : না না, আর কোথাও নয়। সোজা কাশ্মীরে চল।

চাম্বার গল্প আমরা দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের কাছে শুনেছি। কাংড়া থেকে জ্বালামুখী যাবার পথে তিনি আমাদের অপরূপা চাম্বার কথা শুনিয়েছেন। ডালহৌসি থেকে হেঁটে তিনি চাম্বা গিয়েছিলেন।

পাঠানকোট থেকে ডালহৌসির দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক ছিল। দু দিক থেকেই বাস প্রায় এক সঙ্গে ছাড়ত, তারপর ডুনেরা নামে একটা জায়গায় এসে দু দিকেরই বাস দাঁড়াত। আধ ঘণ্টা দাঁড়াবার পর দু দিকেরই বাস ছেড়ে যেত। ডালহৌসি পৌঁছতে পাঁচ মাইল বাকি থাকতে বানিখেত নামে একটা জায়গা আছে।

এইখান থেকে চাম্বার পথ শুরু হয়েছে। ডালহৌসি থেকে কালাটপ খাজ্জিয়ার হয়ে যে পথ, সে আরও সুন্দর, আরও রমণীয়।

ধবলাধারের উপর পাঁচটি পাহাড় নিয়ে ডালহৌসি শহর। পাঁচ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু। এই শৈলাবাসটিও গোরা সৈন্যের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল। উত্তরে বরফের পাহাড় দেখা যায়, আর দক্ষিণে সমতল ভূমি। পরিষ্কার দিনে নাকি ইরাবতী শতদ্রু ও বিপাশার ক্ষীণ ধারাও দেখা যায়। নির্জন শান্ত সুন্দর শহর। সমগ্র উপত্যকাটাই সুন্দর। সাহেবরা এর নাম দিয়েছিল ভ্যালি অফ মিল্ক অ্যাণ্ড হানি।

দেবপ্রসাদের কাছে গল্প শুনে এই অঞ্চলটা দেখবার শখ আমার প্রবল হয়েছিল। তবু আমি আমার মনের কথা গোপন করে গেলুম। মামীকে খুশী করবার জন্য বললুম ঃ চাম্বার গল্প তো আমরা শুনেছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি এই হাসির অর্থ বুঝি। আমার দুর্বলতার কথা সে জানে।

এক সময় আমাদের বাস এসে পালমপুরে দাঁড়াল। বৈজনাথ থেকে মাত্র এগার মাইল পথ। উঁচুতে সমান, প্রায় চার হাজার ফুট। ছোট লাইনের ট্রেন দেখেছি। আর দেখলুম বাজার, জনবহুল ও অপরিচ্ছন্ন। এর চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন দেখেছি ধরমশালা। শৌখিন শৈলাবাস। শুধু বৃষ্টির জন্য বিরক্তিকর মনে হয়েছে। শরৎকালে বর্ষা আমরা পছন্দ করি না।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস আবার চলল। চা বাগানের মধ্য দিয়ে পথ। এ পথ আমাদের পরিচিত। পালমপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে গগ্‌গালের চৌরাস্তা। কিন্তু আমরা সোজা যাব না। কাংড়ায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বড় রাস্তায় ফিরে আসব। তারপর ধরমশালার দিকে নয়। পালমপুর থেকেও ধরমশালার সোজা পথ আছে। আমরা সদর রাস্তা ধরে পাঠানকোটে ফিরব।

কাংড়া উপত্যকার প্রশস্ত পথ ধরে আমরা পশ্চিম মুখে চলেছি।

উত্তরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার এখনও শেষ হয় নি। পাহাড়ে বরফ থাকলে সূর্যকিরণে এখন ঝলমল করত। বরফ নেই বলে দুধারের শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমার সঙ্গে অবাধে মিশে গেছে। এই উপত্যকায় বুনো ফুলের সমারোহ। ফুল কুলু উপত্যকায়, ফলও সেখানে।

বাস যখন কাংড়ায় এসে দাঁড়াল আমি টপ করে নেমে পড়লুম।

মামা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন: নামলে কেন?

কেন নেমেছি তা স্বাতি বুঝতে পেরেছে। তার দৃষ্টি দেখলুম সেই পকোড়ার দোকানের দিকে নিবদ্ধ। আমি চায়ের হুকুম দিলুম, আর এক ঠোঙা গরম পকোড়া। মামী এ সব পছন্দ করেন না জানি, কিন্তু মামা প্রশ্রয় দেন। তাঁর কথা আমার মনে আছে। জ্বালামুখী থেকে ধরমশালা যাবার পথে যখন ঐ দোকানটায় পকোড়া কিনেছিলুম, তখন মামীর কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: ও রসে তো তুমি বঞ্চিত গিন্নী, বাড়িতে ওর অনুপান তুমি যোগাবে কী করে! ঐ টক ঐ ঝাল আর ঐ মশলা!

কাংড়ার বজ্রেশ্বরী মন্দির এখান থেকে দেখা যায় না। এই মন্দির দেখতে হলে বাজারের রাস্তা ধরে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। সেই অপূর্ব দৃশ্যের কথা আমার মনে এল। এমন অপরূপ শোভা আগে কখনও দেখি নি। মনে হল যেন মন্দির মিলিয়ে আছে ধবলাধারের কোলে, যেন মন্দিরের পিছন থেকেই উঠেছে ধবলাধার। পাহাড়ে তুষার নেই। সাদা নীল আর গৈরিকে যেন তপস্বীর বৈরাগ্য। লঘু মেঘ উত্তরীয়ের মতো জড়িয়ে আছে।

বাণ গঙ্গার তীরে প্রাচীন দুর্গও এখান থেকে দেখা যায় না। এই দুর্গ ছিল হিন্দু রাজাদের। আর কাংড়ার নাম ছিল নগরকোট। সোমনাথের মতো নগরকোটের ঐশ্বর্যেরও খ্যাতি ছিল দেশে বিদেশে। একাদশ শতাব্দীতে আনন্দপালকে যুদ্ধে পরাজিত করে গজনীর সুলতান মামুদ নগরকোট লুণ্ঠন করেছিলেন। কত শো মন সোনা রূপো আর হীরে জহরৎ নিয়ে গিয়েছিলেন,

তার হিসাব ফেরিস্তা দিয়েছেন। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করতে পারে না।

কাংড়া থেকে জ্বালামুখীর দিকে আমরা গেলুম না। একুশ মাইল দূরে জ্বালামুখীর মন্দির আমরা দেখে এসেছি। কালীধর পাহাড়ের উপর মন্দির। পীঠস্থান, সতীর জিহ্বা পড়েছিল এখানে। শিবের নাম উন্মত্ত ভৈরব। নির্জন পরিবেশের মধ্যে একটি নিচু মন্দির তেমন প্রাচীন বলেও মনে হয় না।

আগুনের শিখা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম। মন্দিরের দেওয়ালে নানা জায়গায় আগুন জ্বলছে। ভিতরে একটা ছোট কুণ্ড, তারও চারি দিকে আগুন। কোন মূর্তি নেই, চিত্র নেই, কোন ঘট মঙ্গল-কলসও নেই। আগুনের শিখা দেখিয়ে ব্রাহ্মণ আমাদের বলেছিলেন ঃ এই দেবী জ্বালামুখী, এইখানেই প্রণাম করুন।

কাংড়া থেকে বাস ছেড়ে গগ্‌গলে একবার দাঁড়াল। শাহপুর নুরপুরেও দাঁড়াল কিছুক্ষণের জন্য। যেখান থেকে ডালহৌসির পথ বেরিয়েছে, সে জায়গাটাও আমরা চিনতে পারলুম। তারপর পাঠান-কোট এসে পৌঁছলুম। কাংড়া থেকে পঞ্চাশ মাইলের পথ রৌদ্র প্রখর হবার আগেই ফুরিয়ে গেল।

৩

পরদিন প্রভাতের প্রথম বাসে আমরা কাশ্মীর যাত্রা করলুম।

বাসে স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে সভ্য সমাজের রীতি নীতি অনুসরণ করা হয় না। কোন নির্দিষ্ট আইন কানুন নেই। যুদ্ধ করে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। আগের দিন টুরিস্ট অফিসার বলেছিলেন যে তিনটি কোম্পানীর বাস ছাড়ে। অনেক বাস। জায়গার অভাবে কাউকে পড়ে থাকতে হয় না। এ কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু যা সত্য তা শুনেছিলুম রাতে রেলের রেস্টরেণ্টে ডিনার খাবার সময়। একজন বেয়ারা বলেছিল ঃ সকালের প্রথম বাস ধরবেন, তাহলে এক দিনেই শ্রীনগরে পেঁৗছে যাবেন।

মামা প্রশ্ন করেছিলেন ঃ তার মানে ?

তার মানে সরল। পরে যে বাসগুলো ছাড়ে, সেগুলো এক দিনে শ্রীনগরে পেঁৗছয় না। পথে একটা রাত কাটাতে হয়।

এই সংবাদ পেয়ে মামা বিচলিত হলেন, বললেন ঃ না না গোপাল, পথে রাত কাটাতে আমি রাজী নই, আমাদের এক দিনেই পেঁৗছতে হবে। দরকার হলে একখানা স্টেশন ওয়াগন ভাড়া কর।

বেয়ারা আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিল ঃ রাত কাটাতে কষ্ট আপনাদের হবে না। বাস যেখানে থাকবে সেখানেই হোটেল আছে, ডাকবাংলো আছে।

মামা বললেন ঃ চুলোয় যাক হোটেল আর ডাকবাংলো। আমাদের এক দিনেই পেঁৗছতে হবে।

রেস্টরেণ্ট থেকে বেরিয়ে মামা মামী রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আর স্বাতির সঙ্গে আমি ট্রান্সপোর্ট অফিসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। তাদের দরজায় তালা ঝুলছে। সকালের আগে আর খুলবে

না। খাঁটি খবর কুলিদের কাছেই পাওয়া যায়। তারা বলল : প্রথম বাস ছাড়ে কলকাতা থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেস এসে পৌঁছবার পরেই। তখন এসে টিকিট কাটবেন।

এ কথা শুনে মামা বললেন : ও ট্রেন আসবার আগেই টিকিট কাটব। স্টেশনে ফিরে টাইম টেবল খুলে দেখলুম যে পাঠানকোট এক্সপ্রেস ভোর রাতে এখানে আসে। তাই আবার আমাদের শেষ রাতে উঠতে হবে। অত সকালে কপালে চা জুটবে কিনা জানি না, একবার বাসে চাপলে হয়তো মুখ শুকিয়ে বসে থাকতে হবে। মামী বললেন : একখানা পাঁউরুটি কিনে রাখলে মন্দ হত না। মাখন আর কলা আছে, আপেলও কিনে নেওয়া যাবে।

আবার আমি প্ল্যাটফর্মে এসে চায়ের দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে আনলুম। প্ল্যাটফর্মের এই দোকানটি নাকি ভোর বেলাতেও খোলা থাকে, কাজেই চা পাওয়া যাবে। স্বাতিকে বললুম : তোমরা চা খেয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এস।

রাতে আমি অকাতরে ঘুমিয়েছিলুম। আমাকে জাগিয়েছিলেন মামা নিজে। পাশের ঘরে মামী ও স্বাতিকেও ডেকে তুলেছিলেন। বাতি জ্বেলে আমরা বেরবার জন্য তৈরি হয়েছিলুম। তারপরেও হাতে সময় ছিল।

কুলিরা আসছিল না বলে মামা ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি গিয়ে তাদের ডেকে আনলুম। বললুম : স্টেশনের স্টলে আপনারা চা খেয়ে আসুন। আমি মালপত্র নিয়ে এগোচ্ছি।

মামা বললেন : না না, তার দরকার নেই। আগে টিকিট কাটা যাক, পরে সময় থাকলে চা খাব।

কাজেই সকলে মিলে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এলুম।

যে কোম্পানীর বাস সকলের আগে ছাড়বে, তার অফিস খোলা আছে। বাহিরে কিছু যাত্রী। কিন্তু ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে

কাউকে দেখতে পেলুম না। পাঠানকোট এক্সপ্রেস তখনও এসে পৌঁছয় নি, পৌঁছবার সময় হয়েছে। অথচ ঘরে কেউ নেই শুনে মামা চটে উঠলেন, বললেন : অসভ্যদের কাণ্ড দেখেছ !

মামী বললেন : গাল দিচ্ছ কেন ?

গাল দেব না তো কি আদর করব ! ট্রেনখানা এসে পড়লে কি আর টিকিট কাটতে পারব !

হঠাৎ দেখতে পেলুম যে একজন যাত্রী এসে ঘরের ভিতরে কিছু লিখে রেখে বেরিয়ে এল। মামা তখন কুলিকে তাড়া দিচ্ছিলেন : তোমাদের লাটসাহেব কখন আসবেন ?

একজন কুলি নির্বিকার ভাবে বলল : নাম তো লিখে দিয়েছেন. তবে আর ভাবনা কেন !

এ কথা শুনে আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করলুম না। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লুম। টেবিলের উপর একখানা সাদা কাগজ একটা পেনসিল দিয়ে চাপা ছিল। তাতে পর পর কয়েকটা নাম। বুঝতে কষ্ট হল না যে আমাকেও এইখানে নিজের নাম আর টিকিটের সংখ্যা লিখে দিতে হবে। খস খস করে আমি মামার নাম আর পাঁচখানা টিকিটের কথা লিখে দিলুম। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে মামাকে বললুম : এবারে আপনারা চা খেয়ে আসুন।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : কেন, টিকিট পেয়ে গেলে নাকি ?

বললুম : রিজার্ভ করে এলুম।

কথাটা মামা বুঝতে পারলেন না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম।

স্বাতি বলল : গোপালদার সঙ্গে আমি আছি বাবা, তোমরা চা খেয়ে এস, টিকিট কেটে আমরা এখান থেকে নড়ব।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে মামা মামীকে নিয়ে স্টেশনের দিকে গেলেন। রামখেলাওনও তাঁদের সঙ্গে গেল।

স্বাতি এই বারে আমাকে বলল : বাবার দুর্ভাবনা কেন বুঝতে পেরেছ তো ?

বললুম ঃ পারি নি।

স্বাতি বলল ঃ অন্ধকারের ভয়। রাত হবার আগেই শ্রীনগরে পৌঁছতে চান।

কিন্তু আমাদের বিধাতা যে মনে মনে হেসেছিলেন, তা আমরা পরে বুঝেছিলুম।

পাঠানকোট এক্সপ্রেস পাঠানকোট পৌঁছবার অনেক পরে যখন অলস ভাবে এক ভদ্রলোক এসে অফিস ঘরে ঢুকলেন, তখন ট্রেনের যাত্রীরা অসহায় ভাবে ছুটোছুটি করছেন। কাগজে যারা নাম লিখেছিলুম, তারা ভদ্রলোকের টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক নাম ডেকে ডেকে টিকিট দেবেন। ঠিক সময়ে হাজির বলতে না পারলে নাম কাটা যাবে। একজনের রিটার্ন টিকিটের দাম সাতাশ টাকা। টাকা পয়সা জমা দিয়ে আমরাও টিকিট পেয়ে গেলুম।

তার পরের সমস্যা হল, কোন্ বাসে উঠব। সবাই বলছে যে সব বাসই যাবে। কিন্তু কোন্ বাস আগে যাবে! এখানেও কুলিরা আমাদের সাহায্য করল, বলল ঃ এই বাসে উঠুন বাবু।

বলে মালপত্র বাসের মাথায় ওঠাতে লাগল। কোন উপায় নেই, জিজ্ঞাসা করে জানবার মতো কোন লোক নেই। ভগবানের নাম করে আমরা নিস্পৃহ রইলুম।

মামা মামী ঠিক এই সময়ে ফিরে এলেন। ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়ে বললেন ঃ যাও, এবারে তোমরা গিয়ে চা খেয়ে এস।

কুলিকে পয়সা দেবার সময় স্বাতি জিজ্ঞাসা করল ঃ এই বাস কখন ছাড়বে ?

সে বলল ঃ ড্রাইভার এলেই ছাড়বে।

ছাড়বার কোন সময় নেই !

পয়সা নিয়ে সেলাম করে যাবার সময় সে বলে গেল ঃ সময় হয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। কিন্তু এমন অনিশ্চিত ব্যাপার দেখে বাস ছেড়ে

যাওয়া সঙ্গত নয়। মামা বললেন : সময় হয়েছে বললেই হল মগের মুলুক আর কি! যাও যাও, তোমরা চট করে খেয়ে এস। আমি আটকাব বাস।

এই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে স্টেশন খুবই কাছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চায়ের দোকান। সেখানে সারাক্ষণ চা তৈরি হচ্ছে। আমরা গরম চা প্লেটে ঢেলে খেয়ে এলুম।

তখনও ড্রাইভার আসে নি। মামা মামী ভিতরে উঠে বসেছেন, রামখেলাওন বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে। মামা বললেন : এই তিন-খানা সিটও আমাদের। টিকিটের পিঠে সিট নম্বর দেওয়া আছে।

পরে শুনেছিলুম যে বাসের নম্বরও দেওয়া থাকে। কিন্তু এ সব কেউ বলে দেয় না। ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়।

বাস যখন ছাড়ল, তখন প্রায় সাতটা বেজেছে : সকালের মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পথের উপর। যাত্রীর তৎপরতা বেড়েছে, দোকান পাট খুলেছে। কুলু মানালির বাস আগেই ছেড়ে গেছে কিনা খেয়াল করি নি।

মামা নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর পাইপ ধরালেন। তারপর মামীকে জিজ্ঞাসা করলেন : দুর্গা দুর্গা বলেছ তো?

মামী কোন উত্তর দিলেন না।

শ্রীনগরের যাত্রীদের এখন আর এসব ভাবনা নেই। রেলপথ আরও তেষট্টি মাইল এগিয়ে গেছে। পাঠানকোট এক্সপ্রেসের নাম হয়েছে জম্মু তাওই এক্সপ্রেস। ট্রেন পাঠানকোট স্টেশনে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে জম্মু শহরে পৌঁছয় সোয়া সাতটার পরেই। স্টেশন নতুন হয়েছে, তার নাম জম্মু তাওই। শহরের ধার দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে, তারই নাম তাওই। কুলু কাংড়া ও চাম্বা উপত্যকার যাত্রীরাই এখন পাঠানকোটে নামে। কাশ্মীরের যাত্রীরা এগিয়ে যায়। আবার আগের মতো করেও যাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীনগরের যাত্রীর কাছে পাঠানকোটের আকর্ষণ অনেক কমে গেছে।

৪

ভারতে রাজপথের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মোটরে যাতায়াত করা এখন সম্ভব। কলকাতা থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে কাশ্মীর মোটরে যাতায়াতের কোন বাধা নেই। দিল্লী থেকে শ্রীনগর সাড়ে পাঁচশো মাইল, পাঠানকোট প্রায় মাঝামাঝি পথে। দিল্লী থেকে পাঠানকোট দুশো উননব্বুই মাইল, আর পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর দুশো সাতষট্টি মাইল। মানচিত্র দেখলে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। মনে হবে যে দিল্লী থেকে পাঠানকোট যদি তিনশো মাইলও হয়, তবে শ্রীনগর সেখান থেকে দেড়শো মাইলও হবে না। উড়োজাহাজে হয়তো এই রকমই কিছু হবে। পাহাড়ের উপর পথ বলেই এই রকম হয়েছে।

দিল্লী থেকে যাঁরা নিজেদের গাড়িতে কাশ্মীর বেড়াতে আসেন, তাঁরা দিল্লী থেকে প্রত্যূষে বের হন। মধ্যাহ্নে আহার করেন দুশো চব্বিশ মাইল দূরে জলন্ধরে। তারপর উত্তাপ এড়াবার জন্য বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে আবার যাত্রা করেন। রাত্রিবাস জম্মুতে। জলন্ধর থেকে জম্মু একশো চল্লিশ মাইল। জম্মুর ডাকবাংলোয় পঞ্চাশটি ঘর আছে। তার পর দিন জম্মু থেকে শ্রীনগর একশো বিরাশি মাইল পথ অনায়াসেই যাওয়া যায়। কাজেই শৌখিন মানুষেরা দিল্লী থেকে কাশ্মীর ট্রেনে যেতে চাইবেন না। অকারণে একটা রাত তাঁরা ট্রেনে কাটাতে চান না।

বাসে এক জন যাত্রী এই সব গল্প বলছিলেন। আর তাই শুনে আর একজন ক্ষেপে উঠে বলেছিলেন: তেলা মাথামে তেল।

প্রথমটায় এই মন্তব্য কেউই বুঝতে পারেন নি। সে কথা বুঝতে

পেরে তিনি নিজেই বললেন : এ সব তো বড় লোক্‌কা সুবিধাকা বাত, গরিবকা কেয়া ! এক গ্রামসে অন্য গ্রাম যানেকা—

ভদ্রলোক কথাটা সম্পূর্ণ করতে না পারলেও আমি তাঁর রাগের কারণ বুঝতে পারলুম। কথাটা মিথ্যা নয়। দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙলা দেশের দীর্ঘ মেয়াদী বর্ষায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি কোথায় পড়েছে জানি নে। অথচ আমরা সিংহাসনের মতো আরামদায়ক গদীর চেয়ারে বসে কাশ্মীরে যাচ্ছি। সরল সমতল সুপ্রশস্ত রাজপথ। অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ভদ্রলোকের মনে দুঃখ উথলে উঠল। আমি মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। তরুণ চেহারা। পোশাকে ও কথার ধরনে বাঙালী বলেই আমি নিঃসন্দেহ হলুম।

যাঁকে এই কথাগুলি বললেন, তিনি কিন্তু মেনে নিলেন না। বললেন : কাশ্মীর সে ওয়াপোস জা কর গরিবকা বাত শোচেঙ্গে।

ভদ্রলোক আর হিন্দীতে উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বাঙলায় বললেন : শুনছেন তো কথা, গরিবের কথা উনি শুনবেন না।

খানিকটা তফাত থেকে আর একজন বললেন : গরিবকা বাত কোই শুনাই নেহি।

যে ভদ্রলোক পথের গল্প বলছিলেন তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন : আরে রাখুন মশাই গরিবের কথা। কাশ্মীরে ফুর্তি করতে যাচ্ছেন, আর দুঃখ করছেন গরিবের জন্যে ! প্রাণে যদি অতই দরদ তো দুটি গরিব সঙ্গে আনলেই পারতেন ! তারাও দুদিন আপনার সঙ্গে ফুর্তি করে যেত।

যাকে বাঙালী বলে আগেই চিনেছি তিনি এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : কথা শুনছেন মশাই, এ যুগের মানুষ হয়ে এ রকম কথা বলতে মুখে আটকাচ্ছে না ! দেশটা এদের জন্যেই ডুবছে।

তারপর আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : কাশ্মীরে আপনারা কত দিন থাকবেন ?

সংক্ষেপে বললুম : কোন ঠিক নেই।

কোথায় উঠবেন ?

কোন ভাল জায়গায়।

আরে মশাই, খারাপ জায়গায় আর কে উঠতে চায় ! আমি জিজ্ঞেস করছি, জলে থাকবেন না ডাঙায় ?

বললুম : সেখানে পৌঁছে তা ঠিক করব।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার নাম কী ?

এ ভাবে অপরের নাম জানতে চাওয়া সৌজন্যসম্মত নয়, কিছু বিরক্ত ভাবে নিজের নাম বললুম।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : বেশ নাম। আমার নাম গণেশ।

আমি বললুম : এ আরও ভাল নাম।

স্বাতি যে আমাদের কথা শুনছিল তা বুঝতে পারলুম তার হাসি শুনে। বলল : কপালে আজ অনেক দুর্ভোগ আছে মা।

কথাটা বলেছিল মামীকে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েছিল রহস্যময় দৃষ্টিতে। কিছু বুঝতে না পেরে মামী প্রশ্ন করলেন : কেন ?

উত্তর দিতে স্বাতি এক মুহূর্ত দেরি করল না। বলল : কোথায় আজ খাওয়া দাওয়া হবে, কোথায়—

বলে থেমে গেল। কিন্তু তার হাসি ফুরলো না।

গণেশবাবু হাসি শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন : আপনারা বিজনেসে আছেন ?

বললুম : না।

তবে কি সার্ভিসে ?

বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি কী করেন ?

ভদ্রলোক এক গাল হেসে জবাব দিলেন : আমার কথা আর বলবেন না, আমি আপনাদের সেবা করবার চেষ্টা করি।

বলে তাঁর প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা সাদা গান্ধী টুপি বার করে নিজের মাথায় দিলেন।

বললুম : বুঝেছি।

গণেশবাবু কৃতার্থ হয়ে বললেন : তা বুঝবেন বৈকি! আপনারা যদি না বুঝবেন তো আর বুঝবে কে বলুন!

পিছনে হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে আমরা উভয়েই চমকে ফিরে তাকালুম। প্রায় সকলের মুখেই হাসি। যে ভদ্রলোক কাশ্মীর যাত্রার গল্প বলেছিলেন, গণেশবাবু তাঁকে আক্রমণ করে বললেন : হাসবার কী হয়েছে?

ভদ্রলোক একটু খোঁচা দিয়ে বললেন : এ সব গরিবের কথা নয়।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন : কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণের কথা বলছিলাম। এক কবি বলেছেন—

হর্ সোখতা জান্-এ কি বা কাশ্মীর দর্ আ-য়াদ।
গর্ মুরগি কাবাব অস্ত্ বা বল্ ও পর্ আ-য়াদ॥

সবাই হাসতে লাগলেন। কিন্তু মানে না বোঝার জন্য আমরা হাসতে পারলুম না। স্বাতির সঙ্গে মামী অন্য ধারে বসেছিলেন। আমি বসেছিলুম মামার সঙ্গে। গণেশবাবু আমার পিছনে, আর যিনি কবিতা বলছিলেন তিনি স্বাতির পিছনে। আমাদের কাউকে হাসতে না দেখে বললেন : কোন দগ্ধ প্রাণী যদি কাশ্মীরে আসে, তবে তারও নবজীবন লাভ হয়। কাবাব করা মুরগিও ডানা মেলে আকাশে যায় উড়ে।

মামা উদ্দাম ভাবে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসিতে আমাদের সকলের হাসি চাপা পড়ে গেল। বক্তা ভদ্রলোক আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন : কাশ্মীরে এলে কবিরা এক রকম পাগল হয়ে যেতেন। মোগল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর কী বলেছেন তা তো দিল্লীতেই দেখেছেন!

সহসা সে কথা আমার মনে পড়ল না।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন :

আগর্ ফির্দোস্ বর্ রু-ই-জমিন্ অস্ত্।
হমিন্ অস্ত্ ও হমিন্ অস্ত্ ও হমিন্ অস্ত্॥

এ কথার মানেও আমরা বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : কাশ্মীরে এসেই জাহাঙ্গীর বলেছিলেন, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তো তা এইখানে, তা এইখানে, তা এইখানে। ইট্স্ এ হেভেন অন আর্থ্।

বাঙলাতেও আমরা ভূস্বর্গ কাশ্মীর বলি।

ভদ্রলোক বললেন : বলতেই হবে, না বলে উপায় আছে!

পথের উপর থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে গিয়েছিল। আমরা মন দিয়েছিলুম কথোপকথনে।

সেই ভদ্রলোক বললেন : আর এক কবি বলেছেন—

না বরফ অস্ত ঈঁ কে মেবারস্ সরে পীর।
ফলক্ তোফমে জলদ্ বররুয়ে কশ্মীর॥

এবারেও প্রথম আর শেষ শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলুম না। ভদ্রলোক হেসে বললেন : এই কবি হলেন কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের মন্ত্রী দেওয়ান কৃপারাম। পীর পর্বতের উপর তুষারের কণা দেখে বলেছিলেন, ও বরফ নয়, কাশ্মীরের মুখে আকাশ অমৃত দান করেছে।

গণেশবাবু ঠোঁট উল্টে বললেন : ঐ অমৃত মুখে পড়লেই হয়েছে আর কি!

গরিবের মুখে আর কোন্ অমৃত আপনি দেবেন!

গণেশবাবু ক্ষেপে উঠতে গিয়েই থেমে গেলেন। স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল : দেখ দেখ গোপালদা!

অবিলম্বে আমি বাহিরের দিকে তাকালুম। একটি সুন্দর জায়গার মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি। একটি নদীর উপর পুল, কিছু ঘর

বাড়ি, মনোরম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

গণেশবাবু যে এ পথের নতুন যাত্রী তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই অন্য ভদ্রলোকের দিকে তাকালুম। সে ভদ্রলোক আমার নির্বাক কৌতূহলেই আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন: আমরা এখনও পাঞ্জাবেই আছি। এ জায়গার নাম মাধোপুর, নদীর নাম রাভি, আপনারা ইরাবতী বলেন। এ সব ক্যানাল ডিপার্টমেণ্টের ঘরবাড়ি। নদীর ওপার থেকে জম্মু রাজ্য।

স্বচ্ছ জলের ধারা তরতর করে বইছিল। আমার ভাল লাগল এই জায়গাটি।

সেই ভদ্রলোক বললেন: কিছু সময় এখানে কাটিয়ে গেলে জীবনে কখনও ভুলতে পারতেন না।

কেন?

উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন: এমন এক অদ্ভুত নৌকোয় আপনাকে চড়িয়ে দিতাম যে কিছু দিন পরে আপনার নিজেরই অবিশ্বাস্য বলে মনে হত।

অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক বললেন: এক জোড়া ফুলনো মোষের চামড়া, আপনারা মশক বলেন কিনা জানি না, তার ওপর একখানা উল্টনো চারপাই। নিশ্চিন্ত মনে দুজনে বসবেন, আর দুজন লোক সেই মশকের উপরে চেপে আপনাদের ঘুরিয়ে আনবে। তারা হাত দিয়ে চারপাই-এর পায়া ধরবে, আর পা দিয়ে সাঁতার কেটে পাথর বাঁচিয়ে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

মামা বললেন: বিপজ্জনক!

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বললেন: একেবারে নিরাপদ।

নিরাপদ কিনা তা কল্পনা করাও আর সম্ভব নয়। ইরাবতী নদী আমরা পিছনে ফেলে এসেছি।

৫

যাত্রীদের হাল্কা গল্প শুনে মামা বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : বুঝলে গোপাল, অনেক দিন তোমার পুরাতত্ত্বের গল্প শুনি নি।

ঠিক এই সময়ে এ রকমের একটা কথা শোনবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে বেশ কৌতুক অনুভব করেছে। আমাকে নীরব থাকতে দেখে বলল : লজ্জা পাচ্ছ কেন! আরম্ভ কর না!

এ কথার উত্তরে বললুম : ঠিকই বলেছ। কিছু জানি ভাবতেই আজকাল লজ্জা করে। লোকে পণ্ডিত ভাববে, সে বড় লজ্জার কথা!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : তোমার কথা আদৌ মিথ্যে নয়। এই চাল চালিয়াতির যুগে বিদ্যের কোন দাম নেই। পরীক্ষা পাশের পরেও যারা পড়াশুনা করে, এ যুগের শিক্ষিত লোক তাদের বোকা ভাবে।

মনে প্রাণে আমি এ কথা বিশ্বাস করি, আর তাইতেই লজ্জা পাই কিছু বলতে। হাসি-মস্করায় দক্ষ হলে লোকে বুদ্ধিমান ভাবে, বোকা ভাবে জ্ঞানের কথা শুনলে। পুরাতত্ত্বের পাতা উল্টে কি জীবনটা উপভোগ করা যায়!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় ভাবল যে আমি দুঃখ পেয়েছি। তাই বলল : শুনেছি, কাশ্মীরের সঙ্গে কশ্যপ মুনির একটা সম্বন্ধ আছে।

বললুম : আছে। কিন্তু সে পুরাণের গল্প। তার আগে ঋগ্বেদেও এই দেশের উল্লেখ আছে। সে বড় জটিল কথা। অনেক পণ্ডিত

এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু আমাদের জন্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

মামা বললেন : তা না পারুক, তুমি যা জান তাই শোনাও।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললুম : আমি এ বিষয়ে সামান্যই জানি

মামা ধমক দিয়ে বললেন : ভূমিকা থাক।

স্বাতি হাসল আমার অবস্থা দেখে।

বললুম : প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে আমি আর্য সভ্যতার বিস্তার দেখেছি। খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে ভারতের উত্তর প্রান্তে সপ্ত সিন্ধবে আর্যদের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল। এই সপ্ত সিন্ধবের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত হত সরস্বতী নদী। ব্রহ্মাবর্ত পুর্ব পারে। আর্যরা এই নদী অতিক্রম করে খ্রীষ্টের জন্মের বারো শো বৎসর আগে। কোন্ পথে আর্যরা ভারতে এসেছিল, পণ্ডিতরা তাও নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। সপ্ত সিন্ধবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। আর্যরা খাইবার ও মালাকন্দ গিরিদ্বার দিয়ে গোমল ও কুরম নদীর উপত্যকা বেয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এ হল ঐতিহাসিকের কথা। ঋগ্বেদের কথা জানতে হলে আমাদের আর্যদের কথা জানতে হবে।

আর্য শব্দটি কোথা থেকে এল, এ নিয়ে পণ্ডিতরা আজও এক মত হতে পারেন নি। বিদেশী পণ্ডিতরা বলেন যে অর্ ধাতু থেকে আর্য শব্দ। মানে ভূমি কর্ষণ। কাজেই আর্য হল কৃষক জাতি। কিন্তু ঋগ্বেদে আমরা আর্যদের কৃষিকার্যের কোন পরিচয় পাই নি। পরন্তু সায়নাচার্য যে কথা বলেছেন সেই অর্থই গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে। ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় করে আর্য। ঋ ধাতুর মানে গমন ও ব্যাপ্ত করা। সায়ন বলেছেন, অরণীয় বা গন্তব্য। এই জাতি সর্বত্র গমন করত বলেই আর্য নাম।—

কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়

পরমস্যাঃ পারাবতঃ।

হে শ্রেষ্ঠতম নর, কে তোমরা দূরবর্তী প্রদেশ থেকে একে একে উপস্থিত হয়েছ !

ঋগ্বেদে আমরা দুটি জাতির উল্লেখ পাই।—ইন্দ্র আর্যকে পৃথিবী দান করেন এবং দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেকবার তাদের রক্ষা করেন। সে সময় দাস বা দস্যুরা আর্যদের প্রধান শত্রু ছিল। আর্যদের যজ্ঞে দস্যুরা নানা অনিষ্ট সাধন করত।

চিন্তিত ভাবে মামা বললেন : কাশ্মীরের কথায় আর্যদের প্রসঙ্গ কেন এল তা বুঝতে পারছি না।

বললুম : হাতের কাছে প্রাচীন ভারতের একখানা মানচিত্র থাকলে আপনাকে দেখাতে পারতুম। সপ্ত সিন্ধুর দেশ পাঞ্জাব। যে দুটি জনপদের নাম আমরা পাই তা এখনও আছে। পুরুষপুর ও তক্ষশীলা। পুরুষপুরের বর্তমান নাম পেশোয়ার। ব্রহ্মাবর্তে পাই কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর নাম। এই সপ্ত সিন্ধুর ঠিক উত্তরেই কাশ্মীর উপত্যকা। ঐতিহাসিক প্রমাণে আর্য সভ্যতার বিকাশ এখানে আদি যুগে হয় নি। কিন্তু সরস্বতী নদীর অবস্থান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে কাশ্মীরকে এই সপ্ত সিন্ধুর অন্তর্গত বলে মনে হবে।

সরস্বতী নদী আর্যদের বড় প্রিয় ছিল। ঋক্ সংহিতায় বার বার তাঁরা সরস্বতীর উল্লেখ করেছেন। আরও তিনটি নদীর উল্লেখ আছে -কুভা গৌরী ও সিন্ধু। এদের অবস্থান নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তা আমি পড়ি নি। শুধু এইটুকু পড়েছি যে টলেমি সুঅস্তিন নামে যে নদীর উল্লেখ করেছেন তা সরস্বতী নদী হতে পারে। তাঁর সুঅস্তিন দেশ কাশ্মীরের অন্তর্গত ছিল। সারদা বা সরস্বতী সুঅস্তিনেরই অন্য নাম। ভারতবর্ষে আজ সরস্বতী নদী নেই। কিন্তু কাশ্মীরের শারদা নাম আজও লোপ পায় নি।

স্বাতি বলল : তোমার এই অনুমানের পেছনে যুক্তি খুব দুর্বল বলে আমার মনে হচ্ছে। তোমারও কি তাই মনে হয় নি?

যে সত্য সম্বন্ধে কারও কোন ধারণা নেই, তার যুক্তি প্রমাণ একটু

দুর্বল হয়েই থাকে। মামা বললেন: সপ্ত সিন্ধব আর ব্রহ্মাবর্তের সীমায় সরস্বতী নদী, সেই কথাই তো ভাল ছিল।

বললুম: তাতে একটা অসুবিধা আছে। ঋগ্বেদের নানা শ্লোকে দেখা যায় যে আর্যরা যেখানে বাস করতেন তা শরৎ ও হিমপ্রধান, গ্রীষ্ম ও বসন্তের উল্লেখ প্রাচীন শ্লোকে নেই। বোধহয় দশ মাস শীত ও দু মাস গ্রীষ্ম। আর্য ঋষিরা তাই স্তব করেছিলেন—

মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছদ্দির্যদ্বাং বরূথ্যং সুদান্।

হে মিত্র ও বরুণ, আমাদের শীত নিবারণের জন্য অনভিভূত আশ্রয় দান কর।

সরস্বতী নদী পাঞ্জাবে হলে শীতার্ত ঋষিরা এমন আর্তনাদ করতেন না। তাঁরা আরও উত্তরে বাস করতেন বলেই মনে হয়।

আমরা লখনপুর কাঠুয়া সম্বা নামে কয়েকটি ছোট ছোট লোকালয় পেরিয়ে গেলুম। পথ এখনও সমতল সরল। মনে হচ্ছে না যে আমরা কোন পার্বত্য প্রদেশের উপর দিয়ে চলেছি।

বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে দেখে স্বাতি বলল: ভারি আশ্চর্য লাগছে, তাই না?

আমি স্বীকার করে বললুম: পাহাড় দেখবার জন্যে মন অস্থির হয়েছে।

স্বাতি বলল: কাশ্মীরের গাইড বই দেখে বুঝি বেরোও নি!

না।

সেইজন্যেই পাহাড় খুঁজছ। পাঠানকোট থেকে এই পথে সাতষট্টি মাইল দূরে জম্মু শহর। তার উচ্চতা মাত্র এক হাজার ফুট। তার পর থেকেই পাহাড় শুরু হয়েছে।

মামা বললেন: বোঝ এইবারে। তুমি ভাব যে সব খবরই তোমার পকেটে। দেখছ তো এখন!

বললুম: এবারে গোড়া থেকেই তো তাই দেখছি।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : স্বাতি এবারে রীতিমতো পড়াশুনো করে বেরিয়েছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম : তাহলে পুরাতত্ত্বের কথাও তুমি বল না!

মামা বললেন : উঁহু, তা কী করে হবে! সরকারী গাইড বইএ কি ও সব বাজে কথা থাকে!

তাঁর পরিহাস শুনে আমি হাসলুম।

স্বাতি বলল : কেন নিজের দাম বাড়াচ্ছ! বল না যা বলছিলে!

মামাও তাকে সমর্থন করে বললেন : রামায়ণ-মহাভারতে কাশ্মীরের সম্বন্ধে কিছু আছে কিনা তাই বল।

বললুম : মূল রামায়ণে কিছু আছে কিনা তা আমার মনে নেই। কিন্তু কাশ্মীরের একজন ইতিহাস লেখক দাবী করেছেন যে ভরত ও শত্রুঘ্ন কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিলেন। রাম লক্ষ্মণ বনবাসে, দশরথ স্বর্গত। সেই সময়ে দুই ভাই নাকি অবসর যাপনে কাশ্মীরে এসেছিলেন।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : সত্যি নাকি!

বললুম : রামায়ণে এ কথা আছে কিনা জানি না। তবে নীলমত পুরাণে আছে যে প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের সাহায্যে জলোদ্ভব নামে এক অসুরকে বধ করে সতীসরে কাশ্মীর রাজ্য স্থাপন করেন। রাজতরঙ্গিণীতেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে।

মামা বললেন : দাঁড়াও। রাজতরঙ্গিণী নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে!

বললুম : ঠিকই ধরেছেন। কবি কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লন কাশ্মীরের রাজা জয়সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী কবিতায় লেখা কাশ্মীরের ইতিহাস।

খুশী হয়ে মামা মামীর দিকে তাকালেন। মামী তাঁর আত্মপ্রসাদ

দেখতে পেলেন কিনা জানি না। গাড়িতে তিনি নীরবে থাকতেই ভালবাসেন, অনেক সময়েই চোখ বন্ধ করে থাকেন।

মামা এবার আমাকে বললেন: তারপর?

বললুম: প্রবাদ আছে যে হিমালয়ের এই অঞ্চল পুরাকালে জলে পূর্ণ ছিল। কাশ্মীর উপত্যকা যে বিশাল জলাশয়ে নিমজ্জিত ছিল, তার নাম সতীসর। পার্বতীর নামে এই সরোবরের নাম। একজন কাশ্মীরী লিখেছেন যে এখানেও সতীর কোন ছিন্ন অঙ্গ পড়েছিল বলেই সতীসর শারদ-পীঠ। এ কথার সমর্থন কোথাও পাই নি। সতীসরে নাকি দৈত্যরা বাস করত এবং এ অঞ্চলের নরনারীর প্রাণনাশ করত। তারপর এলেন ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ। মানুষের এই দুঃখ দেখে তিনি দৈত্য বধ করে এই জলমগ্ন দেশকে সুন্দর বাসস্থানে পরিণত করলেন। কহ্লন বললেন—

নির্মমে তৎসরো ভূমৌ কাশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্।

কশ্যপ মার বা কশ্যপ মীর থেকে কাশ্মীর।

স্বাতি বলল: এই সব সংস্কৃত শ্লোক তুমি মনে রাখ কী করে?

হেসে বললুম: স্কুল কলেজে পণ্ডিত মশায়দের মুখে শ্লোক শুনে আমিও এই কথা ভাবতুম। মনে হত যে তাঁদের পাণ্ডিত্যের কোন শেষ নেই। তারপরে এই ব্যাপারের রহস্য এক দিন জেনে ফেললুম।

মামা বললেন: কী রকম?

বললুম: খুব সোজা। কিছু পুরনো বাঙলা বই দরকার। পুরনো বইএর দোকানেই পাওয়া যায়। সেকালে বাঙালী লেখকেরা খুব খেটেখুটে যত্ন করে বই লিখতেন। তাতেই যা পাওয়া যায় তা পড়েই এ যুগের পণ্ডিত হওয়া সম্ভব।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু আমার এক রকমের দুঃখ এল মনে। আমাদের অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ। যাঁরা অনেক জানেন তাঁরা সবাই নীরব, মুখর শুধু আমার মতো অজ্ঞ জন। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল সেই জানে। বলল: তার পরের কথা বল।

আমি সামলে নিয়েছিলুম। বললুম : তারপর মহাভারতের কথা।

হঠাৎ আমার শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ল। বললুম : তার আগে বিনায়ক ভট্টের কথা বলি। তিনি তাঁর শাঙ্খায়ন ভাষ্যের এক জায়গায় বলেছেন, কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্তিত হয়ে থাকেন, সরস্বতীই বাক্, সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্য লোকে উত্তর দিকে ভাষা শিখতে যায়। বিনায়ক ভট্টের এই কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে পুরাকালে লোকে ভাষা শিখতে কাশ্মীরে যেত, আর এই জন্যই কাশ্মীরের নাম ছিল সরস্বতী বা শারদা দেশ।

মহাভারতে ও হরিবংশে কাশ্মীরের উল্লেখ আছে নানা স্থানে। বনপর্বে দেখি—

কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ।

কাশ্মীরে তক্ষক নাগের ভবন; সেখানে বিতস্তা নামে তীর্থ। আবার বিরাট পর্বে কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী অর্থাৎ কাশ্মীরের মতো ঘোড়া। তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে অর্জুন এই কাশ্মীর জয় করে-ছিলেন। সভাপর্বে আছে সেই কথা।

কহ্লন রচিত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম রাজা গোনন্দ। হরিবংশে এই রাজার নাম গোনর্দ। ইনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কাশ্মীরের রাজা; বন্ধু ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধের। জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করে যদুবংশীয়দের পলায়নের পথ বন্ধ করেন। জরাসন্ধের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হন, কিন্তু গোনর্দ নিহত হন বলরামের হাতে।

কহ্লন বলেন, গোনন্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দামোদর কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার রাজ্য। একবার এই রাজ্যের এক রাজকন্যার স্বয়ম্বরে কৃষ্ণ বলরামের নিমন্ত্রণ হয়। তাঁরা যখন গান্ধারে যাচ্ছিলেন, তখন পথে দামোদর তাঁদের আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন নি। দামোদরের রানী যশোমতী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের রাজ্য শাসন তখন বোধহয় প্রচলিত ছিল না। কাশ্মীরের অমাত্যরা তাই প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রতিবাদের উত্তরে কৃষ্ণ নারীর সমান অধিকারের কথা বলেন নি, বলেছিলেন অন্য কথা—

কাশ্মীরাঃ পার্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হবাংশজঃ।

কাশ্মীরের নারীরা পার্বতী ও রাজা মহাদেবের অংশ।

দ্বিতীয় গোনর্দ এই যশোমতীর পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি নিতান্তই শিশু ছিলেন বলে কোন পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধ করেন নি।

পৌরাণিক যুগেব পবেও হিন্দু রাজারা কাশ্মীরে প্রায় দেড় হাজাব বছর রাজত্ব করেছেন। এর বিশ্বস্ত ইতিহাস আছে কবি কহ্লনেব রাজতরঙ্গিণীতে। হিন্দুদের সাতটি প্রধান বংশ এই রাজ্যে বাজত্ব করেছেন। এই বংশগুলির নাম পাণ্ডু মৌর্য কুষাণ গোনন্দ শ্বেত-হুন কার্কোট ও লোহর। উল্লেখযোগ্য রাজাদের মধ্যে আছেন অশোক কণিষ্ক মিহিরকুল দ্বিতীয় প্রবরসেন দুর্লভবর্ধন ললিতাদিত্য ও হর্ষ। কহ্লন তাঁর রাজতরঙ্গিণী রচনা করেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে। আর হিন্দু রাজত্বের অবসান হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দিন কাশ্মীরের সুলতান হয়েছিলেন। মোগলরা কাশ্মীব অধিকার করেন ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সেনাপতি কাশ্মীব অধিকার করেন। এই কাজে সহায়তা করেন তাঁরই এক ডোগরা সেনাপতি গুলাব সিং। ইনিই জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শিখ যুদ্ধের পরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশের সঙ্গে সন্ধি অনুসারে গুলাব সিং-ই হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম রাজা। এই বংশের রাজত্বকাল ঠিক একশো বছর। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পরে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দেন।

কিন্তু এই নীরস ইতিহাসের কথা আমি বললুম না।

৬

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল নিকটে ও দূরে। সে দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল: আমরা বোধ হয় জম্মু পৌঁছে গেলাম।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: জম্মুর উল্লেখ নেই মহাভারতে?

হেসে বললুম: যা মহাভারতে নেই তা ভারতবর্ষেও নেই।

মামা বললেন: প্রবাদ তো সেই রকম, কিন্তু আসলেও কি তাই?

বললুম: বনপর্বে জম্মুর উল্লেখ আছে পবিত্র তীর্থ বলে।

স্বাতি বলল: লজ্জা কিসের! শ্লোকটা বলে ফেল।

বললুম: আগে নোটিশ পেলে মুখস্থ করে আসতুম। যদি চাও তো লিখে পাঠিয়ে দেব।

পরে আমি সেই শ্লোকটি খুঁজে বার করেছিলুম। লেখবার সময় অনেক কিছুই খুঁজে বার করতে হয়, তা না হলে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। বনপর্বে বিরাশি নম্বর অধ্যায়ে চল্লিশ নম্বরের শ্লোক।—

জম্বুমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষিপিতৃসেবিতম্।

অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্বকামসমন্বিতঃ॥

জম্বুমার্গ দেবতা ঋষি ও পিতৃসেবিত। সেই তীর্থে গেলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ও ফললাভ হয় অশ্বমেধ যজ্ঞের।

ততক্ষণে আমরা লোকালয়ের ভিতরে পৌঁছে গেছি। সুন্দর পার্বত্য শহর জম্মু, সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র এক হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু না জানলে আরও উঁচু মনে হবে। তাওই নামে একটি ছোট নদী এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। চন্দ্রভাগার উপনদী এটি। মনোরম দৃশ্য।

জম্মুতে আমরা বেশিক্ষণ থাকি নি। ঘুরে ফিরে কিছু দেখবারও সময় পাই নি। একজন বলেছিলেন যে শ্রীনগর থেকে ফেরার পথে

এক রাত্রি এখানে কাটাতেই হবে। সকাল বেলায় একটু দেরিতে যাত্রা করলে শহরের সব কিছু দেখে নেওয়ার অসুবিধা হবে না। আমরা তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়েছিলুম। না মেনে অবশ্য উপায় ছিল না। আমাদের একার জন্য বাস অপেক্ষা করবে না।

বাজারের সদর রাস্তা ছেড়ে মোটর বাস এসে যেখানে দাঁড়াল, আমরা সেখানেই নেমে পড়লুম। সামনে এগিয়ে জম্মুর বিরাট ডাকবাংলো। যাত্রীদের জন্য এখানে পঞ্চাশটি ঘর আছে, আর আছে একটি রেস্টরেণ্ট। পাঠানকোট থেকে আমাদের মতো তাড়াহুড়ো করে যাঁরা বেরোন না, তাঁরা এখানেই লাঞ্চ খান। আমাদের খাবার সময় হতে অনেক দেরি আছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে এই নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। এর পর কোথায় খাবার জায়গা আছে, সময় মতো সেখানে পৌঁছনো যাবে কি না, পথে যদি ভাল হোটেল না থাকে তবে এখানেই খেয়ে নেওয়া উচিত হবে কি না, এই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহে তাঁরা মেতে উঠলেন। ড্রাইভার শুধু একটি কথায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অদৃশ্য হল: হোটেলের অভাব এ রাজ্যে নেই।

স্বাতি বলল: এত সকালে খাওয়া অসম্ভব।

মামা বললেন: আমরা আর একবার ব্রেকফাস্ট করতে পারি।

মামী বললেন: তোমরা যা করবার তা করে এস, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মামা বললেন: এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তুমিই একটা ব্যবস্থা কর।

মামী আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: একটু চা কিংবা শরবৎ খাওয়া যাক।

এই শরবৎ খাবার কথা যে আমি মামীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বলেছি, স্বাতি তা বুঝতে পেরে বলল: ভাল আইসক্রীমের বিজ্ঞাপন দেখেছি গোপালদা, এই দিকে এস।

স্বাতিকে অনুসরণ করে আমরা অগ্রসর হলুম।

মামা বললেন : আইসক্রীম মন্দ লাগবে না। এখানে বেশ গরম দেখছি।

স্বাতি বলল : কাশ্মীরে তো আর আইসক্রীম খাওয়া চলবে না, এইখানেই খেয়ে নিই।

বাহির থেকে রঙ আর সাইনবোর্ড দেখে ভাল মনে হল এমনি এক হোটেলে আমরা ঢুকে পড়লুম। লোকজন নেই। অসময়ে কেউ খাওয়া দাওয়া করবে তা আশা করা যায় না। ডাকাডাকি করতে এক বেয়ারা বেরিয়ে এল। আইসক্রীমের অর্ডার দিল স্বাতি।

প্রশস্ত খাবার ঘর নির্জন। আমরা একটা টেবিলের চারি ধারে বসলুম। দেরি দেখে আমি তাদের বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এলুম। তখনও আইসক্রীম আসে নি। একে একে সবাই বাথরুম থেকে ঘুরে এলেন।

মামা বিরক্ত হয়ে বললেন : আইসক্রীম কি এরা শ্রীনগর থেকে আনতে গেছে!

তাই তো দেখছি।

বলে স্বাতি উঠে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল : আসছে।

অধৈর্য হয়ে মামা তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন : এসে আর দরকার নেই। ও দিকে বাস ছেড়ে যাবে।

মামার ভয় অমূলক নয়। বাস কতক্ষণ দাঁড়াবে তা কেউ বলে নি। হয়তো আমাদের ফেলে যাবে না। কিন্তু গেলে আমরা কী করতে পারি! মামীও উঠে দাঁড়ালেন।

হোটেলের একজন লোক এসে বলল : উঠবেন না, উঠবেন না।

ততক্ষণে আমরা দরজার কাছে পৌঁছে গেছি। মামা বললেন : উঠব না তো কি সারা দিন আমরা এইখানেই বসে থাকব!

আইসক্রীম আসছে।

কোত্থেকে? শ্রীনগর থেকে, না অমরনাথের গুহা থেকে?

মামী বললেন : বাসের কাছে পাঠিয়ে দিতে বল।

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। আইসক্রীম যদি নিতান্তই আসে তাহলে তারা বাসের স্ট্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবে। বাজারে দোকান পাট দেখতে দেখতে আমরা নিজেদের বাসের কাছে ফিরে এলুম।

যাত্রীরা তখনও সবাই ফেরেন নি। যাঁরা ফিরেছেন, তাঁরা আশে-পাশের দোকান থেকে কিছু খেয়ে সজীব হয়ে এসেছেন। কারও মুখে পান, কেউ কথা বলছেন সোৎসাহে। সেই ভদ্রলোককেও দেখতে পেলুম, যিনি আমাদের পথের গল্প শুনিয়েছিলেন। আমাদের ফিরতে দেখে বললেন : খেয়ে নিলেন ?

বললুম : না।

কুডে খাবেন তো ! সেই ভাল। ভাত রুটি মাংস সবই পাবেন। আমরা শাকাহারী, এখানেই পুরি তরকারি খেয়ে নিলাম।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার বন্ধু কোথায় ?

আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি গণেশবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিন্তু তবু না বোঝার ভান করলুম।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার খদ্দরের জামাকাপড় দেখে তিনি আপনাকে তাঁর গান্ধী টুপি দেখালেন, আর গরিবের দুঃখের কথা শোনালেন সবাইকে। তাঁর নিজের পোশাকটা তো আপনি দেখেন নি ?

স্বীকার করলুম : দেখি নি।

ভদ্রলোক বললেন : টেরিলিন না কী বলে আজকাল, তারই প্যাণ্ট। আর সার্ট তো আপনাদের দেশি সিল্কের, তার দাম বোধহয় আরও বেশি। গরিবের দুঃখ তো ওঁরাই ভাল বোঝেন।

গরিবের দুঃখ গরিব ছাড়া আর কে বোঝে তা আমি জানি না। কাজেই কোন উত্তর দিলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম সংসারচাঁদ, এই অঞ্চলেরই লোক, ব্যবসা আছে দিল্লীতে। নিজের ব্যবসা নয়, দালালি করি।

কাশ্মীরের গ্রাম থেকে জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর দোকানে পৌঁছে দিই। এ দেশের লোকের হাল দেখতে আমার বাকি নেই।

সংসারচাঁদ যে কথা বলতে ভালবাসেন তাতে আমার সন্দেহ রইল না। স্বাতি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বোধহয় আমাদের কথাই শুনছিল। আমি কোন কথা না বলে সংসারচাঁদকেই কথা বলার সুযোগ দিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: দেশে পয়সার স্রোত বইছে। বড়লোকেরা তার ভিতর ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর গরিবেরা দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে, কাছে যাবার সাহস তাদের নেই। এই দিল্লীতেই দেখুন না, গরিবরা আমাদের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে। পাঁচ টাকার জিনিস পাঁচ টাকা চাইলেও বলে, এত দাম! আর সেই জিনিসই বড়লোককে পঞ্চাশ টাকা বললে বিক্রী হয় না। বলতে হবে পাঁচশো, পাঁচশো বছর আগে মহারাজা সংসারচাঁদ এই জিনিস পছন্দ করতেন। কে সংসারচাঁদ আর কেন তিনি পছন্দ করতেন, তা কেউ জানতে চাইবে না। পাঁচখানা একশো টাকার নোট তখনি বার করে দেবে। সেই পাঁচ টাকার জিনিসটি বন্ধু বান্ধবকে দেখাবার সময় সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী বলবে, মহারাজা সংসারচাঁদ এটি ব্যবহার করতেন, জানেন তো সংসারচাঁদ কে? বন্ধুরা চুপ করে শুনবে, আর বান্ধবীরা মাথা দুলিয়ে বলবে, জানি বৈকি।

স্বাতি হেসে উঠেছিল, কিন্তু আমি হাসি নি। সংসারচাঁদ নিজেও হাসেন নি। তাঁর হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বেদনা আমি যেন অনুভব করতে পারছিলুম।

ঠিক এই সময়ে আমাদের আইসক্রীম এল। ছোট ছোট কাগজের কাপ একটা ট্রেতে সাজিয়ে এনেছে। কাপের বাইরেটা নোংরা, ভিতরটাও খুব পরিচ্ছন্ন মনে হল না। মামী দেখেই নাক সেঁটকালেন। বললেন: রামখেলাওনকে একটা দাও।

তার মানে তিনি নিজে ও জিনিস ছোঁবেন না। আমাদের একটা

তৃষ্ণা বোধ ছিল বলে আমরা কাঠের চামচ দিয়ে তাই খেলুম। কলকাতায় এর চেয়ে পরিচ্ছন্ন আইসক্রীম তখনও চার আনায় পাওয়া যায় ঠেলাগাড়িওয়ালার কাছে। এরা চোদ্দ আনা করে দাম নিল। সংসারচাঁদ অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবই দেখেছিলেন। বললেন: দেখছেন তো, চার আনার জিনিস দয়া করে চার টাকা চায় নি। চার আনা দাম বললে হয়তো নোংরা বলে আপনারা খেতেন না।

বললুম না যে আমরা খেয়ে নেবার পরে দাম জেনেছি। ততক্ষণে আরও অনেক যাত্রী ফিরে এসেছেন, আসেন নি শুধু গণেশবাবু। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আর ভাল লাগছিল না বলে আমরা বাসের ভিতরে উঠে বসলুম।

স্বাতি আমাকে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল: জম্মুর সম্বন্ধে জানবার কিছু নেই বুঝি?

আমি তার প্রশ্ন শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে সংসারচাঁদও এ কথা শুনতে পেয়েছেন। উত্তরটা তিনিই দিলেন, বললেন: জম্মুর সম্বন্ধে কিছু জানা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাশ্মীর বলতে তো আপনারা শ্রীনগর বোঝেন, যেমন বাঙলা বলতে আমরা কলকাতা বুঝি। পাঠানকোটে পৌঁছেই ভাবেন, কতক্ষণে কাশ্মীরে পৌঁছব। কিন্তু শ্রীনগর তো কাশ্মীর নয়, গুলমার্গ আর পহলগামই কাশ্মীরের সব নয়। এই যে আমরা জম্মুতে এখন আছি, এও একটি বিরাট প্রদেশ। আজ আমরা জম্মুর এলাকা ছাড়িয়ে কাশ্মীর প্রদেশে ঢুকতে পারব কি না সন্দেহ আছে। বানিহাল পাহাড় পেরলে কাশ্মীর উপত্যকা আরম্ভ হবে।

এ অঞ্চলের ভৌগোলিক ধারণা আমার নেই। অকপটে আমি এই কথা স্বীকার করলুম। সংসারচাঁদ বললেন: সেইটেই স্বাভাবিক। আর এই কথা স্বীকার করলেন বলে এ বিষয়ে আপনাকে আর অজ্ঞ থাকতে হবে না। সত্যি বলতে কি, আজকালকার লোকে জানি না বলতে

লজ্জা পায়, চোখ মেলে দেখেও না কিছু। শ্রীনগর থেকে দেশে ফিরে বলে, জম্মু! ও দেখেছি। কুড বাটোটের মতো একটা জায়গা, বাস অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। তার চেয়ে বানিহাল টানেলের গল্প অনেক যত্ন করে বলে। অথচ জম্মু হল কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী।

তারপরে এ রাজ্যের ভৌগোলিক কথা আমাকে সংক্ষেপে বললেন: প্রভিন্সকে আপনারা বোধহয় প্রদেশ বলেন। কাশ্মীর রাজ্যের দুটো প্রদেশ, কাশ্মীর আর জম্মু। জেলা চারটি করে— কাশ্মীরে শ্রীনগর বারামূলা অনন্তনাগ ও লাদাখ, জম্মুতে কাঠুয়া জম্মু উধমপুর ও ডোডা। সংস্কৃতির বিচারে কাশ্মীরে অঞ্চল হল তিনটি— জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ। লাদাখীদের ধরণ ধারণ অনেক পরিমাণে তিব্বতীদের মতো। এই রাজ্যের আয়তন নিতান্ত কম নয়। প্রায় পঁচাশি হাজার বর্গমাইল। গ্রেট ব্রিটেনের আয়তনের কিছু কম। কিন্তু এই রাজ্য কেন এত পিছিয়ে ছিল, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন। প্রায় গোটা রাজ্যটাই পাহাড় বন আর মরুভূমিতে পূর্ণ। একজনের কাছে শুনেছি যে এ রাজ্যের শতকরা ৩৬ বর্গমাইল জমিতে নাকি চাষ আবাদ হয়। এই সামান্য জমিতে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হয় তাতে কি ছত্রিশ লক্ষ লোকের পেট ভরে! আপনিই ভেবে দেখুন।

আমি পিছন ফিরে সংসারচাঁদের কথা শুনছিলুম। যাত্রীরা সবাই ফিরে এসেছিলেন, শুধু গণেশবাবুকেই দেখতে পেলুম না। ড্রাইভার এসে তার গদিতে বসল। বসেই হর্ন বাজাল। গণেশবাবু কোথায় ছিলেন জানি না, তিনি এক রকম ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলেন। ড্রাইভার মোটরে স্টার্ট দিয়েছিল। এবারে আবার যাত্রা শুরু হল।

এক ভদ্রলোক গণেশবাবুকে বললেন: খুব বেঁচে গেলেন। আর একটু হলেই আপনাকে ফেলে চলে যেত।

গণেশবাবু কোন উত্তর দেবার আগেই সংসারচাঁদ প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি রঘুনাথজীর মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন ?

জানালার ধারে মামী হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁকে উৎকর্ণ হতে দেখলুম।

গণেশবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ রঘুনাথজীর মন্দির বুঝি খুব কাছে ?

সংসারচাঁদ বললেন ঃ বেশি দূর নয়। ফেরার সময় রাতে জম্মুতে থাকবেন। সন্ধ্যাবেলা এখানে পৌঁছেই মন্দির দর্শন করে আসবেন। এক সঙ্গে অনেকগুলো মন্দির, অনেক জায়গা জুড়ে আছে। অনেকে তো জম্মুকে মন্দিরের শহর বলেন। মন্দিরের চূড়ো আপনারা দেখতে পান নি ?

তখন আমরা সদব রাস্তায় ফিরে এসে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। মন্দিরের চূড়া আর দেখতে পেলুম না। বুঝতে পারলুম না, এ কত বড় মন্দির। পরে জেনেছিলুম যে উত্তর ভারতে একসঙ্গে এতগুলি মন্দির নাকি বিরল। রঘুনাথ রামের মন্দির ঘিরে আছে আরও অনেক মন্দির, তাতে আছেন গণেশ শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা। সোয়া শো বছর আগে এই মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল। আর এরই জন্যে জম্মুকে বলা হয় মন্দিরের শহর।

সংসারচাঁদ কিছু লক্ষ্য করে বললেন ঃ রঘুনাথজীর মন্দির না দেখে ফিরে যাবেন না। জম্মু শহরেরও কিছু দেখতে পেলেন না তো ! ভাল শহর, আর ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। ফেরার পথে একদিন থেকে যাবেন।

সহসা আমরা লক্ষ্য করলুম যে বাস একটি নির্জন পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে পড়ল, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী হল, কেয়া হুয়া, বলে যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমরা সামনের দিকে চেয়ে কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। পিছনেও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে সবাইকেই বিরত হতে হল।

সংসারচাঁদ বললেন ঃ কাছেই বোধহয় ড্রাইভারের বাড়ি, খাবার আনতে কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে গেছে।

আমি বললুম ঃ তাহলে জম্মুর কথা আরও কিছু বলুন।

সংসারচাঁদ খুশী হয়ে বললেন ঃ জম্মু হল ডোগরাদের দেশ। এরা বলিষ্ঠ জাত। অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছে, যুদ্ধও করেছে অনেক। জম্মুর উঁচু উঁচু জায়গায় যে সব দুর্গ আছে, তার বেশির ভাগই এখন ভেঙে পড়েছে। জম্মু শহর তো তাওই নদীর বাম তীরে। শহরের সামনেই যে দুর্গটি পাহাড়ের উপর দেখা যায়, তার নাম বাহু দুর্গ। ঐ দুর্গের ভিতর বাহু রাজাদের সদর দপ্তর ছিল। শহরের উত্তর প্রান্তে আর একটি দুর্গ আছে, তার নাম রামনগর দুর্গ। গম্বুজের মতো আকার। তারই কাছে অমরমহল প্রাসাদ। রাজা কৃষ্ণদেব এখানে একটি বিখ্যাত মসজিদ তৈরি করেছিলেন।

হিন্দু রাজা মসজিদ তৈরি করলেন!

কেন করেছিলেন তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি সে সব কথা জানি না। আমাকে আপনি এখানকার শহর গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করুন।

আমি বললুম ঃ বেশ তো, আপনি তাই বলুন।

সংসারচাঁদ বললেন ঃ তাহলে গোড়া থেকেই বলি। মাধোপুর ছাড়বার পরে এই রাজ্যের সীমান্তেই আপনি কাঠুয়া শহর দেখেছেন! সেখান থেকে থেইন নামে একটা জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু দেখবার কিছু নেই। আমরা সাম্বায় এসেছিলাম। সাম্বায় রাজপুত সর্দারদের একটা দুর্গ আছে। তাতে এখন স্কুল আর সরকারি দপ্তর। পুঞ্চ এলাকায় যেতে হয় জম্মু থেকে। প্রথমে আখনুর শহর, চেনাব মানে

আপনাদের চন্দ্রভাগা নদীর দক্ষিণ তীরে আখনুর দুর্গ। এইখানেই গুলাব সিং মহারাজা রণজিৎ সিংহের কাছে রাজা উপাধি, লাভ করেছিলেন। আরও উত্তরে নৌসেরা ঝানগড় পুঞ্চ। পুঞ্চ থেকে রাওলকোট হয়ে ডোমেল ও মুজফ্ফরাবাদ। ঝিলাম নদীর তীরে এই দুটি শহর পাকিস্তান সীমান্তে নদীর এপারে ওপারে অল্প দূরে দূরে। এখান থেকে উরি হয়ে বারামূলা বেশি দূর নয়। অনেক দিন আগে লোকে রাওলপিণ্ডি মুরি হয়ে এই পথে শ্রীনগরে আসত। বারামূলা থেকে শ্রীনগর কত কাছে সে তো কাশ্মীর যুদ্ধের সময়েই জেনে গেছেন।

আমি সংক্ষেপে বললুম: মনে আছে।

সংসারচাঁদ বললেন: ঝাঁনগড থেকে সীমান্তের দিকে আরও দুটো ছোট শহর আছে, মীরপুর আর ভীমবার। জম্মু আর পুঞ্চ এলাকায় দুর্গ আছে অগণিত, তার কয়েকটির নাম আমার জানা আছে।

বললুম: বলুন।

সংসারচাঁদ নিজেই বলতেন। আমার প্রশ্নে উৎসাহ পেয়ে বললেন: কপুরগড জম্মু থেকে বারো মাইল দূরে। তারপর গুলাবগড়, রণবীরগড, অমরগড, সালাল দবহাল থানা গড়হি রাজমহল। রিয়াসি যেতে হয় উধমপুর পৌঁছবার আগে একটা বাঁহাতি রাস্তায়।

গণেশবাবু বললেন: আপনি কি কাশ্মীরে গাইডের কাজ করেন?

সংসারচাঁদ এই মন্তব্যের কঠিন উত্তর দিলেন, বললেন: আজ্ঞে আপনাদের সেবা করতে পারলে সৌভাগ্য মনে করতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আপনাদের গলা কাটাই আমার পেশা।

পরে আমাকে তিনি একটু আড়ালে ডেকে বলেছিলেন: কিছু মনে করবেন না, আপনার বন্ধুর পেশা আমার চেয়েও খারাপ বলে মনে হয়।

তখন আমি সে কথার উত্তর দিই নি। দিতে পারি নি। শ্রীনগরে দেখা হলে দিতে পারতুম। সেখানে আমরা গণেশবাবুর নূতন পরিচয় আবিষ্কার করেছিলুম।

বাসের ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করে করে অনেকেই আমরা পথে নেমে পড়েছিলুম। বন্ধ জায়গায় ভাল লাগছিল না। যাঁরা ভিতরে বসে ছিলেন, তাঁরা প্রচুর বিরক্ত হচ্ছিলেন। একজন বলছিলেন: এ সব দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। শ্রীনগরে পৌঁছে আমি রিপোর্ট করব।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন: বাসের নম্বরটা কত বলুন তো?

ভদ্রলোকের সাহেবি পোশাক, কথাবার্তা ইংরেজী। আমরা হিন্দীতে কথা বলছিলুম। একজন হঠাৎ বলে উঠলেন: এই যে, ড্রাইভার এসে গেছে।

কোথায় ড্রাইভার! ব্যস্ত হয়ে সবাই চারি দিকে চাইতে লাগলেন। একটি সুশ্রী মেয়েকে নিয়ে একজন তরুণ এসে উপস্থিত হয়েছে। তার হাতে কিছু মালপত্র। ড্রাইভারের পাশে যে ছোট বসবার জায়গাটি, তারই উপর মেয়েটিকে বসিয়ে মালপত্র গুছিয়ে রাখল। তারপর নিজে ঘুরে গিয়ে ড্রাইভারের গদিতে বসল।

তাড়াতাড়ি আমরা সবাই বাসে উঠে পড়লুম। এই লোকটাই কি আমাদের গাড়ি চালাবে! এতক্ষণ কে গাড়ি চালাচ্ছিল সে কথা আমাদের মনে পড়ল না।

ড্রাইভার আর হর্ন দিল না। একবার মাত্র পিছনে চেয়ে দেখে রুদ্ধশ্বাসে যাত্রা শুরু করল।

পরে একটা কথা জেনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল। জম্মু প্রদেশে একটি বিখ্যাত তীর্থ আছে, তার নাম বৈষ্ণো দেবী। অমরনাথের মতো দুর্গম না হলেও এ তীর্থের যাত্রাও সুগম নয়। কাশ্মীরে যেমন অমরনাথ, তেমান জম্মুতে বৈষ্ণো দেবী। যাত্রীর সংখ্যা এখানে অনেক বেশি। নানা রকমের মানৎ করে প্রায় সারা বছর ধরে এখানে যাত্রী আসে। শুধু বর্ষার দু তিন মাস এই যাত্রা বন্ধ থাকে।

এই তীর্থ সম্বন্ধে কিছু খবরও সংগ্রহ করেছিলুম। জম্মু শহর থেকে

উনচল্লিশ মাইল উত্তরে এই স্থান। তিরিশ মাইল দূরে কাট্‌রা নামের একটি ছোট পার্বত্য শহর পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে। বৈষ্ণো দেবীর যাত্রীর জন্যই এ শহরটি সারাক্ষণ জমজমাট থাকে। শহরের অনুপাতে এর বাসের আড্ডাটি বড়, তার চেয়েও বড় এর বাজার। টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের ডাক বাংলো আছে, হোটেল ধর্মশালা, যাত্রীদের থাকার ও খাবার সুব্যবস্থা। নবরাত্রির উৎসবের সময়ে এখানে অগণিত যাত্রীর সমাবেশ হয়।

কাট্‌রা থেকে বৈষ্ণো দেবী ন মাইল দূরে। যেতে হয় পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে চেপে। যাত্রীর ভিড় বেশি না থাকলে বৈষ্ণো দেবীর দর্শন সেরে এক দিনেই ফিরে আসা যায়। চেষ্টা করলে জম্মু থেকে সকালের বাসে বেরিয়ে রাতেই ফিরে আসা যায় জম্মুতে। জম্মু থেকে কাট্‌রা বাসে দেড় ঘণ্টার পথ।

কিন্তু বৈষ্ণো দেবীর দর্শন বড় কষ্টসাধ্য। কাট্‌রা থেকে একটা স্লিপে গ্রুপ নম্বর নিয়ে যাত্রা করতে হয়। শহরের প্রান্তে বাণগঙ্গা নদীর পুল, সেখানেই চেকপোস্ট। তার পর থেকে দুটো পথ—এক পথে ঘোড়া ডাণ্ডি যাচ্ছে ধীরে ধীরে, অন্য পথে সক্ষম যাত্রীরা পাথরের ধাপ ভেঙে তাড়াতাড়ি চলেছে। দুটো পথ মিলিত হয়, আবার আলাদা হয়।

চরণ পাদুকা নামে এক জায়গায় যাত্রীরা বিশ্রাম করে, চা খায়, আবার এগিয়ে চলে। আরও অনেকটা এগিয়ে প্রায় মাঝপথে আদি কুঁয়ারীর মন্দির। কথাটা বোধহয় আদি কুমারী। এই নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। জগজ্জননী মা কুমারী হয়ে কুমারী পূজা নিতে এসেছিলেন এক স্থানীয় ব্রাহ্মণের ঘরে। তারপরে যোগী গোরক্ষনাথের সঙ্গী ভৈরবনাথের তাড়া খেয়ে তিনি এখানকার মাতৃগর্ভ নামে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৈষ্ণো দেবীর গুহার সামনে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল ভৈরবনাথের সঙ্গে। ভৈরবনাথ নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দেহ সেখানে পাথরে পরিণত হয়েছে, এবং

মাথা আছে অদূরের পাহাড়ে। সেখানে নির্মিত হয়েছে ভৈরবনাথের মন্দির। আদি কুঁয়ারীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট।

তারপরেও চড়াই। এত সিঁড়ি বোধহয় জুনাগড়ের গির্জার পাহাড় ছাড়া আর কোথাও নেই। শেষ পথটুকু উৎরাই। কাট্‌রার স্লিপ দেখিয়ে এখানে নতুন স্লিপ পাওয়া যায়। নতুন গ্রুপ। এক গ্রুপে কয়েক শো যাত্রী। মন্দিরে প্রবেশের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

শেষ পথটুকু বড়ই কষ্টের। লোহার রেলিং দেওয়া সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে গুহার মুখ। চরণ-গঙ্গা নামে একটি নদী সেই দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। তারই শীতল ধারার উপর দিয়ে যাত্রীদের মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে অন্ধকারে এগোতে হবে। অনেকটা পথ এগোবার পরে মায়ের দর্শন পাওয়া যাবে। তাঁরই সঙ্গে আছেন মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহা-সরস্বতী। পূজারীরা অপেক্ষা করতে দেবেন না, তিরুপতির মতো তাড়া দিয়ে অন্য পথে বার করে দেবেন।

বড় জাগ্রত দেবতা, তাই যাত্রীর স্রোত এই গুহাতীর্থে অব্যাহত থাকে। জম্মুতে রঘুনাথ রামের মন্দিরের মতো এই রকম শক্তির মন্দিরও অনেক আছে। রাম ও শক্তি এই দুই নিয়ে ডোগরাদের দেশ জম্মু।

৭

জম্মুর পরেই পাহাড়ের আরম্ভ। এখান থেকে প্রায় একশো তিরিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করে কাশ্মীরের উপত্যকা। মোটরের পথে আমরা পর্বতের তরঙ্গ দেখতে পাই নে। উঁচু নিচু পথ দেখে কিছু অনুমান করি। উড়োজাহাজে চড়ে আকাশ পথে উড়ে গেলে হয়তো এই তরঙ্গশ্রেণী দেখা যাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একটার পরে আর একটা। কোনটা ছোট, বড কোনটা। মোটর বাসগুলো পিঁপড়ের মতো এই ঢেউয়ের উপর দিয়ে চলেছে। শৈশবে ভূগোলের বই-এ পড়েছিলুম যে এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে সমান্তরাল ভাবে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের সমতল ভূমির পরে শিবালিক পর্বত শ্রেণী এক হাজার ফুট উঁচু, আর এর বিস্তার প্রায় দশ মাইল। এর পরে পীর পাঞ্জাল পর্বত শ্রেণী প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করে এই পাহাড় পেরোতে হয়। অবিভক্ত ভারতের পুরাতন পথে এই পাহাড় ডিঙিয়ে কাশ্মীরে যেতে হত। এখন এই নূতন পথে বানিহালের নিকটে সুড়ঙ্গ ভেদ করে ওপারে যেতে হয়। হিমালয়ের মূল শ্রেণী কাশ্মীব উপত্যকার উত্তরে। এর উচ্চতা প্রায় কুড়ি হাজার ফুট। এই শ্রেণীতেই নাঙ্গা পর্বত। জাস্‌কার ও লাদাখ নামেও হিমালয়ের দুটি শাখা এই ভাবে বিস্তৃত। জোজিলা গিরিপথ পেরিয়ে লাদাখ প্রদেশে পৌঁছতে হয়। কৈলাসের পথে গুরলা মান্ধাতা শৃঙ্গ এই পাহাড়েই অবস্থিত। এরও উত্তরে কারাকোরম পর্বতশ্রেণী—বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ কে২ বা মাউণ্ট গড্‌উইন অষ্টিনের জন্য বিখ্যাত। তারপরেই এই গিরিশ্রেণী নিচু হয়ে রাশিয়ার পাহাড়ের সঙ্গে মিলে গেছে

এখন আমরা বোধহয় পীর পাঞ্জাল অতিক্রম করছি। চন্দ্রভাগা নদী এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। আমরাও বোধহয় এই নদী কোনখানে পার হব। সহসা আমার সেই জায়গাটির কথা মনে পড়ল না। সেই জায়গাটির নাম আমি কোথাও শুনেছি কিনা তাই ভাবছিলুম। ওপাশ থেকে স্বাতি বলল : গোপালদার এখন ঘুম পাচ্ছে।

কথাটি যে আমাকেই বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। উত্তরে আমি শুধু চোখ মেলে তার দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : তোমার দুর্বলতার সম্বন্ধে তুমি অচেতন বলেই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণনার চেয়ে কাহিনী বড় হয়ে উঠেছে।

এ অভিযোগ আমিও শুনেছি, কিন্তু কোন উত্তর দিই নি। মানুষের রুচি বিচিত্র, তাই ভ্রমণেরও বিচিত্র রস। নিজে যখন ঘরের বাহিরে যাই নি, তখন অন্যের মুখে ভ্রমণের গল্প শুনেছি। একই জায়গা থেকে ঘুরে এসে কেউ আনন্দের কথা বলেছে, কেউ কষ্টের কথা। কারও গল্পে খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধার কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে, পথের বর্ণনার কথা বিশেষ শুনি নি। আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে স্বাতি বলল : এমন হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেবার কথা বলি নি।

বললুম : কথা তো ঘুড়ি নয় যে উড়িয়ে দেওয়া যায়! নীরব না থাকলে তর্ক বাধে।

স্বাতি বলল : তার মানে, লোকে যা বলে তা ভুল।

তাও নয়।

তবে ?

বললুম : এই যে একটু আগে আমরা একটা লোকালয় ছাড়িয়ে এলুম, তার একটা নাম আছে। গাইড বই খুললে হয় তো দেখা যাবে সে জায়গার নাম নাগ্রোটা। সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা

এগারো শো পঁয়ষট্টি ফুট, একটা পোস্ট অফিসও হয়তো দেখতে পাওয়া গেছে। এর পর সামনে যে লোকালয় আসছে, তার নাম মনে কর নন্দ্‌নি। তারপর ঝাজ্জর। সে জায়গার উচ্চতা ষোল শো তিরিশ ফুট। এই সব সংবাদ পরিবেশন করলে ভ্রমণ কাহিনী ওজনে ভারি হবে ঠিকই, কিন্তু কাশ্মীর ভ্রমণের আনন্দ উপলব্ধির সহায় হবে কি ?

স্বাতি দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপরে বলল : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও বর্ণনা করা যায়।

তা যায়। পথের এক ধারে পাহাড়, অন্য ধারে গভীর খাদ। একটু অসাবধান হলে গাড়ি গড়িয়ে পড়বে অতলে। পাহাড়ের গায়ে, কী বলব, দেবদারু আর ঝাউ গাছ। কিংবা যদি বল, জিজ্ঞাসাবাদ করে না হয় সমস্ত গাছের নামগুলো জেনে নিয়ে তাদের গুঁড়ি থেকে পাতার বর্ণনা পর্যন্ত লিখে দিতে পারি। তাতে কি লেখার উৎকর্ষ বাড়বে ?

মামা এতক্ষণ চোখ বুজেই ছিলেন। কিন্তু আমাদের কথা যে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন তা বুঝতে পারি নি। এবারে বলে উঠলেন : বর্ণনা যত ভালই হোক, তা পড়ে কোন্ পাহাড় তা কেউ বুঝবে না। ছবি দেখেও বোঝা সম্ভব নয়।

বললুম : তবেই দেখ, পথের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা কত অসার্থক।

মামা বললেন : হাস্যকর বল।

স্বাতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল : কেন ?

মামা বললেন : এই পথের বর্ণনা খুব ভাল করে লিখে নাও, আর একখানা ছবি তোল। ভারতবর্ষের সব পার্বত্য পথেই সেই বর্ণনা আর ছবি কাজে লাগাতে পারবে।

মামার এই মন্তব্য অতিরঞ্জিত হলেও মিথ্যা নয়। সমস্ত পাহাড়ের পথই আমার কাছে একই রকম মনে হয়েছে। শৈশবে যেমন সব সাহেবকেই একই ব্যক্তি বলে মনে হত তেমনি। পথের

বর্ণনায় আমি তাই গুরুত্ব দিই না। পাঠকের অভিযোগ আমি সত্য বলে মেনে নিই। কিন্তু স্বাতির কাছে পরাজয় স্বীকারে আমার আপত্তি ছিল বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি নিঃশব্দে হাসলুম।

স্বাতি বলল : এই তো আমরা কাংড়া দেখে এলাম। কাশ্মীরের পথ কি একই রকম মনে হচ্ছে ?

বললুম : না।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল : এ কথা স্বীকার করলে বলে ধন্যবাদ।

আমিও হেসে বললুম : কাংড়া উপত্যকা, আর এ হল পাহাড়। কী করে এক রকম মনে হবে !

উধমপুরে আমাদের বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। খাবার জন্যে এইখানেই নামতে হবে কিনা দু একজন জানতে চেয়েছিলেন। ড্রাইভার কোন উত্তর না দিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

জম্মু থেকে উধমপুর প্রায় আটত্রিশ মাইল, উচ্চতা প্রায় দু হাজার আড়াই শো ফুট। এখান থেকেই রামনগরের পথ বেরিয়েছে। আমরা ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগলুম। কুড এখান থেকে চব্বিশ মাইল দূরে, চার হাজার ন শো ফুট উঁচুতে একটি ছোট বস্তি। কিন্তু এখানেই পাহাড়ের শেষ নয়। পাটনি টপ বলে একটা জায়গা প্রায় সাড়ে ছ হাজার ফুট উঁচু, কুড থেকে দূরত্ব মাত্র এগার মাইল। তারপর পথ নিচের দিকে নেমেছে। পাঁচ মাইল নেমে এলেই বাটোট, তার উচ্চতা পাঁচ হাজার দু শো ফুট। এ সব কথা কোন যাত্রীর কাছে জানতে পারি নি, জেনেছি একখানা বই পড়ে। শ্রীনগরের টুরিস্ট অফিসের সংলগ্ন বইএর দোকানে এ বই কিনতে পাওয়া যায়।

কুডে পৌঁছবার আগেই আহারের জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। গাড়ি থামতেই সবাই ঝুপঝাপ করে নেমে পড়লেন। আমরাও নামলুম।

ছোট জায়গা। অল্প কিছু দোকান পাট আর হোটেল রেস্টরেণ্ট। এ সব হোটেল বা রেস্টরেণ্ট দেখে কারও ভক্তি হবে না। নিতান্ত আটপৌরে ব্যবস্থা, ক্ষুধা না থাকলে হয়তো নোংরা পরিবেশ বলেই মনে হবে। নিচের তলায় খাবার জায়গা, ওপর তলায় কয়েকখানা ঘর। চারপাই ছাড়া আসবাব আর কিছু নেই। বাথরুমের ব্যবস্থা দেখে সবাই হতাশ হলেন। মামী বললেন: এখানে মানুষ থাকে কী করে?

জানা গেল যে এখানেও জম্মু ও উধমপুরের মতো ডাকবাংলো ও রেস্টহাউস আছে। সেখানকার ব্যবস্থা ভাল। ডাকবাংলোয় খানসামাও আছে, খাবার পাওয়া যায়। পাঠানকোট থেকে যাদের বিলম্বে যাত্রা করতে হয় তারা সেখানে রাত্রিবাস করে। এই জন্য কাশ্মীর সরকার নাকি ডাকবাংলোয় থাকবার ব্যবস্থা বাড়িয়েছেন। কিন্তু সে জায়গা কত দূরে আমরা জানি না। আমাদের বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার সামনের হোটেলেই আমরা ঢুকে পড়েছিলুম।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই আজকাল টেবিল চেয়ারে বসে খাবার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এখানেও তাই। কাঁসা পেতলের বাসন উঠে গিয়ে চিনেমাটির বাসনই বেশি চলেছে। তাতে নোংরামি কমেছে। বাসন খারাপ হবার আগেই ভেঙে যায়। চিনেমাটির প্লেটে যখন ভাত ডাল তরকারি ও মাংস এল তখন মামার মুখে আমি প্রসন্নতা দেখলুম। সেই প্রসন্নতাটুকু তিনি চেপে রাখবার চেষ্টা করলেন না। বললেন: এ দেশের চালটা ভালই দেখছি।

মামীর অপ্রবৃত্তি তখনও যায় নি, বললেন: ভেতরে কী নোংরামি করে রেখেছে, কে জানে!

বাহিরে এক জায়গায় জল ছিল, তাতেই মুখ হাত ধুয়ে আমরা বসেছি। বেলা অনেক হয়েছিল, খিদেও বেশ প্রবল। কাজেই কথাবার্তায় সময় নষ্ট না করে আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলুম। তাড়াতাড়ি করবার আরও একটু কারণ ছিল। সেটা বাস ছেড়ে

খাবার ভয়। কতক্ষণ দাঁড়াবে জেনে নেওয়া হয় নি। তাই দেরি করা যুক্তিযুক্ত নয়।

খেতে খেতেই আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। একে একে অনেকগুলো বাস এসে এখানে পৌঁছল। যাত্রীরা নেমে পড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারি দিকে। অনেকেই এখানে খাবে, আবার কেউ এই জায়গাটা ঘুরে দেখবে।

হোটেলের খাবারের দাম এখানে বেশি নয়। পয়সা মিটিয়ে আমরা যখন আবার পথে নামলুম, সকলের আহার তখনও শেষ হয় নি। আমরা ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগলুম। পাশের দোকান থেকে পান কিনে খেলুম। স্বাতিও একটা পান খেল।

মধ্যাহ্নের রৌদ্র এখানে তীব্র নয়, ভাল লাগছে এই রৌদ্র। বাতাসে হিম নেই, আছে স্নেহের স্পর্শ। রোদে ও হাওয়ায় মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

একে একে যাত্রীরা যখন আহার ও ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এল, তখন বাস ছাড়ল। এতক্ষণ দাঁড়াবে জানলে আমরা তাড়াহুড়ো করতুম না, কিংবা আর কোন ভাল হোটেল আছে কিনা তা খোঁজ করে দেখতুম। মামা মামী আমাদের সঙ্গে পান খেতে যান নি, তাঁরা গিয়ে বাসে উঠেছিলেন। মামা তাঁর পাইপ ধরিয়ে চোখ বুজে তামাক খাচ্ছিলেন। গাড়ি ছাড়তেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : পারবে তো সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে?

বললুম : সবাই তো তাই আশা করছেন।

মামা বললেন : এদের যে আবার সময়ের হুঁশ নেই!

কুড ছেড়ে আমরা আরও উপরে উঠতে লাগলুম। ছায়া-শীতল অন্ধকার পথ দিয়ে আমরা পাট্‌নি টপে উঠে গেলুম। দার্জিলিঙের মতো উঁচু এই জায়গা। তারপর উৎরাই। বাটোটে আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। এখানেও ডাকবাংলো আছে, হোটেল আছে। যে বাসগুলো আমরা কুডে দেখে এলুম, তারা এগিয়ে

যাবে। কিন্তু যারা আরও পিছনে আছে, তাদের হয়তো এখানেই রাত কাটাতে হবে। কে কোথায় রাত কাটাবে, আগে থেকে কেউ তা বলতে পারে না।

পাহাড়ের গা বেয়ে যেমন করে আমরা উপরে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি করেই আবার পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে নিচে নেমে এলুম। দু এক শো ফুট নিচে নয়, চার হাজার ফুটেরও বেশি। পীর পাঞ্জালের দুই তরঙ্গের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা চন্দ্রভাগা নদী। রামবান নামে একটা জায়গায় এই নদী পার হতে হয়। এখানকার উচ্চতা উধমপুরের মতো দু হাজার আড়াই শো ফুট। একটা রেস্টহাউস আছে, হাসপাতাল ডাকঘর আছে। আর আছে রঘুনাথের একটি মন্দির। ছোট লোকালয়। একটা ঝুলোনো পুলের উপর দিয়ে আমরা চন্দ্রভাগা পার হলুম। তারপর সে শহর পেরিয়ে আবার চড়াই। বানিহাল পর্যন্ত আমরা উপরে উঠব। সমুদ্র সমতল থেকে পাঁচ হাজার ছ শো ফুট উঁচুতে বানিহালের লোকালয়। তারপরেও পথ উপরে উঠেছে। সাত হাজাব আড়াই শো ফুটে বানিহাল টানেল। তারপবে কাশ্মীরের উপত্যকা আরম্ভ হবে।

পুল পার হবার সময় স্বাতি বলল: এ কোন্ নদী গোপালদা?

আমি সংক্ষেপে বললুম: চন্দ্রভাগা।

স্বাতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল: ধরমশালায় মিস্টার ঘোষের কাছে যে চন্দ্রভাগার কথা শুনেছি, এ কি সেই চন্দ্রভাগা!

মিস্টার ঘোষ বলেছিলেন, লাহৌল উপত্যকায় চন্দ্রা ও ভাগা নামে দুটি নদী মিলিত হয়েছে, সেই মিলিত স্রোতের নাম চন্দ্রভাগা। সেই নদীই জম্মু প্রদেশে প্রবেশ করেছে বলে আমি জানি। বললুম: দ্বিতীয় চন্দ্রভাগার নাম তো আমি শুনি নি। তবে এ দেশে এই নদী চেনাব নামে পরিচিত, আর বিতস্তার নাম ঝিলম। এই কাশ্মীর রাজ্যেই ঝিলমের উৎপত্তি হয়েছে।

মামা বললেন: ঝিলম পেরোবার জন্যও কি আমরা আর একটা

পাহাড় ডিঙোব ?

এ প্রশ্নের উত্তর স্বাতি দিল, বলল : শ্রীনগর শহর তো শুনেছি ঝিলমের তীরে।

মামা বললেন : তাহলে আমাদের কটা পাহাড় ডিঙোতে হবে ?

বললুম : বোধহয় আর একটাও নয়।

কেন ?

বানিহালের পাহাড় আর ডিঙোতে হয় না। শুনেছি একটা বিরাট টানেল তৈরি হয়েছে, সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড়ের এধার থেকে ওধারে পৌঁছনো যায়।

মামা ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন : খবরের কাগজে এ কথা বেরিয়েছিল, তাই না ?

আমি এ কথা মেনে নিলেই মামা আত্মপ্রসাদ পাবেন জানি, তাই বললুম : আপনার ঠিকই মনে আছে।

মামা একবার মামীর দিকে তাকিয়ে বললেন : ভারত স্বাধীন হবার পরে কাশ্মীর যাতায়াতের খুবই কষ্ট হয়েছিল বলে শুনেছি।

বললুম : হবেই। কাশ্মীর যাতায়াতের অন্য পথটাই ছিল ভাল। রাওলপিণ্ডি থেকে মারি হয়ে ঝিলমের তীরে তীরে সেই পথ। দেশ বিভাগের সময় রাওলপিণ্ডি আর মারি পাকিস্তানে পড়ল। কাজেই ভারত থেকে কাশ্মীরে যাবার অন্য পথ চাই। সেই অন্য পথ বানিহাল পাসের উপর দিয়ে। প্রায় ন হাজার ফুট উঁচু।

স্বাতি বলল : ন হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাতায়াত কি সোজা কথা !

বললুম : তবেই দেখ এই পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গ তৈরির প্রয়োজন হল কেন !

গোঁ গোঁ শব্দ করে আমাদের বাস উপরে উঠছে। ছুটো ছোট লোকালয় আমরা পার হয়ে এসেছি। রামবান থেকে বানিহালের দূরত্ব চব্বিশ মাইল। চড়াই প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট। সেখান

থেকে আরও এগার মাইল অতিক্রম করলে সুড়ঙ্গ পথের দক্ষিণ মুখ। সাত হাজার আড়াই শো ফুট উঁচুতে। তার মানে রামবান থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠতে হয়। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের এই সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেতে হবে।

এ দিকে পথের উপর শুভ্র রৌদ্র আর নেই। দিনের আলো নিভে আসছে। মাঝে মাঝে অন্ধকার মনে হচ্ছে পথ। গাছের ছায়ার অন্ধকার। তারপরেই আবার আলোকিত পথ দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আমাদের বাস দাঁড়িয়ে গেল। খানিকটা তফাতে একখানা ছোট ঘর, দু একজন মানুষ। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা জলের সরু ধারা ঝির ঝির করে ঝরছে। আর কিছু নেই।

আমরা আশ্চর্য হয়ে সামনে তাকালুম, তাকালুম পথের দুধারে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। এ তো বানিহাল নয়! এ কোন্ জায়গা বুঝতে না পেরে যখন ড্রাইভারের দিকে তাকালুম, তখন তাকেও তার জায়গায় দেখতে পেলুম না। কোথায় গেল লোকটা!

মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : কী হল?

আমি বললুম : বুঝতে পারছি না।

স্বাতি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : দেখ দেখ।

তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমরাও দেখতে পেলুম ড্রাইভারকে। তার সঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে সে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ঝোলাঝুলি তারই হাতে।

মামা বললেন : সর্বনাশ! লোকটা কি চলে গেল নাকি!

আমাদের পিছনে যাঁরা বসেছেন, তাঁরাও এ দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। একজন তো রীতিমতো ক্ষেপে উঠলেন, বললেন : কী আবদার দেখুন! এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

দেখতে দেখতেই তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর মামা জিজ্ঞাসা করলেন :

বানিহাল এখান থেকে কত দূর ?

বললুম ঃ মাইল কয়েক নিশ্চয়ই হবে।

পরম ঔৎসুক্য নিয়ে মামা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আরও কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বানিহাল থেকে শ্রীনগর কত দূর ?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

এ প্রশ্নের উত্তর স্বাতির জানা ছিল না। সে একটা ছোট ব্যাগ খুলে একখানা সরকারি পুস্তক বার করল। তার থেকে তথ্যটা সংগ্রহ করে বলল ঃ এক শো বিরাশি থেকে এক শো ষোল মাইল বাদ যাবে। মানে—

আমি বললুম ঃ ছেষট্টি মাইল।

মামা বললেন ঃ সর্বনাশ !

মামী এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবারে বললেন ঃ সর্বনাশ কেন ?

ভয়ে ভয়ে মামা বললেন ঃ বানিহালেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

পিছনের যাত্রীরা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। একজন বললেন ঃ শ্রীনগরে পৌঁছেই একটা কমপ্লেন করতে হবে। লোকটার চাকরি যাওয়া উচিত।

আর একজন বললেন ঃ আহা, বেচারা বউকে পৌঁছতে গেছে তার বাপের বাড়ি, তার জন্যে এত রাগারাগি কেন !

সহসা বাস আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। সবাইকে চমকে দিয়ে অতর্কিতে আবার যাত্রা শুরু করল। ড্রাইভার কোন্ পথে ফিরে এসে নিজের জায়গায় উঠে বসেছিল, তা আমরা কেউই দেখতে পাই নি। যে পথে সে উঠে গিয়েছিল, আমাদের চোখ ছিল সেই পথের উপরেই।

মামা বললেন ঃ দেখেছ হতভাগাকে, কী বিদ্যুৎ বেগে চালাচ্ছে এখন ! পাহাড় থেকে ফেলে না দিলে বাঁচি !

মামী চোখ বন্ধ করলেন। মনে হল, তিনি দুর্গা নাম স্মরণ করছেন।

৮

অল্পক্ষণ পরেই আমরা বানিহালে এসে পৌঁছে গেলুম। বাস থামল কয়েকটা দোকানের সামনে। যাত্রীরা সবাই চা খাবার জন্য নেমে পড়লেন।

এখানে ডাকবাংলো আছে, রেস্টহাউস আছে। যাত্রীদের ভিড় বেশি হয় বলে ডাকবাংলোয় থাকবার ব্যবস্থা ভাল করা হয়েছে। নতুন ডর্মিটরিও তৈরি করা হয়েছে।

মামা বললেন: আমাদেরও নামতে হবে নাকি?

আমি বললুম: ইচ্ছে না থাকলে নামবেন কেন!

স্বাতি নামছিল। বলল: চায়ের ব্যবস্থা আমি করছি।

মামা আমার দিকে তাকাতেই আমিও নেমে পড়লুম।

সংসারচাঁদ পাশের দোকানেই চায়ের ফরমায়েস করেছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন: চা খাবেন তো?

বললুম: খাব।

ভদ্রলোক নিজেদের ভাষায় চা ওয়ালাকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: লিট্‌ল্ কাশ্মীর কাকে বলে জানেন তো?

বললুম: না।

জানেন না!

তারপর নিজেই বললেন: তা জানবেন কী করে! এ সব নাম তো ভূগোলে নেই যে জানবার সুবিধে আছে!

বললুম: বানিহালের নাম বুঝি লিট্‌ল্ কাশ্মীর?

সংসারচাঁদ হেসে বললেন: ভাদরওয়ার নাম।

এ নাম আমি শুনি নি। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি

এ কথা বুঝতে পারলেন। বললেন: বাটোট নামে একটা জায়গা আমরা পিছনে ফেলে এলাম, সেখান থেকে ভাদরওয়া প্রায় পঞ্চাশ মাইল। সুন্দর উপত্যকা। কেউ বলে ভ্যালি অব গড্‌স্, কেউ বলে ল্যাণ্ড অব সরসেরি বা ডাইনির দেশ। বিদেশীরা কেউ সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে, কেউ করে জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টের সঙ্গে তুলনা। সেখানে গেলে আপনাদেরও ভাল লাগবে।

চা ওয়ালা তখন তৎপর হাতে চা পরিবেশন আরম্ভ করে দিয়েছে। যাত্রীরা হাত বাড়িয়ে নিতে লাগল। আমরাও নিলুম। প্রথমে বাসের কাছে গিয়ে মামা ও মামীকে দিয়ে এলুম, তারপর নিজেরা।

সংসারচাঁদ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন: শ্রীনগরের পথের চেয়েও ভাদরওয়ার পথ আপনাদের ভাল লাগবে। পথের ধারে চেনাব নদী আপনারা অনেকক্ষণ দেখতে পাবেন। এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়, মাঝখানে সংকীর্ণ পথ। তারপরে একটা বাঁক ঘুরেই সেই উপত্যকা দেখতে পাবেন। অপূর্ব দৃশ্য। আশাপতি গ্রেসিয়াব আপনাদের চোখের সামনে ঝকমক কবে উঠবে। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে ধানের ক্ষেত, ছোট ছোট নদী, ঘন অরণ্য ও কালো মেঘের লুকোচুরি খেলা আপনাদের মন হরণ করবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: ভাদরওয়া কোন শহর, না তীর্থ স্থান?

সংসারচাঁদ উত্তর দিলেন: দুই-ই। ভাদরওয়া তহসিলের প্রধান শহর এটি, স্কুল কলেজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই এর সমধিক নাম। জম্মু ও শ্রীনগরের চেয়েও এ অঞ্চলের লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে বেশি। অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল।

সংসারচাঁদ চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে বললেন: শ্রীনগর পৌঁছে তো আপনারা ছুটোছুটি করে বেড়াবেন—কোন দিন গুলমার্গ, কোন দিন পহলগাম, সোনমার্গ, য়ুসমার্গ—আমার মনে হয়, সেখানে দুদিন কম থেকেও এই ছোট শহরটি ঘুরে যাওয়া উচিত। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এই শহরটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে কাশ্মীর শুধু

শ্রীনগরেই সীমাবদ্ধ নয়। শহরে একটি ডাকবাংলো আছে, সেইখানে রাত কাটাবেন।

আমি বললুম: আর তীর্থের কথা কী বলছিলেন?

সংসারচাঁদ বললেন: তীর্থের নাম হল বাসিক নাগ। চোদ্দ মাইল দূরে বাসিক কুণ্ডে এ অঞ্চলের সমস্ত লোক এসে সমবেত হয়। চোদ্দ হাজার চার শো ফুট উঁচুতে কৈলাস লেক, তারই নাম বাসিক কুণ্ড। রাখী পূর্ণিমার পরের অমাবস্যায় এই তীর্থ দর্শনের নিয়ম। জম্মু প্রদেশে এত বড় তীর্থ আর দ্বিতীয় নেই।

বাসিক নাগ কোন্ দেবতা আমি বুঝতে পারি নি, জিজ্ঞাসা করতেও দ্বিধা হল। সংসারচাঁদ এ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না, বললেন: শহরে বাসিক নাগের একটা মন্দির আছে। খুব প্রাচীন কাঠের মন্দির। তার ভিতর কালো মার্বেল পাথরে তৈরি বাসিক নাগের ছুটো মূর্তি। মানুষের আকার।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে বাসুকি নাগকে সংসারচাঁদ বাসিক নাগ বা ওয়াসিক নাগ বলছেন। বললেন: এই মন্দিরের সামনে থেকেই 'ছড়ি' যাত্রা করে। তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের হাতে লোহার পাত থাকে সাপের আকৃতির। নানা রকমের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে তারা চলে।

এ কথা শোনবার পর বাসুকি নাগ সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। স্বাতিও আমার দিকে তাকিয়ে বলল: ইনি বাসুকি নাগের কথা বলছেন, তাই না গোপালদা?

আমি বললুম: ঠিক তাই।

তারপর সংসারচাঁদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: বাসুকি কুণ্ডে উৎসবটা কী রকম?

সংসারচাঁদ বললেন: বাসিক কুণ্ডের ধারে এ অঞ্চলের প্রায় চার পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়। সেখানে পৌঁছেই ছাগল বলি হবে অনেকগুলি। তারপর রাতে মস্ত বড় আগুন জ্বেলে তার চারি দিক

ঘিরে নাচ গান। লোকের ধারণা যে সেই অমাবস্যার রাতে নাগরাজ বাসিক নাগ কুণ্ডের জলে দেখা দিয়ে ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।

স্বাতি বলল : কেউ দেখেছে [illegible]?

উত্তর আমি দিলুম, বললুম : দেবতাকে চোখ বুজে দেখতে হয়।

সংসারচাঁদ খুশী হয়ে বললেন : খুব খাঁটি কথা বলেছেন।

চা শেষ করে আমরা চায়ের পেয়ালা ফিরিয়ে দিলুম। পয়সাও দিলুম মিটিয়ে। সংসারচাঁদ বাসে উঠবার আগে আশাপতি গ্রেসিয়ারের কথাও বললেন : সেও এক তীর্থ। এখানেও উৎসব হয় বাসিক কুণ্ডের মতো এক বছর পরে পরে। অগস্ট সেপ্টেম্বরে আর একটা জিনিস আপনাদের ভাল লাগবে! গ্রামে গ্রামে মেলা হয় এক জায়গার পরে আর এক জায়গায়। এই মেলার নাম কুড। রাতে এই মেলা হয়। একটা বিরাট আগুন জ্বেলে পুরুষেরা সেজেগুজে নাচবে। অনেক জায়গায় মেয়েরাও যোগ দেয়। নাচের সঙ্গে গান ও বাজনা। গদ্দি মেয়ে পুরুষ দেখেছেন? ভারি সুন্দর দেখতে। এই অঞ্চলের গদ্দি মেয়ে পুরুষ—

বলে সংসারচাঁদ থামলেন। সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে কিছু দেখছিলেন। এবারে আমরাও দেখতে পেলুম। গণেশবাবু একটা বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে এলেন। সংসারচাঁদ তাঁর কথা আর শেষ করলেন না। বললেন : আপনার বন্ধুর চলা ফেরা একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। ওঁর সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন।

দূরে একখানা বাস দেখা গেল। এইবারে এক একখানা করে আরও বাস এসে এখানে পৌঁছবে। আমরা পথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। ওরাও নিশ্চয় কোথাও সময় নষ্ট করেছে, কিংবা ধীরে ধীরে এসেছে এতক্ষণ। সহসা সংসারচাঁদ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন : চলে আসুন।

বলে এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠলেন। আমরাও উঠলুম। ওধার থেকে ড্রাইভার বাসে উঠেই হর্ন বাজাল। তারপর স্টার্ট দিয়েই বাস ছাড়ল। পিছনে একবার তাকিয়ে দেখেছিল কিনা, তাও দেখতে পেলুম না।

৯

একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মামা তাঁর পাইপ পরিষ্কার করেছিলেন। তারপর নতুন করে আগুন ধরিয়েছিলেন। মুখে তাঁর অদ্ভুত প্রসন্নতা দেখছিলুম। খানিকটা ধোঁয়া টেনেই বললেন: বুঝলে গোপাল, আম্বাটায় আর আমাদের পড়ে থাকতে হবে না।

এই কথায় আমি তাঁর প্রসন্নতার কারণ বুঝতে পারলুম। বললুম: তা ঠিক, বানিহাল পার হলেই তো পাহাড় ফুরিয়ে গেল।

স্বাতি বলে উঠল: পাহাড় ফুরোলেও পথ তো ফুরোবে না। কোথাও আটকালেই হল।

মামা বললেন: আটকালে ক্ষতি নেই, গড়িয়ে না পড়লেই হল।

বানিহালের ছোট লোকালয় ছাড়িয়ে আমাদের বাস আবার উপরে উঠতে লাগল। পাহাড়ে ওঠার যেন আর শেষ নেই।

স্বাতি বলল: কাশ্মীরে কি পাহাড়ের শেষ আছে! এ পাহাড় পেরিয়ে হয় তো অন্য পাহাড় দেখব।

মামা ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন: তাই নাকি গোপাল!

আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললুম: শ্রীনগর পর্যন্ত আর নতুন পাহাড় নেই।

ন হাজার ফুট উপরে বানিহাল পাস পর্যন্ত আমাদের উঠতে হল না। সাত হাজার আড়াই শো ফুটেই বানিহাল টানেলের দক্ষিণ মুখ পেয়ে গেলুম। অন্ধকার তখনও হয় নি। শুধু দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে। ড্রাইভার তার গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ। মোটরের আলোয় অন্য কোনও আলো আছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না। রুদ্ধ শ্বাসে সবাই

বসে রইলুম। যাত্রীরাও এখন আর কথা কইছে না। ভিতরে নিস্তব্ধ, বাহিরে দু ধারের দেওয়ালে আমরা গাড়ির শব্দেরই প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলুম।

অনেকটা পথ অতিক্রম করে আমরা সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছলুম। আবার সেই পার্বত্য পৃথিবী দিনের শেষ আলোয় সুন্দর রূপে দেখা দিল। যাত্রীরা কে কী বললেন, আমি শুনতে পাই নি। আমি মামার প্রশ্ন শুনলুম: এই টানেলটি কত লম্বা?

আমি এর মাপ জানতুম না। স্বাতি তার বই খুলে বলল: ও বাবা, এ যে দেড় মাইল লম্বা দেখছি!

মামা বললেন: তা হবে।

স্বাতি হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: পুরাণে বানিহালের নাম নেই গোপালদা?

আমি কিছু না ভেবেই বললুম: আছে।

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন: আছে নাকি!

সত্যিই কোথাও আছে কিনা আমি সেই কথাই ভাবছিলুম।

স্বাতি বলল: গোপালদা এইবারে চাল দিয়েছেন, এখন আর মেলাতে পারছেন না।

স্বাতির মন্তব্য শুনে মামা হাসলেন। কিন্তু আমার একটি ইংরেজী প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে গেল। তাতে কাশ্মীরের সম্বন্ধে কিছু পৌরাণিক কাহিনী পড়েছিলুম। সত্য কি মিথ্যা সে আলোচনা নয়, শুধু এ দেশের একটা প্রবাদের কথা লেখক লিখেছিলেন। বললুম: বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে দুটি অবতার হয়েছিল এই দেশে। মৎস্য ও বরাহ।

মামীও এবারে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

বললুম: এই পীর পাঞ্জাল পর্বত শ্রেণীর সব চেয়ে উঁচু শিখরটির নাম নৌবন্ধন তীর্থ। বানিহাল পাসের পশ্চিমেই সেই তীর্থ। যে নৌকোয় সৃষ্টি রক্ষা হয়েছিল, মৎস্যরূপী বিষ্ণু সেই নৌকো টেনে নিয়ে

গিয়ে নৌবন্ধন তীর্থে বেঁধেছিলেন। দুর্গা নিজে হয়েছিলেন নৌকো।

মামা বললেন : আশ্চর্য কথা!

বললুম : আরও আশ্চর্য হবেন বরাহ অবতারের কথা শুনে। শ্রীনগরের বত্রিশ মাইল পশ্চিমে বরাহমূল বলে একটা জায়গা আছে, এখন নাম হয়েছে বারমূলা। বিষ্ণু বরাহ অবতার হয়েছিলেন বরাহমূলে। সেজন্যে তার আর এক নাম শূকর ক্ষেত্র।

স্বাতি বলে উঠল : এ সব কথা বিশ্বাস কোরো না বাবা, গোপালদা নিশ্চয়ই তৈরি করে বলছেন।

মামা বললেন : তাই নাকি!

বললুম : আমি তৈরি করি নি, কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই করেছে। অবতারের গল্পও তো কারও তৈরি।

মামী বললেন : অবতারের গল্প কেন তৈরি হবে!

এইবারে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবল, আমি এ কথার উত্তর দিতে পারব না, দিলেও মামীর সে উত্তর পছন্দ হবে না। একটি মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললুম : অবতারের কথা যিনি লিখেছেন, তিনি দেখে লেখেন নি, শুনে লিখেছেন। এ গল্পের কতটুকু সত্য আর কতটুকু তৈরি, সে কথা আজ কে বলতে পারে!

মামী আর কোন কথা কইলেন না। স্বাতি আর একবার হাসল আমার উত্তর শুনে।

ইতিমধ্যে সংসারচাঁদ আবার গল্প ফেঁদে বসেছেন। তাঁর পাশের ভদ্রলোককে বললেন : আর একটু এগিয়ে সামনে একটা মোড় পাবেন। টানেল থেকে বেরিয়ে দেড় মাইল যাবার পর ডান হাতে একটা পথ বেরিয়ে গেছে। সেইটেই ভেরিনাগের পথ। ভেরিনাগের নাম শুনেছেন?

যাকে প্রশ্ন করলেন, সে ভদ্রলোক বললেন : না।

সংসারচাঁদ বললেন : ঝিলমের উৎস হল ভেরিনাগে। ঐ মোড়

থেকে মাত্র তিন মাইল। এই প্রথম বাসে শ্রীনগরে আসবার সুবিধেও যেমন, অসুবিধেও তেমনি। পথে আপনাদের রাত কাটাতে হল না, এই সুবিধা। আর ভেরিনাগ দেখতে পেলেন না, এই অসুবিধা। আমাদের পিছনের বাসগুলো হয়তো আজ রাতে বানিহালেই থাকবে। থাকলে কাল সকালে ভেরিনাগ হয়ে শ্রীনগর যাবে। অন্তত গাড়িতে চৌকস যাত্রী একজন থাকলেও ভেরিনাগ না দেখে শ্রীনগর যাবে না।

তাহলে তো আমরা খুব ঠকে গেলাম!

ঠকলেনই তো। যেমন ভেরিনাগ দেখা, তেমনি পথে এক রাত কাটানো। এ দুইই কাশ্মীর দেখার অঙ্গ। তা না হলে উঁড়ো জাহাজে এলেই হয়।

সংসারচাঁদ যে ভদ্রলোককে এই কথা বললেন, তিনি মর্মাহত হয়ে বললেন: আপনি আগে এই কথা বললেন না কেন?

কী করতেন তাহলে?

বানিহালেই নেমে পড়তাম। সেখানে রাত কাটিয়ে পর দিন ভেরিনাগ দেখে শ্রীনগরে আসতাম।

সংসারচাঁদ বললেন: সে সুবিধা কি হত! নিজের বাসটি ছেড়ে দিলে পয়সাও নষ্ট হত, আর অন্য বাসে উঠতে না পেরে বানিহালেই পড়ে থাকতেন।

আমরা সকলেই তখন এই আলোচনায় মন দিয়েছিলুম। গণেশবাবু বলে উঠলেন: অত যে আপসোস করছেন, ভেরিনাগে দেখবার কী আছে জানতে চাইলেন না?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন: ঝিলমের উৎস।

গণেশবাবু বললেন: উৎস তো বুঝলাম। কিন্তু সে পাহাড় থেকে নামছে, না মাটির নিচে থেকে উঠছে, সেটা তো জানা দরকার।

সংসারচাঁদ বললেন: সেই দেখতেই তো সেখানে যাওয়া।

গণেশবাবু বললেন: যে দেখেছে, তার কাছে জেনে নিলেই

ঝামেলা মিটে গেল।

তা হলে কষ্ট করে কাশ্মীরে আসবারই বা দরকার কী! ঘরে বসেই কারও কাছে জেনে নেওয়া যেত!

এ কথার উত্তরে গণেশবাবু হাসলেন।

সংসারচাঁদ স্বাগত ভাবে বললেন: তা হলে বুঝি ফুর্তি হত না!

অন্য ভদ্রলোক অপরাধীর মতো বললেন: না না, সে কথা নয়। আমি ভাবছিলাম, কোন নদীর উৎস তো কখনও দেখি নি। গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখবার কথা কল্পনাও করতে পারি নে। সে যা দুর্গম পথ, শুনলেই ভয় হয়। সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের উৎস শুনেছি আরও দুর্গম। তাদের জন্ম নাকি তিব্বতে। কাজেই এমন একটা সুযোগ হারিয়ে ভারি দুঃখ হচ্ছে।

সংসারচাঁদ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: এক কাজ করবেন ফেরার পথে আপনি দেখে নেবেন।

তা কি সম্ভব?

সংসারচাঁদ বললেন: শ্রীনগরে টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ চাইবেন। আমার মনে হয় তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

গণেশবাবু বললেন: আমরা তো আর সেখানে যাচ্ছি নে, আমাদের না হয় আপনিই বলুন।

কিন্তু সংসারচাঁদ গম্ভীর ভাবে বললেন: শ্রীনগরে ভেরিনাগের ছবি কিনতে পাওয়া যায়, তাই একখানা কিনে দেখে নেবেন।

আমরাও তাকিয়ে ছিলুম সংসারচাঁদের দিকে। এই বাসগুলিতে বসে কারও দিকে তাকানো একটা কঠিন কাজ। আরামদায়ক গদি-আঁটা চেয়ার। মাথার দিকটা এমন কায়দায় তৈরি যে বালিশের মতো ব্যবহার করা যায়, কিন্তু পিছনের সিটের যাত্রীকে দেখা যায় না। যাঁরা জানালার ধারে বসেন, তাঁরা যেমন প্রাকৃতিক শোভা

উপভোগ করেন, তেমন যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুবিধে পান না। শুধু নিজের পাশের যাত্রীটিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। আমাদের এ অসুবিধা তত ছিল না। আমি ও স্বাতি জানালার ধারটা মামা ও মামীকে ছেড়ে দিয়ে ভিতরের দিকে বসেছিলুম। আমাদের পক্ষে পিছনে তাকিয়ে দেখার অসুবিধা ছিল না।

আমাদের মতো আরও অনেককে তাকিয়ে থাকতে দেখে সংসার-চাঁদ খুশী হয়ে বললেন: কাশ্মীরের উপত্যকা আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথম দ্রষ্টব্য স্থানই হল ভেরিনাগ। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব মাইল পঞ্চাশেক হবে। এখান থেকে কোকরনাগও খুব কাছে। কোকরনাগ আপনারা পহলগাম যাবার পথে দেখবেন। শ্রীনগরের পথে খানাবল নামে একটা শহর আছে, সেখান থেকে অনন্তনাগ হয়ে পহলগাম যায়। টুরিস্ট বাস অনন্তনাগ থেকে পহলগাম সোজা পথে যায় না, আচ্ছাবল হয়ে কোকরনাগের ঝরণাগুলোও দেখিয়ে নিয়ে যায়। অনন্তনাগ থেকেও ভেরিনাগে যাবার একটা সোজা পথ আছে।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল: নাগের ছড়াছড়ি দেখছি। পৌরাণিক যুগে এটা নাগরাজ্য ছিল নাকি?

বললুম: বিচিত্র নয়।

সংসারচাঁদ বললেন: ভেরিনাগ একটি পরিষ্কার জলের ঝরণা। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। কিন্তু যে কুণ্ডের মধ্যে আমরা দেখি তার রঙ সবজে নীল, কিংবা নীলচে সবুজ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। আটকোণা কুণ্ড, তার চারি দিকে সুন্দর বাগানও করে দিয়েছিলেন। বড় বড় চেনার গাছের ছায়ায় বসে আপনার শরীর মন জুড়িয়ে যাবে।

সংসারচাঁদের গল্প শুনতে শুনতে ভেরিনাগের মোড় আমরা কখন ছাড়িয়ে এসেছি খেয়াল করি নি। চারি দিক ঘিরে অন্ধকার নামছে। ড্রাইভার বাস চালিয়েছে বিদ্যুৎ বেগে। দু পাশের দৃশ্য তখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সাধারণত পাহাড়ী পথ যে রকম, এ পথ সে রকম মনে

হচ্ছিল না। এক ধারে পাহাড় আর অন্য ধারে খাদ নয়। মনে হচ্ছিল যেন আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নেমে আসছি, কিন্তু দু ধারেই সমতল। একটা লোকালয় আমরা ছাড়িয়ে এসেছিলুম। তার নাম নাকি কাজিগুণ্ড। রাত্রিবাসের জন্য এখানেও ডাকবাংলো আছে। শ্রীনগর থেকে ফেরার সময় সকালে যে সব বাস ছাড়ে, সেগুলো এই কাজিগুণ্ডে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ। ছোট ছোট চালার নিচে চায়ের দোকান আছে। যাত্রীরা চা খাবার খায়। আশে পাশের গ্রাম থেকে লোকেরা নাম্‌দা গাব্বা বিক্রি করতে আসে। সে সবও সস্তায় কেনে। তারপর যাত্রা করে পাঠানকোটের দিকে।

সংসারচাঁদ তাঁর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন: জাহাঙ্গীর বাদশাহের স্মৃতিকথা আপনি পড়েছেন?

ভদ্রলোক সরল ভাবে বললেন: না।

পড়েন নি! তাতে এই ভেরিনাগের অনেক কথা আছে।

গণেশবাবু বলে উঠলেন: আপনি তো পড়েছেন, বলুন না কী আছে তাতে!

সংসারচাঁদ বিরক্ত ভাবে বললেন: পেটে অত বিদ্যে থাকলে কি আপনাদের মতো লোকের সেবা করে পেটের ভাত রোজগার করি!

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। তারপর বলল: তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই!

বললুম: আসল পড়ার মতো বিদ্যে অনেকেরই নেই, পড়েছি ইলিয়ট সাহেবের অনুবাদ। তাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ লিখেছেন যে তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তিনি দুবার সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি ঝিলমের নাম লিখেছেন বেবট। বলেছেন যে এই বেবট নদীর উৎস হল কাশ্মীরের ভেরনাগ পাহাড়ে। এক সময় নাকি এই জায়গায় একটা বিরাট সাপ বাস করত। কাশ্মীর শহর থেকে এই জায়গার দূরত্ব হবে বিশ ক্রোশ। একটি আটকোনা ক্ষেত্রের ভিতর থেকে এই ঝরণাটি উৎপন্ন হয়েছে। জল এমন স্বচ্ছ যে পপির একটি বীজ ফেলে

দিলে সেটি একেবারে তলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এই জলে অনেক মাছও ছিল।

তারপর ?

তারপর তিনি লিখলেন যে বাদশাহ হয়ে এই জায়গাটি তিনি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। চারি দিকে উদ্যান রচনা করলেন। এমন কি যে নদী এখান থেকে বেরিয়েছে, তার দু ধারও সাজিয়ে দিলেন। তিনি দাবী করেছেন যে সেখানে এমন সব গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন যে পৃথিবীর কোনখানে সে সব সুলভ নয়।

স্বাতি বলল : এখনও তার কিছু আছে কি ?

বললুম : জানি নে। আর থাকলেই বা কী!

কেন ?

শ্রীনগরের আশে পাশে অনেকগুলো মোগল উদ্যান আছে। এক একজন এক একটা নির্মাণ করেছেন, আর একজন আর একজনকে টেক্কা দিতে চেয়েছেন। কাজেই শ্রীনগরেই আমরা ভেরিনাগের রূপ দেখতে পাব।

স্বাতি বলল : শুধু ঝিলমের উৎসটি দেখতে পাব না।

অন্ধকার পথের উপর আলো ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। রাত নটার আগেই যাতে আমরা শ্রীনগর পৌঁছতে পারি, তার জন্যেই এমনি করে ছুটছে। এক সংসারচাঁদ ছাড়া আর কারও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা নেই। মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : রাতে কোথায় ওঠা যাবে, সে কথা চিন্তা করেছ কি ?

উত্তর স্বাতি দিল, বলল : টুরিস্ট অফিসেই থাকবার ব্যবস্থা আছে। ভাল রেস্টরেণ্টও আছে শুনেছি।

মামা বললেন : সেখানে জায়গা না পেলে ?

স্বাতি বলল : জায়গা পাওয়া যাবেই।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মামা বললেন : পেলেই ভাল।

খানিকটা দূরে একটা আলোকিত শহর দেখতে পেয়ে স্বাতি

বলল: এই তো, পৌঁছেই গেলাম দেখছি।

অনেক যাত্রীই তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে জানলুম যে সে জায়গার নাম খানাবল। এইখান থেকেই অনন্তনাগের পথ বেরিয়েছে। এক দিকে আচ্ছাবল হয়ে কোকরনাগ, অন্য দিকে পহলগাম। অনন্তনাগ দু মাইল দূরে, আচ্ছাবল সাত মাইল, আর আটাশ মাইল দূরে পহলগাম। শ্রীনগর এখান থেকে কম দূর নয়, মাইল সাঁইত্রিশেক। তবে পথ সমতল বলে পেঁৗছতে দেরি হবে না। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েই গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। একজন যাত্রী নেমে গেলেন বলে মনে হল।

এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ আমরা অন্ধকারে দেখতে পেলুম না। আরও দশ মাইল এগিয়ে পামপুরের জাফরাণের ক্ষেতও অন্ধকারে মিশে রইল। আরও সাত আট মাইল এগিয়ে যে বাতি দেখতে পেলুম, সবাই বললেন, এ শ্রীনগর না হয়েই যায় না। এক আধটা বাতি নয়, অসংখ্য আলোয় একটা স্বপ্নময় শহর ঝলমল করছে।

দু পাশে অনেক ঘর বাড়ি দোকান পাট ফেলে রেখে আমরা একটা বিরাট এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দু ধারেই বাড়ি, মাঝখানে খুবই প্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন। দোতলা বাড়ির ঘরগুলি প্রায় সবই অন্ধকার। বাস যেখানে দাঁড়াল, সেখানে অনেক কুলি অপেক্ষা করছে। গাড়ির উপর থেকে তারাই মালপত্র টেনে নামাবে।

মামা বললেন: মালপত্র আমি দেখছি। তোমরা দুখানা ঘরের ব্যবস্থা করে এস।

মামী বললেন: এ সব যদি যাত্রীদের থাকবার ঘর হয় তো সবই তো খালি দেখছি।

নিচের তলার প্রথম ঘরখানিই টুরিস্ট অফিস। আভিদের সঙ্গে আমি এগিয়ে গেলুম। টুরিস্ট অফিসার বসে আছেন প্রথম

কাউন্টারেই। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন হাসি মুখে। কিন্তু আমাদের হাসতে দিলেন না। ঘরের জন্ত আর্জি পেশ করতেই জিজ্ঞাসা করলেন : রিজার্ভ করেছেন তো ?

বললুম : না।

তিনি বললেন : তবে খুবই দুঃখিত। ঘর আমাদের খালি নেই।

স্বাতি বলল : বাইরে থেকে সব ঘরই তো খালি দেখতে পাচ্ছি।

সে সব ঘর রিজার্ভ করা আছে।

কাদের জন্যে ?

আপনাদের মতো টুরিস্টদেরই জন্যে।

স্বাতি বলল : কিন্তু আজ রাতে তো আর কোন বাস পৌঁছবে না শুনলাম। কাল সকালেই আমরা ঘর ছেড়ে দেব।

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন : সরি।

স্বাতি পিছিয়ে এসে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : উপায় একটা হবেই। কোন হোটেলে কিংবা হাউস বোটে চলে যাব। কিংবা—

কিংবা ?

টুরিস্ট অফিসে ঢোকবার সময় সামনের ময়দানে অনেক তাঁবু দেখেছি। তার ভেতরে একটা রাত কাটাতে পারব না ?

টুরিস্ট অফিসারের দিকে চেয়ে বললুম : ঐ তাঁবুগুলো কি আপনাদেরই ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ। ওতে জায়গা দিতে পারব। এক রাতের ভাড়া সাড়ে চার টাকা।

অনেকক্ষণ থেকেই কয়েকজন লোক আমাদের আশেপাশে ঘুরছে। তাদের একজন আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল : স্পেশাল ক্লাস হাউস বোট আছে আপনাদের পছন্দ মাফিক।

টুরিস্ট অফিসার আমাদের পরামর্শ দিলেন : হাউস বোটেই চলে যান না।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ভাড়া কী রকম ?

দেওয়ালে টাঙানো একখানা কাচের ফ্রেম ভদ্রলোক নিয়ে এলেন। বললেন : এরা আপনাদের কাছে বেশি নিতে পারবে না। প্রত্যেক হাউস বোটেই রেট টাঙানো আছে। যদি খাওয়া না নেন, তাহলে পাঁচ ঘরের স্পেশাল হাউস বোটের ভাড়া পড়বে দৈনিক পঁয়তাল্লিশ টাকা।

স্বাতিকে আমি টেনে আনলুম। বললুম : মামাকে আগে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

যারা আমাদের পিছু নিয়েছিল, তাদের একজন বলল : আমার ফার্স্ট ক্লাস হাউস বোট, ভাড়া অনেক কম পড়বে। খাওয়া দাওয়া নিয়ে বাইশ টাকা এক একজনের।

আর একজন বলল : ঝিলম নদীর উপর যদি থাকেন তাহলে বারো টাকাতেই হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি কানের কাছে মুখ এনে বলল : আমি আরও কমে ব্যবস্থা করে দেব।

ততক্ষণে আমি মামার কাছে পৌঁছে গেছি। মামা আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে বললেন : কোন ব্যবস্থা হল না বুঝি ?

আমি বললুম : ব্যবস্থা ভালই হবে, কিন্তু বড় দরাদরির ব্যাপার। আজ রাতটা একটা তাঁবুতে কাটাতে পারলে কাল সকালে পছন্দ মতো ব্যবস্থা করা সহজ হবে।

মামী যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : তাঁবুর মধ্যে !

এই শীতের দেশে—

বলেই মামা থামলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে গরম জামা আমাদের কারও গায়ে নেই। সঙ্গে যা ছিল তা কাঁধের উপরেই ফেলা আছে। মামীর গায়েও কিছু নেই। শুধু মামাই তাঁর শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। স্বাতির ধারণা যে শীতের জন্য মামা এ কাজ করেন না, করেন আমাদের জন্য। তাঁকে দেখে

আমরাও যেন অমনি করে সাবধান হই।

তারপর তিনি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন, যিনি পাঠানকোটেই পুরো হাতা সোয়েটারের উপর গলাবন্ধ কোট পরেছিলেন, হাতে দাস্তানা আর মাথায় বালাক্লাভা পরেছেন বানিহালে, পরনে ছিল ভারি ফ্লানেলের ট্রাউজার্স। তাঁর তরুণী স্ত্রীর গায়েও একটা ওভারকোট। তিনি রাস্তায় যখন খুলে ফেলেছিলেন, তখন ভদ্রলোক তাঁকে বার বার এই অনাচার করতে বারণ করেছেন। এখন তাঁর স্ত্রীও দেখলুম ওভারকোট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ভদ্রলোক কিছু পরামর্শ করছেন তাঁর সঙ্গে। তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বাতি একবার হাসল। তারপর বলল: শীত আর কোথায়! বরং এত রাতে অন্য কোথাও না গিয়ে তাঁবুর ভেতরেই ঢুকে পড়া যাক।

মামী বললেন: অসুখ-বিসুখ করলে কিন্তু আমি জানি না।

স্বাতি বলল: অমরনাথ যেতে হলে তো তাঁবুর ভেতরেই রাত কাটাতে হয়। সে আরও উঁচুতে। দুর্ধর্ষ শীত সেখানে।

মামা মাথা নেড়ে বললেন: বুঝেছি।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল: আমাদের নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। এস গোপালদা।

বলে টুরিস্ট অফিসের দিকে আবার এগিয়ে গেল।

সমস্ত টুরিস্ট অফিসটা দোতলা। নিচের তলায় অফিস ও রেস্টরেণ্ট, ওপরতলায় থাকবার ঘর। খানিকটা দূরে আরও দুখানা দোতলা বাড়ি আছে, তাতেও আছে টুরিস্টদের জন্য ঘর। সে সমস্তই ফাঁকা পড়ে রইল যাঁরা রিজার্ভ করে রেখেছেন তাঁদের জন্য। আমরা কতকটা অনায়াসে দুখানা তাঁবু পেলুম। পছন্দ করে মাটিতে শতরঞ্জি বেছানো তাঁবু নিলুম। কুলিরা আমাদের মাল সেখানে পৌঁছে দিয়ে এল।

সেই দম্পতি তাঁবুতে এলেন না, হাউস বোটেও গেলেন না।

গেলেন একটা হোটেলে। যাবার সময় দেখা হয়েছিল। আমরা তাঁবুতে থাকব শুনে ভয়ে শিহরে উঠলেন। বললেন: সর্বনাশ, এ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করছেন!

ভদ্রমহিলার হাউস বোটে থাকবার শখ ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক রাজী হন নি। বাঙলা দেশেই জলের উপরে বাস করা যায় না, তো কাশ্মীরে! নিউমোনিয়ায় মারা পড়তে হবে।

ভদ্রলোকের ভয় দেখে স্বাতি হেসেছিল, কিন্তু তাঁকে সাহস যোগাতে পারে নি।

একটি মস্ত মাঠের চারি দিক ঘিরে অসংখ্য তাঁবু পড়েছে। প্রত্যেকটি তাঁবুর সামনে একটি করে বাতি ঝুলছে। একটি খোলা তাঁবুর ভিতরে অফিস। সেইখানে গিয়ে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাঁদেরই একজন লোক এসে আমাদের তাঁবু দুখানা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সামনের ঘরে শোবার ব্যবস্থা। লোহার খাট। খাট বললে ঠিক বোঝা যাবে না, বলা উচিত লোহার তক্তপোশ। তার ওপর গদি বা তোশক নেই। সামনে একটি বাতি জ্বলছে, পিছনে একখানা ছোট ঘর আছে। তার নাম নাকি বাথরূম। কিন্তু জলের কোন ব্যবস্থা নেই, অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। যে লোকটি আমাদের দেখাতে এসেছিল, সে অন্ধকারে নির্দেশ করে এক দিকে পায়খানা দেখাল, অন্য দিকে জলের কল। সবই দূরে দূরে। কমিউনিটি ব্যবস্থা, অর্থাৎ একই কল ও পায়খানা অনেক তাঁবুর লোক ব্যবহার করবে।

মামী ক্ষেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু শান্ত ছিলেন মামা। স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে কোন কঠিন মন্তব্য করে নি।

রাত নটা বেজেছিল অনেকক্ষণ আগে। রাতের খাবার আমাদের টুরিস্ট অফিসের সংলগ্ন রেস্টরেন্টেই খেতে হবে। কিন্তু জিনিসপত্র ফেলে যাবার এক সমস্যা দেখা দিল। এক সঙ্গে সবার

যাওয়া চলে না। আমাদের তাঁবু নির্দেশ করে যে লোকটি ফিরে যাচ্ছিল সে বোধহয় আমাদের সমস্যার কথা বুঝতে পেরেছিল। বলল : মালপত্রের ভাবনা এখানে ভাববেন না। এ সব ফেলে নিশ্চিন্ত মনে আপনারা খেতে যেতে পারেন। একটা জিনিসেও কেউ হাত দিতে পারবে না, এমনি ব্যবস্থা।

মামীর দুর্ভাবনা তাতে গেল না দেখে মামা বললেন : তবে রামখেলাওনকে রেখেই চল। সে পরে গিয়ে খেয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল।

টুরিস্ট অফিসের ভিতর দিয়ে রেস্টরেণ্টে যাবার পথ। মস্ত ঘর, পাশাপাশি অনেকগুলো কাউণ্টার, এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য যে আসবাব, তা তেমন ভাল নয়। রেলওয়ে স্টেশনে নতুন ওয়েটিং রূমে আজকাল অনেক ভাল আসবাব দেখা যাচ্ছে। এগুলো পার হয়ে আর একটা ঘর। বইয়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাথরূম দুটো আমাদের কাজে লাগল। তারপর বিরাট ডাইনিং হল। সুন্দর করে সাজানো হলটি আমাদের ভাল লাগল। খাবারও ভাল। কিন্তু দাম একটু বেশি, মধ্যবিত্ত লোকের উপযোগী নয়। এইজন্যেই বোধহয় লোকের ভিড় এখানে একেবারেই নেই। অথবা এখানকার খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

খেয়ে দেয়ে ফিরবার সময় স্বাতি একবার উপর তলাটা দেখে এল। বলল : প্রায় সমস্ত ঘরেই তালা ঝুলছে।

মামা বললেন : খালি ঘর ভাড়া না দেবার কী স্বার্থ থাকতে পারে ?

স্বাতি বলল : দুর্নীতি নেই তো !

বললুম : দুর্নীতি নেই কোথায়! কিন্তু এখানে আছে কিনা জানি না।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কী বলল এরা ?

বলল : ঘর সব রিজার্ভ করা আছে।

স্বাতি বলল : আমার কী মনে হয়েছে জানো গোপালদা! আমার মনে হয়েছে যে ওরা আমাদের হাউস বোটে পাঠাতে চেয়েছিল।

ওদের লাভ ?

লাভের কথা ওরাই জানে।

খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলুম। শিরশির করে হাওয়া বইছে। শীতার্ত হাওয়া নয়, বাঙলার হেমন্তের মতো হাওয়া। গরম কাপড় না থাকলেও চলে, থাকলে ভাল লাগে। এখন আশ্বিন মাস। হেমন্ত আসন্ন।

নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে মামী তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেন। আমাদের মনও প্রসন্ন ছিল না। কাল আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

১০

জীবনের অনেক তুচ্ছ মুহূর্তও বোধহয় অনেক দিন মনে থাকে। তেমনি একটি মুহূর্ত এল আমার জীবনে, কাশ্মীরের প্রথম প্রত্যূষে। আমি একা ঘুমিয়েছিলুম। স্বাতি শুয়েছিল মামা মামীর তাঁবুতে। কোন নরম বিছানা নয়, লোহার পাতের খাটের উপর একখানা চাদর বিছিয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিলুম। মাথার নিচে অবশ্য একটা বালিশ ছিল। তাঁবুর ভিতরে একটা বাতি জ্বলছিল। রাতে সেই বাতি নেবাতে পারি নি। তবু ঘুমিয়েছিলুম নিশ্চিন্ত আরামে। রামখেলাওন কখন বেরিয়ে গিয়েছিল খেয়াল করি নি।

ধনুষ্কোডির পথে আমি স্বাতিকে জাগিয়েছিলুম, আর দ্বারকার পথে স্বাতি জাগিয়েছিল আমাকে। সে ট্রেনের কামরায়। কাশ্মীরে স্বাতি আমাকে জাগাতে অন্য তাঁবুর ভিতরে এল। পায়ে হাত দিয়ে জাগায় নি, গায়েও হাত দেয় নি। আমার মনে হয়েছে, সে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমি যখন চোখ মেলে তাকালুম, সে তখন আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। দুষ্টুমিতে ভরা সেই অপরূপ হাসি। আমার ইচ্ছা হয়েছিল হাত ধরে টেনে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিই। কিন্তু তা পারি নি। স্বাতি বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, বলল : বসতে হবে নাকি?

আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। আর স্বাতি বলল : একটু জায়গা দাও।

বলে খাটের এক ধারে বসে পড়ল।

তার এই অভাবিত আচরণে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। কিন্তু আমি সে কথা প্রকাশ করলুম না। একটুখানি সরে হাসি মুখে তাকালুম তার দিকে।

স্বাতি বলল : হাসলে যে ?

বললুম : একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল।

কী স্বপ্ন ?

নিচে থেকে একটা বেড়াল শিকের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ সেই শিকে ছিঁড়ল।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলে উঠল : দাঁড়াও দাঁড়াও, তার আগে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিই। স্বপ্ন দেখে তোমার ঘুম ভাঙল, না ঘুম ভাঙার পর স্বপ্ন দেখলে ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বাইরে সকাল হয়েছে, না এখনও অন্ধকার রাত ?

স্বাতি বলল : এ কথা জানতে চাও কি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ?

তা না জানলে তো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় !

এবারে স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কেন ?

বললুম : যদি সকাল হয়ে থাকে তাহলে বলব, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে বলব, এখন আমি স্বপ্ন দেখছি।

আর মানে রাত্রে আমি তোমার কাছে আসতে পারি না, আমার সাহস হয় সকাল বেলায়, এই তো ! খুব খাঁটি কথা। রাতে আমি বেড়ালকে ভয় পাই, যদি আঁচড়ে দেয়।

হেসে বললুম : তার পরের কথা বল।

স্বাতি বলল : একটা খবর আছে, সেইটেই দিতে এলাম। মা এই দেশটাকে বলছেন নরক।

বল কি ! ভূস্বর্গকে নরক বললে যে এ দেশের লোক মূর্ছা যাবে !

স্বাতি সকৌতুকে বলল : অবুঝ বাইরে বেরিয়ে একবার দেখ না ! এখনও কিছু অন্ধকার আছে ! তার পরে নরক কুণ্ডে আর যেতে পারবে না।

হেসে বললুম : তোমার ভাবনা নেই, নরক দর্শনে আমি যাব না। তুমি তৈরি হলেই ভূস্বর্গ দেখতে বেরিয়ে পড়ব।

স্বাতি বলে উঠল : আইডিয়া গোপালদা! এই জন্যেই তোমাকে এত—

স্বাতি থামতেই আমি বললুম : থামলে কেন, শেষ কর কথাটা। ঘেন্না করি।

বলেই সে হেসে উঠল।

আমিও হেসে বললুম : ঐ ঘেন্নার লোভেই তো ছুটে আসি।

সত্যি নাকি!

বললুম : মিত্রার কথা মনে আছে? সেও চাওলাকে ঘেন্না করত। বিয়ের পরেও ঘেন্না করে কিনা জেনে নিও। ভাবনার কথা হল ভালবাসা। একবার ওই রোগে ধরলে জীবনটাই বৃথা। ওঝা ডেকে ভূত ছাড়াতে হয়।

হাসতে হাসতেই স্বাতি উঠে পড়ল, বলল : ওঠ ওঠ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। পছন্দ মতো একটা আস্তানা খুঁজে না পেলে আজই মা ফিরে যাবেন।

বলেই বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাহিরে।

আচ্ছন্নের মতো আমি খানিকক্ষণ শুয়েছিলুম, তারপর উঠে পড়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল যে এও সেই রকমের একটি ঘটনা যা নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু তবু জীবনের পাতা থেকে সহজে মুছে যাবে না। লাভ ক্ষতির খতিয়ানে এ সব ঘটনার উল্লেখ থাকে না, তবু এর মূল্য কম নয়। যেন অনেক পেয়েছি এমনি মন নিয়ে আমি মামার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলুম।

মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, এদের ব্যবস্থা চমৎকারজনক।

ব্যবস্থা আমিও দেখেছিলুম। একদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা পায়খানা, অন্য দিকে জলের কল, স্নানের জন্য ঘেরা একটু জায়গা। সবই দূরে দূরে। শিকারের জন্য যাবে যেজন এই ব্যবস্থাই আমরা ভাল

বলব, সন্তোষজনক বলব অমরনাথের পথে। কিন্তু কাশ্মীরের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট যদি এই রকমের ব্যবস্থা করে, তাহলে পরিতাপের বিষয় বলতে হয়। মামা বললেন: এর চেয়ে ধর্মশালা ভাল। সেখানে অন্তত পায়খানায় জলের ব্যবস্থা আছে, আর নোংরামি এমন জঘন্য নয়।

নাক সিঁটকে মামী বললেন: নরক কুণ্ড।

বেরবার জন্য তৈরি হয়ে স্বাতি অপেক্ষা করছিল। বলল: গোপালদা আমাদের ভূস্বর্গে নিয়ে যাবে। সময় মতো তোমরা চা খেয়ে নিও বাবা, আমরা বেরিয়ে পড়ি। এস গোপালদা।

বলে সে বেরিয়ে পড়ল।

বুঝতে কষ্ট হল না যে একা বেরবার ব্যবস্থা সে আগে থেকেই করে রেখেছিল। মামা-মামীকে সঙ্গে নিয়ে বেরলে সরাসরি কোন হোটেলে বা হাউস বোটে উঠতে হয়। সে ইচ্ছা থাকলে কাল রাতেই আমরা সেখানে যেতে পারতুম। টুরিস্ট অফিসারের কাছে সরকারি লিস্ট আছে, টেলিফোন আছে। অনুরোধ করলেই ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। তা যখন করি নি, তখন ভাল করে দেখে শুনে একটা ভাল জায়গায় গিয়ে ওঠা উচিত।

দিনের আলোয় চারি দিক তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁবু ভরা মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই আমরা সদর রাস্তায় পৌঁছলুম। সামনেই বিরাট টুরিস্ট অফিস। বামে উড়ো জাহাজের অফিস। এই অট্টালিকার সামনেটা লাল সালভিয়া ফুলে আলো হয়ে আছে। কিন্তু ভিতরে অন্ধকার।

স্বাতি বলল: এবারে কোন্ দিকে যাবে?

বললুম: কীপ টু দি লেফ্‌ট্।

তুমি কি বামপন্থী?

হেসে বললুম: সরকারি নির্দেশ যে তাই।

বাঁ হাতে খানিকটা এগিয়েই এই পথ আর একটা বড় রাস্তায় পড়ে

শেষ হয়ে গেছে। এই ত্রিবেণীতে পৌঁছে আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এবারে কোন্ দিকে ?

স্বাতি একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে তাকাল, তারপর বলল : এবারে দক্ষিণাপথ।

সেই দিকে পা বাড়িয়ে বললুম : কেন ?

স্বাতি বলল : এ দেশে দক্ষিণপন্থীই বেশি।

রাস্তায় লোক চলাচল তখনও শুরু হয় নি। যানবাহনও নেই। কোন হোটেল রেস্টরেণ্ট খোলা পাওয়া গেলে একটু চা খেয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু পথের ধারে কিছুই নেই। চলতে চলতে আমরা একটা খালের ধারে পৌঁছে গেলুম। তার উপরে চমৎকার পুল। পুলের পরপারে দোকান পাট আছে বলে মনে হল।

খালে জল বেশি নয়। বাঁ ধারে পাশাপাশি অনেকগুলো নৌকো। ঠিক নৌকো নয়, নৌকোর উপরে বাড়ি। এখানে সবাই হাউস বোট বলে। একজন ভদ্রলোককে দেখলুম একটা ছোট ডিঙি নৌকোয় খাল পার হয়ে বড় রাস্তার উপরে উঠে এলেন। গলাবন্ধ কোট গায়ে ভারি চেহারার লোক, চলনটি যেন চেনা চেনা। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তাকালুম স্বাতির মুখের দিকে।

এ দিকে সেই ভদ্রলোক আমাদের দেখতে পেয়ে পথের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। খানিকটা এগিয়েই আমরা তাঁকে চিনতে পারলুম। আমাদের কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার। ভদ্রলোকও হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। বলে উঠলেন : আরে, গোপালবাবু যে !

হালদার মশাইকে আজকাল আমার খারাপ লাগে না। আমিও অন্তরঙ্গ ভাবে বললুম : আপনি এখানে !

তখন আমরা মুখোমুখি হয়েছি। আমার কথার উত্তর না দিয়ে হালদার মশাই স্বাতির দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। স্বাতিকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম : অমন করে কী দেখছেন ?

হালদার মশাই বললেন : সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি না তো!

লজ্জায় স্বাতি আরক্ত হয়ে উঠল, আর আমি হেসে উঠলুম উদ্দাম ভাবে। আমার হাসিতে হালদার মশাই কিছু অপ্রতিভ হয়ে বললেন : দেশ থেকে সিঁদুরের প্রচলন তো এক রকম উঠেই যাচ্ছে। এ কালের মেয়েরা কেউ সিঁদুর ছুঁইয়ে নিয়ম রক্ষা করেন, কেউ তাও করেন না। বলেন, সিঁদুর থেকেই নাকি চর্মরোগ হয়।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে আমি হাসতে লাগলুম।

কিন্তু আশ্চর্য! হালদার মশায়ের এই আচরণে স্বাতি একটুও রাগ করল না। বরং সহজ হবার চেষ্টা করে বলল : নেমন্তন্ন খাবার পরে ও সব খুঁজবেন।

উত্তর শুনে হালদার মশাই এক গাল হেসে বললেন : বারে বারে বিয়ে ভেঙে দিই কিনা, তাই গোঁসাইজীকে ভয় পাই, দিল্লী থেকে আমাকে কি আর নেমন্তন্ন করবেন!

স্বাতি একেবারে স্বাভাবিক ভাবে বলল : আমি করব।

আমার দিকে তাকিয়ে হালদার মশাই বললেন : আপনারা যদি না করেন, তা হলে তো নেমকহারাম বলব।

তারপর প্রশ্ন করলেন : গোঁসাইজীরা কোথায়?

বললুম : তাঁবুর ভেতরে।

অ্যাঁ! অমরনাথে গেছেন!

হেসে বললুম : অমরনাথে নয়, এইখানেই। কাল রাতে এসে পৌঁছেছি, থাকবার একটা জায়গা চাই।

হালদার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন : কাশ্মীরে থাকবার জায়গার অভাব! গোটা দেশটাই তো আমাদের গিলে খাবার জন্যে হাঁ করে আছে! ধন্যি এ দেশের লোক মশাই!

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন : চা খেয়েছেন?

বললুম : না।

সে কি, চা খান নি এখনও! আসুন আসুন, আমাদের চা বোধহয় এতক্ষণ তৈরি হয়ে গেছে।

স্বাতি করুণ ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বুঝলুম যে পরিত্রাণের আর উপায় নেই। এই চা খাওয়ানোকে উপলক্ষ্য করে হালদার মশাই তাঁর যাত্রার পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করবেন। খালের ধারে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়ে এক নৌকোওয়ালাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন : এই হতভাগা, এই লক্ষ্মীছাড়া, আয় না এ´দিকে।

হালদার মশাইকে পেঁৗছে দিয়ে যে লোকটা ফিরে গিয়েছিল, ডাকাডাকি শুনে সে আবার ফিরে এল। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের এ অঞ্চলের নাম ধাম শুনিয়ে দিলেন। সামনের হাউস বোটগুলি যেখানে বাঁধা, তার নাম চেনার বাগ। চেনার বা চিনার কাশ্মীরের বিখ্যাত গাছ। আরও খানিকটা এগিয়ে এই খালের দুধারে আছে বড় বড় চেনার গাছ। এই পাড়াটার সাধারণ নাম ডাল গেট। ঝিলম নদীর সঙ্গে ডাল হ্রদ যে নালা দিয়ে যুক্ত, তারই উপরে ডাল গেট। ডাল গেটের ভিতর দিয়ে নৌকো যাতায়াত করে। এ দিকেও বাজার হাট আছে। হালদার মশাই তেঁতুল কিনতে বেরিয়েছিলেন।

তেঁতুলের কথা শুনে স্বাতি হেসে বলেছিল : এত ভোরে তেঁতুল কী করবেন?

হালদার মশাই বললেন : হতভাগা সব। কাল বাজার করেছে, তেঁতুল আনে নি। নিজে কিনে না দিয়ে বেরলে বিনে তেঁতুলেই অম্বল রেঁধে রাখবে।

অল্প একটু জল। সেটুকু পেরিয়ে আমরা একখানা বড় হাউস বোটে গিয়ে পেঁৗছলুম। হালদার মশাই বললেন : বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসছি।

দুখানা চেয়ারে বসে আমরা ভিতরটা দেখলুম। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। দু পাশে আরও ঘর আছে, মাটিতে বিছানা পেতে লোকজন ঘুমচ্ছে মনে হল। হালদার মশায়ের গর্জন শোনা গেল দূরে।

তারপরেই জনকয়েক ভদ্রলোক ছুটে চলে এলেন। তাঁরা সন্ত ঘুম থেকে উঠেছেন। হাতে চায়ের পেয়ালা দেখে মনে হল যে এই গরম চায়ের লোভেই বোধহয় এইমাত্র বিছানা ছেড়েছেন। এঁদের পিছনেই হালদার মশাই এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর দু হাতে দু পেয়ালা চা। অন্য একজনের হাতে আর এক পেয়ালা চা আর কয়েকখানা বিস্কুট। হালদার মশাই অমায়িক হাসি হেসে তাঁর হাতের পেয়ালা আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের চা নিলেন তাঁর সঙ্গীর হাত থেকে, তারপর বললেন : গোপালবাবুর বই নিয়ে অমন যে কাড়াকাড়ি করেন, দেখুন এবারে মানুষটাকে। আর ইনিই হলেন গোপালবাবুর—।

বলে তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে হাসলেন।

নমস্কার বিনিময় করে তাঁরা হালদার মশাইকে চেপে ধরলেন, বললেন : গোপালবাবুরা কাশ্মীরে আছেন, এ কথা তো আপনি আমাদের একবারও বলেন নি !

হালদার মশাই বললেন না যে এ সংবাদ তাঁর জানা ছিল না, বরং বললেন : এঁরা বায়স্কোপের লোক হলে অবশ্যই বলতুম। দু পয়সা রোজগারও হয়ে যেত।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম : কী করে ?

হালদার মশাই বিস্কুটে একটা কামড় দিয়ে বললেন : এই দরজায় একটা পর্দা টাঙিয়ে বাইরে টুল নিয়ে বসতুম, একটা আধুলি ফেলে এক নজর দেখে নাও। চাই কি একখানা হাউস বোটই ভাড়া নিয়ে নিতুম, আর হ্যাণ্ডবিল বিলি করে দিতুম শহরে। আর একবার কাশ্মীরে আসবার খরচ উঠে যেত।

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন।

চা শেষ করে আমি বললুম : হালদার মশাই, আজ আর বসবার সময় নেই আমাদের।

হালদার মশাই বললেন : তা তো নেই-ই। চলুন আপনাদের

একটা ব্যবস্থা করে দিই। ডাল লেকের হাউস বোটগুলো ভাল শুনেছি, এখান থেকেই এক নজর দেখে নিন না।

আমরা যখন উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন আর এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। হালদার মশাই সসম্ভ্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিস্টার মুখোপাধ্যায় একজন রেলের অফিসার, শ খানেক রেলকর্মীকে নিয়ে কাশ্মীরে এসেছেন। দিন সাতেক পহলগামে ছিলেন, শ্রীনগরেও থাকবেন দিন সাতেক। তারপর ফিরে যাবেন। যারা সঙ্গে এসেছে, তারা মাত্র বিশ ত্রিশ টাকা জমা দিয়েছে, বাকি টাকা দেবে রেল কর্তৃপক্ষ। গোটা কয়েক হাউস বোট ভাড়া নিয়ে সবাই আছে। হালদার মশাই এই দলে কী করে ভিড়ে গেছেন, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হলুম।

খাল পার হবার সময় আমি সেই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম।

হালদার মশাই হেসে আকুল হলেন। বললেন: এ না হলে আর হালদার নাম কেন!

তারপরে বললেন: আজ আমাদের তাড়া আছে, গুলমার্গে গিয়ে ঘোড়ায় চাপতে হবে। তার আগে তেঁতুল চাই।

ওপারে পৌঁছেই তিনি বিদায় নিলেন না। আমাদের ডাল-গেটে পৌঁছে দিয়ে বললেন: এইটেই ডাল লেকের পথ। দুর্গা বলে একটা হাউস বোটে ঢুকে পড়ুন।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম, পিছন থেকে ভদ্রলোক ডেকে বললেন: কোথায় উঠলেন, সে খবরটা দিয়ে যাবেন। ভয় নেই, কোন বিপদ হবে না।

বলে স্বাতির দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সময়। গোদাবরী স্টেশনে তিনি গাড়িতে উঠেছিলেন। তারপর আবার দেখা হয়েছিল রামেশ্বরে। মামা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন, ভয়ও পেতেন। হালদার মশাই নিজেই আমাকে

বলেছিলেন যে পরনিন্দার জন্য তিনি পরনিন্দা করেন না, করেন পেটের জন্য। বলেছিলেন: এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়। ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম।

রামেশ্বরের কেলেঙ্কারীর কথা তিনি জানেন। তারপর আমাদের দু জনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের পথে, দেখেছেন দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প হয়। কিন্তু সে রকম কিছু করেছেন বলে শুনি নি। বরং পুরীর সমুদ্র-বেলায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন অন্য কথা শুনেছি। জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়েটা তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। জো রায়ের বাপের কাছে বলেছিলেন: মেয়ে ভাল। কিন্তু—

তারপর এক গাল হেসে বলেছিলেন: এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না।

পুরী ভ্রমণের খরচ সংগ্রহের কথা আমার কাছে গোপন করেছিলেন। বলেছিলেন: কার পয়সায় এখানে এসেছি, তা কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি।

হালদার মশাইকে সেদিন আমার সুন্দর মনে হয়েছিল।

কিন্তু আজ আমি স্বাতির কথা শুনে আশ্চর্য হলুম। ভদ্রলোককে স্বাতি সহাস্যে উত্তর দিল: আমি নিজে আপনাকে খবর দিয়ে যাব।

হালদার মশাই যেন কৃতার্থ হয়ে হাসলেন। তারপর পা বাড়ালেন ডাল গেটের বাজারের দিকে।

আমরা ডাল লেকের বাঁধানো পথ ধরলুম। এই পথের ডান দিকে পাহাড়, আর বাঁ দিকে জল। লেক বলব না, হ্রদের মতো প্রশস্ত নয়। ক্যানাল বা খালের মতো, তবে চওড়া অনেকখানি, আর পারপারে হাউস বোট বাঁধা আছে সারি সারি। সে হাউস বোট-গুলোর দিকে তাকিয়ে পুলকে আমাদের মন দুলে উঠল না। জলও

তেমন পরিষ্কার নয়। এপারে এক ঝাঁক ছাদওয়ালা ডিঙি নৌকো দাঁড়িয়ে ছিল। এই নৌকোরই নাম শিকারা। সুন্দর গদির উপরে বসবার ব্যবস্থা, পর্দা ঝুলছে। নৌকোর নাম লেখা তার ছাদে। যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছে।

খানিকটা দূর এগিয়ে আমরা ফিরে এলুম। স্বাতি বলল : এই নোংরা জলে এরা রান্না করে বলে শুনেছি। মা কিছুতেই এখানে থাকবেন না।

বললুম : তাহলে এক কাজ করা যাক। ঝিলম নদীর হাউস বোটগুলো দেখি গিয়ে।

স্বাতি বলল : সেগুলো নাকি আরও বেশি নোংরা।

বললুম : নদীর জল নিশ্চয়ই এর চেয়ে পরিষ্কার হবে।

ঠিক এই সময়ে একখানা খালি টাঙ্গা যাচ্ছিল। আমি তাই ধরে দুজনেই উঠে বসে বললুম : ঝিলম নদীর তীরে।

যে পথে আমরা এসেছিলুম, সেই পথেই টাঙ্গা চলল। ডাল গেটে পৌঁছে বাঁ হাতের রাস্তা, তারপর চেনার বাগের পুল পেরিয়ে সোজা। এবারে আর বাঁ দিকে ফিরে টুরিস্ট অফিস নয়। বাঁ দিকের ময়দানে আমাদের তাঁবুগুলো দেখতে পাওয়া গেল। একটুখানি এগিয়েই ডান হাতে দেখলুম নেডোস হোটেল। স্বাতির ব্যাগের ভিতর কাশ্মীরের কাগজপত্র ছিল। তাই খুলে দেখে সে বলল : এই রাস্তার নাম হোটেল রোড, এটি বিলিতি স্টাইলের হোটেল।

তারপর টাঙ্গাওয়ালাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল : যে রাস্তা থেকে আমরা এলাম, তার নাম কী ?

টাঙ্গাওয়ালা বলল : বুলভার রোড।

এবারে স্বাতি আমাকে বলল : আমি তাই সন্দেহ করেছিলাম।

কেন ?

বিলিতি হোটেলগুলো সব ঐ রাস্তার ওপরেই—ওবেরয় প্যালেস হোটেল, পার্ক হোটেল, মাজদা হোটেল। দিশী হোটেলও আছে।

দেখছি ওই রাস্তার ওপরে। বিলিতি হোটেলে মা তো উঠতে চাইবেন না, সব দিশী হোটেলে আবার স্যানিটারি বাথরূম নেই।

বললুম : আগেই হোটেল দেখছ কেন?

স্বাতি বলল : দিল্লীর লোকেরা ডাল লেকে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিল। সে তো দেখেই এলাম।

বললুম : দেখে এসেছি কিনা বলতে পারি না।

কেন?

হয়তো শুনবো যে ডাল লেক সেখান থেকে অনেক দূরে।

এই সময়ে আমরা বাঁ দিকে খানিকটা তফাতে আরও কয়েকটি হোটেল দেখতে পেলুম। দোকান পাট লোকজন দেখতে দেখতেই আমরা ঝিলম নদীর তীরে পৌঁছে গেলুম। বড় একটা পুলের কাছাকাছি টাঙ্গা থেকে নেমে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কত দিতে হবে?

টাঙ্গাওয়ালা বলল : দু টাকা।

আমি বললুম : বল কি, এইটুকু পথের জন্যে দু টাকা! তোমাদের কোন রেট নেই?

স্বাতি বলল : আছে বৈকি।

বলে তার বই দেখে বলল : টুরিস্ট অফিস থেকে তো এই পুল পর্যন্ত এক টাকা ভাড়া দেখছি।

কিন্তু কে সে কথা মানে! শেষ পর্যন্ত দেড় টাকায় রফা করা গেল। টাঙ্গা চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল কাশ্মীর থেকে ফেরার আগে। তখন এক টাকা নয়, বারো আনা আট আনাও দিয়েছি। এক দিন একা এই পথের জন্য দু আনাও দিয়েছি। দরাদরি করি নি। শুধু বলেছি, দরকার নেই।

এমনি অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে। টুরিস্ট অফিসে এক ভদ্রলোক জুতো পালিশ করাবার জন্য দু টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাঁর নিগ্রহ দেখেছি। তারপর সেই লোকের কাছেই জুতো পালিশ

করেছি দু আনায়। এর জন্তেও দরাদরি করতে হয় নি। সে ভদ্রলোকের কাছে দু টাকা আদায় করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছিলুম, দরকার নেই। সে বলেছিল, দু আনা লাগবে। অর্থাৎ এই রাজ্যে টুরিস্টদের খাতির বেশি, এ দেশের লোক তাদের রাজা উজীর ভাবে। তাদেব জন্য অন্য রেট। হোটেলে হাউস বোটেও তাই। সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

ঝিলমের হাউস বোটগুলোও আমাদের পছন্দ হল না। ভিতরে গিয়ে ভাল করে দেখি নি, দেখেছি বাহির থেকে। পরিবেশ পছন্দ হয় নি বলেই পিছিয়ে এসেছি. তারপর খুঁজেছি হোটেল। স্বাতি বলল: প্রবোধবাবু খালসা হোটেলে ছিলেন। বাজারের ভেতরেই এই হোটেল।

খালসা হোটেলে ঢুকে আমরা চা টোস্ট আর ডিম খেলুম। ঘরগুলোও দেখলুম। আমাদেব পছন্দ হল না। এ সব জায়গায় থাকলে কাশ্মীরে আছি বলেই মনে হবে না। তারপর নদীর এপারে ওপারে আরও অনেক হোটেল দেখলুম। অনেকেরই স্যানিটারি ব্যবস্থা নেই, কেমন নোংরা মনে হয়েছে। আর স্বাতি বলেছে: মা থাকতে চাইবেন না।

শেষ পর্যন্ত পছন্দ হল বাদশাহ হোটেল। শুধু বেড ও ব্রেকফাস্ট। সবকারি ব্যবস্থা, কিন্তু জায়গা পাওয়া গেল না। অনেক ঘর। তবু বলল, কয়েক দিন পরে জায়গা হবে। একটা কনফারেন্সের জন্য সমস্ত ঘর রিজার্ভ করা আছে, সরকারি কর্মচারীরা আসবেন। তারপরে তাঁরাই পরামর্শ দিলেন হাউস বোটে থাকবার।

স্বাতি বলল: হাউস বোট আমাদের নোংরা মনে হয়েছে।

তাঁরা বললেন: ডালের হাউস বোট নিশ্চয়ই দেখেন নি। এখান থেকে একখানা টাঙ্গা নিয়ে আপনারা নেহরু পার্কে চলে যান। তার আশে পাশে যে কোন হাউস বোটে কয়েক দিন কাটালে ছেড়ে যেতে আপনাদের কষ্ট হবে।

এ কথায় আমার অবিশ্বাস হল না, বললুম : সেই ভাল।

বাদশাহ রোডের উপব এই বাদশাহ হোটেল। সেখান থেকে টাঙ্গায় উঠে হোটেল রোড হয়ে ডাল গেটে আবার পৌছলুম, তারপর বুলভার রোড ধবে নেহরু পার্কের দিকে চললুম। আকাশে তখন সূর্য প্রখর হয়েছে। বেলা প্রায় এগারটা। ভোর বেলা থেকে ঘুরে ঘুরে শরীর মন ক্লান্ত। তাঁবুর ভিতর মামা মামী যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কোন আশ্রয়েব ব্যবস্থা হয় নি বলেই বুঝি এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। অনিশ্চিত জীবনের ক্লান্তি, দেহের চেয়ে মন ক্লান্ত হয় বেশি।

সকাল বেলায় যে পর্যন্ত আমবা এসেছিলুম, তারপব থেকেই পরিবেশ বদলাতে লাগল। জলের বঙ বদলাচ্ছে, হাউস বোটগুলোও মনে হচ্ছে সুন্দর। নানা বঙের নানা আকৃতিব হাউস বোট। তার বারান্দায় ও ছাদের উপরে জিবেনিয়মের টব, লাল লাল ফুল ফুটে আছে। ভিতরে সুন্দর লেসের পর্দা, বাহিরে সাদা ও কালো কাপড়ের ঝালর। ছাদের উপরেও বসবার জায়গা। শিকারার মতো তাদের বিচিত্র নাম, বিদেশী নামই বেশি। যে হাউস বোটগুলি খালি, তার সামনে টু লেট লেখা কাপড় টাঙানো। নেহরু পার্কে পৌছবার আগেই আমরা একটা শিকারার ঘাটে নেমে পড়লুম। টাঙ্গাকে বিদায় দিয়ে উঠলুম শিকারায়। বললুম : একটা হাউস বোট চাই।

শিকারাওয়ালা আমাদের দুজনকে দেখে একখানা ছোট সুন্দর হাউস বোটে নিয়ে গেল। হাউস বোটে উঠবার জন্য কাঠের সিঁড়ি আছে, তারই সঙ্গে শিকারা ঠেকিয়ে আমরা উপরে উঠলুম। ছোট বারান্দা পেরিয়ে বসবার ঘর। শিকারাওয়ালা দরজা খুলে আমাদের সোফায় বসিয়ে হাউস বোটের মালিককে ডেকে আনল।

ভিতরের ব্যবস্থা আমরা দেখে নিলুম। দুখানা শোবার ঘর। এক ঘরে দুখানা খাট আর এক ঘরে একখানা। দুটো বাথরুম, ড্রয়িং-

কুন্সেই খাবার জন্য কোল্ডিং টেবিল। আর একটা ঘরের মতো জায়গায় সাইড বোর্ড, তার ভিতরে ক্রকারি কাটলারি। এইখান থেকেই ছাদে উঠবার সিঁড়ি।

বসবার ঘরে ফিরে এসে স্বাতি বলল: আমাদের আর একখানা শোবার ঘর চাই।

তাও আছে।

বলে সাগ্রহে নৌকোর মালিক আমাদের পাশের হাউস বোটে নিয়ে এল। এখানা মস্ত বড় নৌকো। বসবার ঘর ও খাবার ঘর আলাদা, দুখানা বড় বড় শোবার ঘর, খাট দুখানা করে। ঝকঝকে ফার্নিচার, কার্পেট, লেসের পর্দা। শুধু বাতি নয়, পাখা আছে, রেডিও আছে।

নৌকোর মালিক বলল: আমার আর একখানা হাউস বোট আছে, তাতে শোবার ঘর তিনখানি।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল: আমাদেব দুখানা ঘরই দরকার। আমি মার সঙ্গে থাকব।

আমার মনে হল, স্বাতি আলাদা ঘরে একা থাকলে মামী খুশী হবেন না মনে করেই সে এই ব্যবস্থা করছে। তারপর নির্বিকার ভাবে বলল: আমরা ভাড়া নিয়ে দরাদরি পছন্দ করি না। এক দর বললে থাকব, তা না হলে চলে যাব। শুধু নৌকো ভাড়া।

হাউস বোটওয়ালা তখন কার্পেটের উপর হাঁটু মুড়ে হাত জোড় করে বসেছে। অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে বলল: এ স্পেশাল ক্লাস হাউস বোট—

খুব বেশি পছন্দ হয় নি, এই রকম ভাব দেখিয়ে স্বাতি বলল: তা জানি। আমাদের সময় কম, দরে না বনলে আমরা হোটেলে চলে যাব।

বেচারা আরও করুণ হয়ে বলল: পাশের ছোট হাউস বোট পছন্দ হলে সস্তায় দিতে পারতাম, এর ভাড়া—

বলে শিকারাওয়ালার দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করল। তারপর তার উত্তর শুনে বলল: দৈনিক কুড়ি টাকা পড়বে।

স্বাতি এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বলল: পনর টাকায় আমরা থাকতে পারি।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হাউস বোটওয়ালা তুবার স্বাতিকে ও তুবার আমাকে নমস্কার করে পকেট থেকে সিগারেট বার করল। আমি নিলুম না বলে শিকারাওয়ালাকেই দিল ছটো সিগারেট। শিকারাওয়ালাও একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আর কী কী সুবিধা দেবে?

সে বলল: কুক বেয়ারা সুইপার ভিস্তি। খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে?

স্বাতি বলল: রান্না ঘর আছে তো?

নিশ্চয়ই। রান্নার জন্যে অন্য নৌকো আছে, আর ওপারে যাবার জন্যে শিকারা।

স্বাতি বলল: বাবা মাকে তুমি নিয়ে এস গোপালদা, আমি এখানকার ব্যবস্থা করছি।

তাকে একা ফেলে যেতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলুম। শিকারাওয়ালা বলল: মালপত্র কোথায় আছে বলুন, আমি নিয়ে আসছি।

হাউস বোটওয়ালা বলল: এ আমাদের নিজেদের লোক, কিছু গোলমাল করবে না।

স্বাতি বলল: সেই ভাল। তুমিও তো ক্লান্ত হয়েছ, ও একাই যাক।

বলে নাম ঠিকানা তাকে জানিয়ে দিল।

চক্ষের নিমেষে শিকারাওয়ালা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজ এই হাউস বোটে স্বাতির একটা নতুন রূপ আমি দেখতে পেলুম। নারীর শাশ্বত রূপ এটি। কল্যাণী গৃহিণীর সুধাসিক্ত সেবিকার রূপ। শিকারাওয়ালার মতো সেও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তাকে যখন দেখতে পেলুম, তখন তার কোমরে আঁচল জড়ানো, কপালের উপরে অল্প অল্প স্বেদ দেখা দিয়েছে। ত্রস্ত পদে ফিরে এসেই চেঁচিয়ে উঠল: কী করছ গোপালদা, ঐ লোকটাকে ধরতে পারছ না? সালামা, কোথায় গেল সালামা?

সালামা আবার কে?

সালামাকে ধরতে হবে না, ধর ঐ লোকটাকে, নৌকো থেকে জাল ফেলে যে লোকটা মাছ ধরছে।

তার সঙ্গে আমিও হাউস বোটের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম।

স্বাতি হাত নেড়ে ডাকল জেলেটাকে। সে জাল গুটিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: মাছ আছে?

কথা না বলে লোকটা নৌকোর ভেতর থেকে একটা মাছ তুলে ধরল। একেবারে জ্যান্ত মাছ, তার হাতের ভিতর ছটফট করছে।

আমাদের হাউস বোটের চারি পাশ ঘিরে লোক চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তা জানতে পারলুম একজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে। জেলের হাত থেকে সে মাছটা সংগ্রহ করে নিল। স্বাতি বলল: কত দাম দিতে হবে সালামা?

একটি দীর্ঘ দেহের বৃদ্ধ মানুষ, মাথার চুলগুলি মেহেদীর রঙে রাঙা। সরল প্রসন্ন মুখে উত্তর দিল: দু সেরের বেশি হবে, একটা গোটা টাকা দিন।

এক টাকা দাম পেয়ে লোকটি সন্তুষ্ট হল, বলল: কাল আবার আসব মেমসাহেব?

নিশ্চয়ই।

তারপরে সালামার দিকে তাকিয়ে বলল: সরষের তেল নেই সালামা?

সালামা মাথা নাড়ল।

স্বাতি বলল: এস, আমি দেখছি।

বলে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই বারান্দাতেও সুন্দর বসবার জায়গা আছে। আমি বসে পড়ে মামা মামীর অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সামনে দিয়ে ডিঙি নৌকোর মতো ছোট ছোট নৌকো যাচ্ছে। কেউ সিল্ক আর গরম কাপড় নিয়ে, কেউ কাঠের ও নানা রকম সৌখিন জিনিস নিয়ে। ফটোগ্রাফার যাচ্ছে, নৌকোয় করে পোস্ট অফিসও গেল। স্বাতি যখন ফিরে এল, তখন ফলওয়ালা যাচ্ছে। নানা রকমের ফল তার নৌকোর ওপরে থরে থরে সাজানো। ফল-ওয়ালা নিজেই আমাদের নৌকোর কাছে এল। নানা জাতেব আপেল নাসপাতি আখরোট আর বাবুগোসা। স্বাতি আপেল আর আখরোট কিনল, আর ফলওয়ালা জোর করে গছাল বাবুগোসা। বলল: কাশ্মীরের বাইরে এ ফল আপনারা পাবেন না।

নাসপাতির মতো ফল, কিন্তু রসে ভর্তি। এমন নরম রসমধুর ফল সত্যিই বিরল। অথচ সব চেয়ে সস্তা। আমরা দশ আনায় এক সের কিনেছিলুম, সে বেশি দামের আপেলের চেয়েও খেতে অনেক সুস্বাদু।

হঠাৎ সালামাকে দেখলুম, দুটো হাউস বোটের ফাঁক দিয়ে একখানা নৌকোয় চেপে বেরিয়ে গেল। একটা হাত-পাখার মতো গোল তক্তা দিয়ে জল সরিয়ে এরা এগিয়ে চলে। ওপারে পৌঁছতে দু মিনিটও লাগল না। তারপর নৌকো পারে ঠেকিয়ে ডাল গেটের দিকে চলে গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম: ও কোথায় গেল?

কাছেই একটা দোকান আছে। সেখান থেকে সরষের তেল আর কিছু মসলা আনবে। মসলা এরা বেটে রেখেছে, বড় নোংরা মনে হল। এ সময় গ্রাম থেকে দই বিক্রি করতে আসে, পেলে তাও আনবে।

একটু থেমে বলল: সবজিওয়ালারা সকাল বেলাতেই চলে গেছে। এদের কাছে যা ছিল, আজ তাতেই চলবে। একটু নজর রেখো। ফুলওয়ালী হয়তো এখনই ফিরবে।

ফুলওয়ালী নয়, শহরের দিক থেকে ফুলওয়ালা ফিরল তার নৌকোয়। সব ফুল তার বিক্রি হয় নি। তাকে দেখতে পেয়ে স্বাতি খুশী হয়ে বলল: ভেতরে এসে ফুলদানিগুলো সাজিয়ে দাও।

শুধু বসবার ঘরে নয়, ফুলদানি সব ঘরেই আছে। দেওয়ালেও আছে ফুলদানি। তাতে শুকনো ফুল। ফুলওয়ালা অ্যাস্টর ফ্লক্স আর অ্যান্টিরিনামে সব সাজিয়ে দিল। স্বাতি বলল: কত দাম দেব?

লোকটা সবিনয়ে বলল: বকশিশ দাও।

স্বাতি তার হাতে দুটো টাকা দিয়েছিল। লোকটা বলল: ফুলেরই দাম হল না, বকশিশ হল কী?

স্বাতি তার হাতে আরও একটি টাকা দিতেই লোকটা একটা সেলাম করে বলে গেল: কাল একেবারে তাজা ফুল নিয়ে আসব।

আমার দিকে ফিরে স্বাতি বলল: কাপড় গামছা থাকলে আমরা স্নান সেরে ফেলতে পারতাম। দু দিন ভাল স্নান হয় নি।

হাউস বোটের বাথরুম দুটি ভারি সুন্দর। কাঠের পাটাতনের মেঝের উপর ঝকঝকে টাইল, তার উপরে বাথ টাব। বেসিন আছে, শাওয়ার আছে, ফ্লাশ দেওয়া স্যানিটারি কমোড। হাউস বোটের ছাদে জলের ট্যাঙ্ক আছে, মাটিতে আছে জলের কল। সকালে বিকালে ভিস্তি রবারের পাইপ দিয়ে ট্যাঙ্কে জল ভরে দেয়। বাথরুমের নোংরা জল ডাল লেকে যায় না। হাউস বোটের গায়ে

টিনের ট্যাঙ্ক আছে, সেখানে জমা হয়। মেথর দু বেলা পরিষ্কার করে। এই ব্যবস্থা দেখে আমারও পছন্দ হয়েছিল। বললুম: জিনিসপত্র এসে পড়লেই স্নান করে নেব।

স্বাতি বলল: তুমি বাবা মার জন্যে অপেক্ষা কর গোপালদা, রান্নাটা আমি একবার দেখে আসি।

বললুম: চল না, আমিও তোমার ঘরকন্না দেখে আসি।

না না, এস না আমার সঙ্গে।

কেন?

মেয়েরা লজ্জা পাবে, ভারি লাজুক তারা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কোন্ মেয়েদের কথা বলছ?

স্বাতি বলল: তুমি তাদের চিনবে না। এই হাউস বোটের মালিকের পরিবার। আমাদের পেছনে একটা নৌকোর ভেতর থাকে। রান্নাবান্না তারাই করে বলে মনে হল। আমাদের খানসামা ও বেয়ারার কাজ করবে সালামা।

বলে পাশের বারান্দা দিয়ে স্বাতি চলে গেল।

রেলে আজকাল এই রকম গাড়ির প্রচলন বেড়েছে। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটি সরু বারান্দা, সেখান থেকে কামরাগুলোতে ঢুকতে হয়। প্রত্যেকটি কামরায় ঢোকবার জন্য একটি করে দরজা। আমাদের হাউস বোটেও এমনি একটি বারান্দা আছে। সেখান থেকে বসবার ঘর, খাবার ঘর আর শোবার ঘর দুটোতে ঢোকা যায়। বাথরুম দুটো শোবার ঘরের সঙ্গে যুক্ত। তারপরে পিছনে যাবার রাস্তা। সে দিকে আর জল নেই, শক্ত মাটি। ছোট বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকার জায়গা। জল যেখানে ভিতরে চলে গেছে, সেই সব খালে ছোট ছোট জীর্ণ হাউস বোট বাঁধা আছে। তাতে হাউস বোট-ওয়ালারা থাকে, কোনটা বা রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাহিরের বারান্দায় বসে আমি আবার সালামাকে দেখতে পেলুম। সে একটু ঝুঁকে হাঁটে, ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তার নৌকোয়

উঠল। তার পর এপারে এসে দুই নৌকোর মাঝখান দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে আমি দুখানা টাঙ্গাকে ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখলুম। তারপর মামা মামীকে নামতে দেখলুম সিঁড়ি দিয়ে। সঙ্গে রামখেলাওন আর শিকারাওয়ালা। বাঁধানো ঘাটের উপরে বসে যে ছেলেরা এতক্ষণ জটলা করছিল, তারাই মালপত্র টাঙ্গা থেকে নামিয়ে শিকারায় তুলল। শিকারায় উঠতে যে মামা ইতস্তত করেছিলেন, তা আমি এধার থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। শেষ পর্যন্ত মামা ও মামী দুজনেই উঠলেন। খানিকক্ষণ কেঁপে নৌকো স্থির হল। অনেকগুলো শিকারার মাঝখান থেকে নিজের শিকারাটা ঠেলে দিয়ে শিকারাওয়ালাও চেপে বসল, তারপরে দাঁড় টানল এদিকে আসবার জন্যে।

স্বাতিকে ডেকে আনব কিনা আমি ভাবছিলুম, এমন সময় সে নিজেই এসে উপস্থিত হল। বলল: বাবা মা আসছেন বুঝি!

বললুম: হ্যাঁ।

উল্লাসে স্বাতি তার ডান হাত তুলে নাড়তে লাগল।

শিকারা এসে আমাদের হাউস বোটের গায়ে ঠেকল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। গোটা চারেক ধাপ। সিঁড়ি মজবুত হলেও টলমল করে। নৌকোওয়ালা নিজে আগে নেমে শিকারা যথাসম্ভব স্থির করার চেষ্টা করল। কিন্তু মামার মুখের প্রসন্নতা মিলিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি এই রকম করে উঠেছ?

স্বাতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল: কিছু ভয় নেই বাবা।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

বলে খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। শিকারা দুলতে লাগল প্রবল ভাবে। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে বললেন: অতি বেয়াড়া ব্যবস্থা।

তার পরে কোন রকমে টাল সামলে সিঁড়ির উপর উঠে পড়লেন।

মামী অনেক সহজ ভাবে এলেন। বারান্দায় উঠে মামাকে বললেন : তোমার সবটাতেই আদিখ্যেতা।

হাউস বোটের পাশ দিয়ে যে চলাফেরার রাস্তা, সেই পথে সালামা এসে অপেক্ষা করছিল। শিকারাওয়ালা লাফিয়ে নেমে মালপত্র তার হাতে তুলে দিতে লাগল। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে দুজনে সমস্ত জিনিসপত্র হাউস বোটের ভিতরে নিয়ে এল।

ভিতরের ব্যবস্থা দেখে মামা ও মামী দুজনেই সন্তুষ্ট হলেন। মামী বেশি খুশী হলেন বাথরুম দেখে। কিন্তু মামা বললেন : আর একখানা শোবার ঘর থাকলে ভাল হত। গোপাল একা একখানা ঘর নিতে পারত।

খাবার টেবিলে বসে মামা অভিভূত হয়ে গেলেন। স্বাতি আগে থেকেই টেবিলের উপর ফুল ও ফল সাজিয়েছিল। সালামা একে একে অন্য প্লেটগুলি নিয়ে এল। দেরাদুনের বাসমতী চালের মতো সরু চালের ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ ভাজা ও মাছের ঝাল। দইও এল। মামীও আশ্চর্য হয়ে বললেন : এ সব রাঁধল কে?

পরম কৌতুকে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : স্বাতি।

মামা বললেন : সত্যি নাকি!

বললুম : এসে অবধি তো সে এই কাজই করছিল। মাছ কিনেছে, সরষের তেল আনিয়েছে, রান্নাও দেখিয়েছে সালামাকে।

সালামা আমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছে যে এই ব্যবস্থা আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছে। অত্যন্ত সবিনয়ে জানাল যে বলে দিলে সে সব রকমের সেবাই করতে পারবে।

স্বাতি বলল : সংসার করা এখানে ভারি সোজা।

মামা হেসে বললেন : কঠিন কোথাও নয়।

১৯

আহারের পরে আমরা বসবার ঘরে এসে বসলুম। প্রশস্ত জানালা দিয়ে মধ্যাহ্নের রৌদ্র এসে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীনগরের রৌদ্রে উত্তাপ নেই, শীত নেই আবহাওয়ায়। আমাদের গায়ে গরম জামা নেই, মামা একখানা গরম চাদর কাঁধের উপর ফেলে রেখেছেন। নিবিষ্ট মনে পাইপ ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানলেন, তারপরে বললেন: এখানে তো শীতের কোন নমুনা দেখছি না।

রাতে তাঁবুর ভিতরে আমাদের শীত করে নি, সকালেও না। স্বাতি বলল: কলকাতার প্রথম শীতের মতো ঠাণ্ডা, গরম কাপড় গায়ে দিতে হবে লোক দেখাবার জন্যে।

মামী বললেন: লোক দেখাবার জন্যে আবার কেউ গরম কাপড় গায়ে দেয় নাকি!

স্বাতি বলল: পুরুষেরা গায়ে দেয় সরকারী শীতে। ঠাণ্ডা না থাকলেও নিয়মের জন্যে গায়ে দেয়। আর মেয়েরা শখে, ফ্যাশানের জন্যে। তাই না গোপালদা?

বললুম: আমি গায়ে দিই না গরম কাপড় নেই বলে।

স্বাতি বলল: দরকার হলে থাকত।

ঠিক এমনি সময় জানালা দিয়ে একজন কাশ্মীরী লোক উঁকি দিয়ে বলল: ভিতরে আসতে পারি?

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন: কী দরকার?

লোকটা ভয় পেয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল। আমি উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম যে সে তার নিজের নৌকোয় নেমে গেছে। আমাকে মুখ বাড়াতে দেখে বলল: ভাল শাল আছে, তুস শাহতুস—

দরকার নেই।

বলে আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলুম।

মামা বললেন : খুব সাবধানে থাকবে।

স্বাতি বলল : ওরা তো ফেরিওয়ালা।

মামা বললেন : সতর্ক না থাকলেই বুঝতে পারবে ওরা কে। চোরের রাজত্ব আজকাল সর্বত্র।

মামার এ ভয় অমূলক। তর্ক করলেও তিনি মেনে নেবেন না। তাই আমি নীরবে রইলুম। কিন্তু স্বাতি আপত্তি জানাল, বলল : কিন্তু সালামা বলছিল যে এ দেশে চোর একেবারেই নেই। নির্ভয়ে সব কিছু ফেলে রাখা যায়, কেউ হাত দেবে না। এ দেশের গরিব চেয়ে খাবে, কিন্তু চুরি করবে না।

মামা বললেন : ও সব শাস্ত্রের কথা। পেটের এমনি দায় যে চুরিকে লোকে আর চুরি ভাবছে না, অন্যের জিনিস নিজের বলে দাবী করছে। এ দেশটাই তো অন্যে দাবী করছে! গোপাল কী বল?

বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

রাজনীতির কথা আমি এড়িয়ে গেলুম। বললুম : এখনকার কথা জানি নে, তবে আগে এই দেশের লোক যত সৎ ছিল, তত দরিদ্রও ছিল। পয়সার অভাবে তারা অনাহারে থেকেছে, কিন্তু পরের পয়সায় কখনও হাত দেয় নি।

মামা বললেন : এখন বুঝি পয়সার মাহাত্ম্য বুঝেছে বলেই পরের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে!

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। বলল : দেখ নি বুঝি, হাউস বোটে তালা লাগাবার কোন ব্যবস্থা নেই!

মামী চমকে উঠে বললেন : অ্যাঁ!

মামা বললেন : তাই নাকি!

মামী উঠে গিয়ে দরজা পরীক্ষা করে দেখলেন। দরজায় ছিটকিনি নেই, কড়াও নেই। ভিতর থেকে হুড়কো দেওয়া যায় না, তালা দেওয়া যায় না বাহির থেকে। দরজাগুলোও

আমাদের দরজার মতো দু পাল্লার নয় যে ঝড় এলে হুড়দাড় করে খুলবে আর বন্ধ হবে। এ কতকটা রেলের স্লিপিং কোচের মতো। এক পাল্লার বড় দরজা, একটা ধার ধরে ঠেলে দিলে দেওয়ালের ভিতর ঢুকে যায়। শব্দ হয় এমন যে এই দরজা খুলবার বা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠবে।

উদ্বিগ্ন ভাবে মামী বললেন: তা হলে আমরা বেরব কী করে! ঘুমবই বা কোন্ সাহসে!

সালামা তো এই কথাই বলছিল—দরজা বন্ধ করবার দরকার এখানে হয় না। ওরা চুরি করে না, বকশিশ চায় আর—

আর কী?

বাজার করে এসে পয়সা ফেরৎ দেয় কিনা দেখতে হবে।

তার মানে?

আজ দেয় নি। বাজার থেকে ফিরবার পরে জিনিস দেখে খুশী হয়েছি বলতেই একটা সেলাম করেছে। তার মনে বোধহয় ফেরৎ পয়সা তার বকশিশ।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু মামী এ কথা শুনে খুশী হলেন না।

এর পরে মামা কী বলবেন, তা আমি অনুমান করতে পারি। নূতন জায়গায় এলে আহারের পর তিনি পাইপ ধরিয়ে ইতিহাসের কথা শুনতে চান। আর স্বাতি এর অপেক্ষা করতে থাকে, আমাকে একটা কটাক্ষ করে সে প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু এবারে মামা কোন প্রশ্ন করছেন না দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছিল। কেমন করে মামাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, সেই কথাই বোধহয় ভাবছিল। আমি দেখলুম যে মামা তাকে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু নির্বিকার ভাবে পাইপ টানতে লাগলেন।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলল: গোপালদা কিছু বলবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে ছটফট করছে।

মামা যেন শুনতে পান নি, এই ভাবে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: কাশ্মীরের ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে তো!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: ইতিহাসের কথা শোনবার জন্যে কেউ ছটফট করছে কিনা, আমি সেই কথা ভাবছি।

আমি হেসে ফেলেছিলুম। আর স্বাতি লজ্জা পেল অপরিমিত।

মামা আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন: দোষ আমার আর তোমার। আমি জিজ্ঞেস করি, আর তুমি বল। এবারে দেখছ তো, আমি ছাড়াও তোমার আরও শ্রোতা আছে!

বললুম: ইতিহাস শোনাবার ভার তো এবারে আমার নয়।

ঠিকই তো, এবারে স্বাতিই তো সব ভার নিয়েছে!

স্বাতি বলে উঠল: সর্বনাশ, আমি ইতিহাস শোনাতে পারব না।

না পারলে চলবে কেন!

দোহাই তোমার গোপালদা, আমাকে তোমার শ্রোতা থাকতে দাও। বক্তৃতার ভার তোমার ওপরেই থাক।

মামা হাসছিলেন। বললেন: তাইতেই বলি—

কিন্তু কী বলেন, তা আর বললেন না। পাইপে মুখ দিয়ে গভীর মনোযোগে ধোঁয়া টানতে লাগলেন।

খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে স্বাতি বলল: কবি কহ্লনের কথা দিয়েই শুরু কর।

বললুম: কহ্লনই বোধহয় ভারতের প্রথম ইতিহাস রচয়িতা। বাণভট্টের হর্ষচরিত বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত কিংবা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত বর্তমানের আদর্শ অনুসারে ইতিহাস নয়। কিন্তু কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীকে মূল্যবান ইতিহাস বলে মানতেই হবে। কহ্লন মিশ্র কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী চম্পকপ্রভুর পুত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি সংস্কৃত কাব্যে এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

স্বাতি বলল: কাব্যে আবার ইতিহাস হয় নাকি!

বললুম : মহাভারতকেও অনেকে ইতিহাস বলেন, তা মহাকাব্য। রাজতরঙ্গিণী পড়লেও দেখবে যে সত্যিই একখানি সুন্দর কাব্য। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সমকালীন গোনন্দের কাল থেকে তাঁর নিজের সময়ের সিংহদেবের রাজত্ব কাল পর্যন্ত কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

স্বাতি বলল : এর আগে যদি কোন ইতিহাস না থাকে তো রাজতরঙ্গিণীর উপাদান তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

সে কথা কোন ঐতিহাসিককে জিজ্ঞেস কোরো।

মামা বললেন : টড সাহেব তো শুনেছি চারণদের গান শুনে আর পাঁচজনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজস্থানের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। কহ্লনও হয়তো তাই করে থাকবেন।

স্বাতিকে আমি বললুম : এক দিন চল কোন ঐতিহাসিকের কাছে। তাঁর কাছেই সব কথা জানা যাবে।

মামা বললেন : তারপর বল।

বললুম : রাজতরঙ্গিণীতে একজন রাজার পর আর একজনের কথা বলা হয়েছে, তারপর আর একজনের কথা। সকলের কথাই বলব, না সংক্ষেপে বলব?

স্বাতি বলল : সংক্ষেপে কেন! আমাদের তো তাড়া নেই, এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে শুনব।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : সেই ভাল। রাজাদের কথা আরম্ভ করবার আগে তাঁদের বংশের কথা একটু বলে নিই। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম রাজা প্রথম গোনর্দ। কহ্লনের মতে সেটা ৬৫৩ কল্যব্দ, ইংরেজী মতে ২৪৪৮ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ। এর পরে প্রায় সোয়া দু হাজার বছর ধরে এই বংশের তিয়াত্তর জন রাজা রাজত্ব করেন।

চোখ কপালে তুলে মামা বললেন : তারপর?

তারপর বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতির বংশের ছজন রাজার পরে আবার গোনর্দ বংশের ঊনত্রিশ জন রাজা।

তারপর ?

তারপর পৃথক বংশ। বেশি নয়, এঁদের মাত্র উনপঞ্চাশ জন রাজার পরে মুসলমান বংশ। তাদের মাত্র পঁয়ত্রিশ জন রাজত্ব করবার পরে দিল্লীর মোগল বাদশাহরা কাশ্মীর অধিকার করেন।

মামা বললেন: মাত্রই বটে।

স্বাতি বলল: এ সমস্তই গোপালদার মনগড়া কথা। এত হিসেব কি কারও মনে রাখা সম্ভব!

বললুম: সম্ভব নয়। যে পারে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে। তবে যদি মোটামুটি কিছু জানতে চাও তো বলি।

মামা বললেন: বলবে বৈকি।

বললুম: রাজতরঙ্গিণীতেই আমরা মৌর্য সম্রাট অশোকের উল্লেখ পাই। তাঁর রাজত্ব কালে কাশ্মীর মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তাঁর পরে এল কুষাণ রাজা কণিষ্কের অধীনে। এ হল খ্রীষ্টের জন্মের দু তিন শো বছর আগের কথা। কাশ্মীরে তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজারা কাশ্মীরে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনলেন। অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্য সূর্য মন্দিরের সংস্কার করে দিলেন, শিবের মন্দির স্থাপিত হল নানা স্থানে। শঙ্করাচার্যের নামও কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমানরা এল। দীর্ঘ দিন কাশ্মীর বিদেশী মুসলমানের অধীন ছিল। তারপরে এক সময় স্থানীয় মুসলমানেরা দেশ স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। এই রাজাদের মধ্যে জৈন উল আব্‌দিনই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত।

মোগল বাদশাহ আকবর কাশ্মীর অধিকার করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই দেশকে ভাল-বেসেছিলেন। নূরজাহান বেগমকে নিয়ে অবসর যাপনে আসতেন ঘন ঘন। শাহজাহান বাদশাহও আসতেন। তাঁদের স্মৃতি চিহ্ন

আছে বিতস্তার উৎস ভেরিনাগে, আচ্ছাবলে, ডাল লেকের ধারে ধারে বিচিত্র সৌন্দর্যের আকর মোগল উদ্যানগুলিতে।

তারপর কাশ্মীর হল কাবুলের অধীন। এর আশি বছর পরে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর অধিকার করেন। খুব অল্প দিন এই রাজ্য শিখদের অধীন ছিল। শিখদের পরাজয়ের পরে কাশ্মীর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসেছিল। কিন্তু তারা এই রাজ্য জম্মুর ডোগরা রাজা গুলাব সিংহের কাছে পঁচাত্তর লাখ টাকায় বিক্রি করে দিল। সে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। এই বংশের রাজারা মাত্র একশো বছর এই রাজত্ব ভোগ করলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন কাশ্মীরে আর রাজার অধিকার রইল না। কাশ্মীরের যুবরাজ করণ সিং আর বাঙলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুতে এখন কোন প্রভেদ নেই।

মামার পাইপে আর আগুন ছিল না। ছাইদানিতে ঠুকে ঠুকে তিনি ছাই ঝেড়ে ফেললেন। এবারে তিনি যে একটু ঘুমোবার জন্যে উঠবেন তা জানি। উঠলেনও। বললেন: তোমরা গল্প কর, আমি একটু গড়িয়ে নিই।

অনেকক্ষণ আগে থেকেই মামী উসখুস করছিলেন। এবারে তিনিও উঠে বললেন: তোমরা এখন কী করবে?

স্বাতি বলল: ছাদের ওপরে উঠব।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: ছাদে ওঠা যায় নাকি!

যাবে না কেন! সুন্দর সিঁড়ি আছে, আর ওপরে আছে চমৎকার বসবার ব্যবস্থা। ডেক চেয়ার আর টেবল। বিকেলের চা তো সেখানেই দিতে বলেছি।

মামা সহাস্যে বললেন: বিকেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে!

উত্তর না দিয়ে স্বাতি হাসল। আর মামা মামী দুজনেই বেরিয়ে গেলেন শোবার জন্যে।

তাঁদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই স্বাতি বলল: এইবারে বল।

কী বলব?

ভেবেছিলুম যে স্বাতি হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, কেমন লাগছে? কিংবা, সেই খোঁড়া রাজপুত্তুরের কী হল? কিন্তু সে সব কথা সে জিজ্ঞাসা করল না। বলল: এই বারে কী করবে তাই বল।

এই কথা!

আমার কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর শুনে জিজ্ঞাসা করল: তবে তুমি কী ভেবেছিলে?

ভেবেছিলুম, তোমার সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইবে। রাজকন্যার মতো, না তপস্বিনীর মতো দেখাচ্ছে তোমাকে! খোঁড়া রাজপুত্তুরকে ছেড়ে চাষার ছেলেটাকেই বেঁধে আনতে বলবে রাজাকে, না পার্বতীর মতো তপস্যায় বসবে এই কাশ্মীর পাহাড়ে!

রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে নিয়ে কী একটা সস্তা রসিকতা করেছিলে বলে মনে পড়ছে।

সস্তা বলেই মনে আছে, দামী হলে ভুলে যেতে।

স্বাতি বলল: ঘরে আর নয়, বাইরে এস।

বললুম: ছাদেও নয়, আকাশের রোদ এখনও প্রখর।

কাজেই আমরা হাউস বোটের সামনের বারান্দায় এসে বসলুম। বেঞ্চের উপরে নরম গদি, উপর থেকে সাদা-কালো ঝালর ঝুলছে। সামনে ডাল লেকের শান্ত নীল জল। তার পিছনে পাহাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বাঁধানো সড়ক শহরের দিক থেকে এসে এঁকে বেঁকে অনেক দূর চলে গেছে। মাঝে মাঝে এক একখানা টাঙ্গা যাচ্ছে পথ দিয়ে, আর জলের উপর দিয়ে যাচ্ছে শিকারা। পাশে জলের শব্দ শুনে চেয়ে দেখলুম, কয়েকটি হাঁস দুখানা হাউস বোটের মাঝে খেলা করছে। স্বাতি কোন কথা কইল না।

আমি বললুম: এখানে আমরা কতদিন থাকব?

আমার প্রশ্ন বোধহয় স্বাতি শুনতে পেল না। অথচ সে

অন্যমনস্কও ছিল না। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও একটি দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হলুম। আমাদের হাউস বোট থেকে অল্প একটু দূরে একখানা শিকারা এসে একটা হাউস বোটের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। আগুনের মতো লাল রঙের শাড়ি পরে একটি মেয়ে শিকারায় উঠল। চোখে কালো চশমা, হাতে বড় ব্যাগ, কাঁধ থেকে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। বয়স স্বাতির মতোই হবে, কিন্তু প্রসাধনে ঝলমল করছে।

শিকারাটা ছাড়ল না। অপেক্ষা করল আর একজন মহিলার জন্য। তিনি প্রৌঢ়া, কিন্তু সজ্জায় তা মনে হচ্ছে না। আমাদের সামনে দিয়ে যখন তাঁরা গেলেন, তখন তাঁদের ভাল করে দেখলুম। মা ও মেয়ে বলেই মনে হল। বাঙালী হলে মেয়েটি অবিবাহিত, মাথায় সিঁদুর নেই।

সহসা আমি স্বাতির চোখে কৌতুক দেখলুম। দু চোখ তার নেচে উঠল। শিকারাটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই জিজ্ঞাসা করল ঃ ঐ মেয়েটির মা কী বলল, শুনেছ গোপালদা ?

শুনি নি।

বলল, ছেলেটি বেশ।

কোন্ ছেলেটি ?

চাষার ছেলেকে ওরা রাজপুত্তুর ভেবেছে। কিন্তু এ রাজপুত্তুরের পা তো খোঁড়া নয়, রাজকন্যার পছন্দ হবে।

তারপরেই বলল ঃ মাকে বলতে হবে কথাটা।

১৩

সহসা স্বাতি সচেতন হয়ে বলল : চারটে কি বেজে গেছে গোপালদা ?

আমি ঘড়ি দেখে তার উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম। খানিকটা তফাৎ থেকে কে বলে উঠল : থোড়া দের হায়।

স্বাতি চমকে চারিধারে চাইল। আমিও তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। স্বাতি কিন্তু চুপ করে বসে রইল না, উঠে গিয়ে পাশের হাউস বোটের দিকে তাকাল। তারপরেই হেসে বলল : সালামা ! তুমি এখানে কী করছ ?

সেই লম্বা ঝুঁকে-পড়া লোকটি, আমাদেরই হাউস বোটের পাশ থেকে বেরিয়ে এল। তার কটা চুল আর নীল চোখে একটা বিদেশী ইঙ্গিত, কিন্তু ব্যবহার তার সরল নিরক্ষর পাহাড়ীর মতো। মাথা চুলকে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল : আপনারা জেগে আছেন কি না তাই দেখতে এসেছিলাম।

ফিরে আসতে আসতে স্বাতি বলল : আমার তো মনে হয়েছিল যে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলে !

স্বাতি এ কথা বাঙলায় বলেছিল। সালামা বুঝতে পারে নি। বলল : বিকেলের চা তাহলে ছাদের ওপরেই দেব ?

আমি বললুম : মামা মামী কখন উঠবেন তা তো বোঝা যাচ্ছে না !

স্বাতি বলল : চা এলেই আমি জাগিয়ে দেব।

আমাদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই সালামা সরে গিয়েছিল। স্বাতিও একবার বসবার ঘরে গিয়ে একখানা বই হাতে করে বেরিয়ে এল। বলল : এই গাইড বইখানা দিল্লী থেকেই সংগ্রহ করে এনেছি। কাশ্মীর সম্বন্ধে সমস্ত খবর এতে আছে।

ভুল খবর নেই তো !

মানে !

মানে, প্রথম খবরটাই তো দেখলুম ভুল। এই সব হাউস বোটের সরকারী ভাড়া যা লেখা আছে, তা সত্যি ভাড়া নয়। যার কাছে যা পায়, তাই হল সত্যি ভাড়া।

স্বাতি বলল : টাকা পয়সার ব্যাপারে যে সতর্ক থাকতে হবে তা বুঝতে পেরেছি। আমি বলছি ইটিনেরারির কথা।

বলে বইএর শেষের দিকের একখানা পাতা খুলে বলল : কাশ্মীরে চার দিন সাত দিন বা ষোল দিন থাকলে কী ভাবে সমস্ত জায়গা দেখা উচিত তা লেখা আছে। যারা চার দিন বা সাত দিন থাকে, তারা প্লেনে আসে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

আমি বললুম : চার দিন থাকলে কী কী দেখা উচিত পড়।

স্বাতি বলল : প্রথম দিন বিকেলে বাঁধে বেড়ানো, ঝিলম নদীতে শিকারা বিহার, তারপর সেন্ট্রাল মার্কেট ও কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট আর্ট এম্পোরিয়াম।

বাজার দেখা মানেই পয়সার শ্রাদ্ধ। তার পরের দিন ?

তার পরের দিন শিকারায় চেপে মোগল গার্ডেন দেখতে হবে। দুপুরের লাঞ্চ ও বিকেলের চা নিতে হবে সঙ্গে।

রাতে কোন্ বাজার ?

স্বাতি সহাস্যে বলল : বিশ্রাম। পরদিন ভোর বেলাতেই গুলমার্গ ছুটতে হবে কিনা !

বুঝেছি।

চতুর্থ দিন সকালে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের উপর থেকে শ্রীনগরের দৃশ্য দেখতে হবে। বিকেলে প্লেনে।

বললুম : সাত দিন থাকতে হলে বেশি কী দেখবার আছে ?

স্বাতি বলল : বিকেলে প্লেনে না উঠে শিকারায় করে নাগিন লেক নাসিম বাগ ও হজরতবল মসজিদ। পরের দিন

পহলগাম। রাতে সেখানে থেকে তার পরের দিন চন্দনবাড়ি হয়ে ফেরা।

বুঝেছি।

কি বুঝেছ ?

এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই।

স্বাতি বলল: কিছুই বোঝ নি তাহলে। যদি তোমার ষোল দিনের প্রোগ্রাম হয়, তাহলে চার দিন যাবে যাতায়াতে। বাকি বারো দিন ছুটোছুটি করে মারা পড়বে। গুলমার্গেই থাকতে হবে তুদিন,· এক দিন ঘোড়ায় চেপে খিলেনমার্গে উঠবে, তৃতীয় দিনে ফেরা। পহলগামেও তাই—এক দিন ঘোড়ায় চেপে চন্দনবাড়ি, অমরনাথ যাবার পথটা দেখা হয়ে যাবে। এক দিন সোনমার্গ. এক দিন উলার লেক, সম্ভব হলে এক দিন যুসমার্গ। এ সব জায়গা বাসে যাতায়াত চলে।

বসবার ঘর থেকে মামার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বললেন: হাসপাতালে কদিন ?

আমরা তুজনেই চমকে উঠেছিলুম। তারপর এক সঙ্গে ভিতরে চলে এলুম। স্বাতি বলল: হাসপাতালে কেন ?

মামা বললেন: বাসে আর ঘোড়ায় অত ঘোরাঘুরি করলে কোমরটা কি আস্ত থাকবে!

বলে হেসে উঠলেন। আমরাও হাসলুম।

ছাদের উপরে হঠাৎ ঘড় ঘড় করে শব্দ হল। স্বাতি বলল: সালামা বোধহয় ফিরেছে।

মামীও ঘরে এসেছিলেন। বললেন: কী দরকার ছিল ছাদে উঠবার তা বুঝি নে।

মামা বললেন: এখানে আসবারই বা কী দরকার ছিল তাও তো বুঝি নে।

বলে তিনি সকলের আগে ছাদে উঠলেন।

কাঠের সিঁড়ি। ছাদের ফাঁকটা ঢাকা থাকে একটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিন দিয়ে। বৃষ্টি এলে ভিতরে জল আসবে না। সালামা সেই টিন সরিয়ে উপরে উঠেছিল। টেবিলে ঢাকনা পেতে নেমে গেল। আমরা চেয়ারে বসলুম।

কাশ্মীরের রৌদ্রে এখন আলো আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই। সূর্য হেলেছে পশ্চিমের দিকে। দক্ষিণে ঝিলম নদী। ডাল লেক উত্তর দিকে। এই দুয়ের মাঝে জল নালার মতো নয়, নদীর মতো। পূর্বে শঙ্করাচার্য পাহাড়। তার কোল দিয়ে যে পথ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত, তা এখন পথচারীর পদক্ষেপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের পিছনে মাটি, কিন্তু কোন ঘর বাড়ি নেই। এই মাটিতে অসংখ্য হাউস বোট পাশাপাশি নোঙ্গর করা আছে। সঙ্কীর্ণ নালার মতো হয়ে জল যেখানে ভিতরে ঢুকেছে, সেখানেও হাউস বোট আছে বাঁধা। পুরাতন জীর্ণ হাউস বোট, তার মধ্যে হাউস বোটের মালিক পরিবারের বসবাস। অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে তারা কেমন করে বাঁচে, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

এই মাটি গাছপালার ভিতর খানিকটা এগিয়েই শেষ হয়ে গেছে। আবার জল। উড়ো জাহাজ থেকে দেখলে হয় তো বোঝা যাবে যে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই জল আছে। তার প্রশস্ত এলাকার নাম হয়েছে ডাল লেক ও নাগিন লেক। ভিতরে ভিতরে বনাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে। সে স্থান এমনই সঙ্কীর্ণ যে ঘর বাড়ি কৃষিক্ষেত্র সেখানে নেই। লোকালয় লুকিয়ে আছে আমাদেরই হাউস বোটগুলির পিছনে। তারাও সামনের জল পেরিয়ে দূরের রাস্তায় গিয়ে ওঠে। বাজার হাট ও কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্য ঐ দিকেই সবাইকে যেতে হয়।

কয়েকটি শিকারা মরালের মতো সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। কোনটি ডাল লেকের দিকে যাচ্ছে, কোনটি বা সেদিক থেকেই ফিরছে। যারা সকাল বেলায় মোগল উদ্যান দেখতে বেরিয়েছিল, তাদের সময় হয়েছে ঘরে ফেরার। আর যারা সারা দিন ঘরের

ভিতরে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল, তারা এবারে বেড়াতে বেরিয়েছে। নেহেরু পার্কে নেমে খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বসবে, কিংবা এমনি যেতে যেতেই চারি দিকের প্রাকৃতিক শোভা আকণ্ঠ উপভোগ করবে।

মামী একখানা শিকারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। সেখানা দূরে চলে যেতেই বললেন: এখানকার নৌকোগুলো ঠিক আমাদের দেশেব মতো নয়।

মামা বললেন: সে কি তুমি এতক্ষণে বুঝলে?

মামী বললেন: বুঝে ফেললেই যে তখুনি বলতে হবে তার কি কোন নিয়ম আছে!

মানুষ তাই করে বলেই বলছি।

মামা মামীর বাক্‌যুদ্ধ যাতে আর অগ্রসর না হয় তার জন্য স্বাতি বলল: আমাদের দেশের মতো ডিঙ্গি নৌকো এদেরও আছে। ঐ দেখ না।

বলে একখানা নৌকোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন কাশ্মীরী নারী দুখানা হাউস বোটের মাঝখান দিয়ে সেই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। হাতে একখানি হাত পাখার মতো কাঠের গোল দাঁড়। ছপছপ করে জল কেটে পারের দিকে এগিয়ে গেল। এ যেন আমাদের দেশেরই ডিঙ্গি নৌকো। এমনি ডিঙ্গি নৌকো আমরা আগেও দেখেছি, জেলেদের ডিঙ্গি। একটুখানি ছই দেওয়া ডিঙ্গিও দেখেছি। পণ্যদ্রব্য নিয়ে যারা যাতায়াত করছে, তাদের ডিঙ্গিগুলি একটু অন্য রকম। নৌকোয় উঁচু কাঠের ছাদ চারটি খুঁটির উপরে। দেখতে কতকটা শিকারার মতোই।

শিকারা শৌখিন মানুষের বেড়াবার জন্যে। পণ্যদ্রব্যের ডিঙ্গি-গুলোরই একটা সাজানো রূপ: দু ধারে বসবার আসন গদি আঁটা। দুজন করে চারজন মানুষ মুখোমুখি বসতে পারে। মাঝখানে পা রাখবার জায়গা। ইচ্ছা করলে এগিয়ে শুয়ে থাকা যায়। নানা

বর্ণের ঝালর দেওয়া পর্দা দু ধারে গুটিয়ে রাখা, দরকার হলে টেনেও দেওয়া যায়। সামনে ইংরেজীতে শিকারার নাম লেখা আছে। বেশি দিন থাকলে শুধু শিকারাওয়ালার সঙ্গেই নয়, শিকারার সঙ্গেও যেন ভাব হয়ে যায়। অসংখ্য শিকারার মাঝে নিজের প্রিয় শিকারাটি খুঁজে বার করতে ইচ্ছে করে নাম দেখে।

স্বাতির কথার উত্তর দিলেন মামী, বললেন: তাই তো!

মামা বললেন: এও মানুষের মতো। বাইরে যতই প্রভেদ থাক, ভেতরটা একই রকম। সাজ সজ্জায় ধর্মে ও ভাষায় আসল মানুষটি কোন দিন ঢাকা পড়ে না।

মামী কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। নিচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই দেখা গেল সালামার মাথার কটা চুল আর সেই নীল চোখ। মুখে একটি আশ্চর্য রকমের নির্বিকার ভাব। হাতে চায়ের ট্রে। সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রাখল। একখানি প্লেটে কিছু বিস্কুট।

মামা স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন: এও কি তোমারই ব্যবস্থা নাকি?

স্বাতি লজ্জিত ভাবে বলল: না। একবার বেরিয়ে নিজেদের জিনিসপত্র সব কিনে আনতে হবে।

মামা বললেন: এখানে বুঝি কিছু দিন থাকতে হবে!

মামী চা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। বাধা দিয়ে স্বাতি নিজেই চা ঢালতে লাগল। তারপরে মামা চেয়ে আছেন দেখে বলল: যত দিন ভাল লাগে ঠিক তত দিনই। তার বেশি একটি দিনও না।

আমি বললুম: অঙ্কে মিলবে না।

কেন?

দুজন মানুষের ভাল লাগা এক রকম হয় না।

স্বাতি বলল : তাই বলে অঙ্ক মিলবে না কেন! একজনের ভাল না লাগলেই আমরা তা মেনে নেব!

বললুম : তখন যদি আর একজনের খুব ভাল লাগে ·

মামা বললেন : তখন যোগ বিয়োগ করে ভাগ দেব।

বলেই হেসে উঠলেন।

সালামা দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে স্বাতি বলল : আর কী আনবে? নিচে থেকে ফলের প্লেট একটা নিয়ে এস।

মামা বললেন : বুঝেছি। চায়ের পর আমাদের আপেল খেতে হবে। কিন্তু তারপর?

স্বাতি বলল : তারপর ওপারে। প্রথম দিন বিকেলে কী দেখতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া আছে।

তাই নাকি!

আমি বললুম : বাঁধ দেখে ঝিলমে নৌকো বিহার, তারপর সেণ্ট্রাল মার্কেট আর গভর্ণমেণ্ট আর্টস্ এম্পোরিয়াম।

চায়ে চুমুক দিয়ে মামা চটে উঠলেন। বললেন, এ কোনও প্রোগ্রামই হয় নি। কেটে ফেল তোমার বইএর পাতা।

কেন?

অন্ধকারে মানুষ নৌকো বিহার করবে! যত সব আজগুবি ব্যাপার!

কথাটা মিথ্যা নয়। এই প্রোগ্রাম অনুসরণ করতে হলে খেয়ে উঠেই বেরতে হত এবং সন্ধ্যার আগেই নামতে হত নৌকো থেকে। পাহাড়ে ওঠার কথা হলে মামা হাসতেন, কিন্তু চটলেন নৌকোর কথা শুনে। দুপুর বেলায় তাঁকে শিকারা থেকে নামতে দেখে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল যে নৌকোর নামেই তিনি চটবেন। এই টলমলে জিনিসটা তাঁর পছন্দ হয় নি।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম : এই জন্যে আমি কোন হোটেলে থাকতে চেয়েছিলুম।

মামা বললেন : বুদ্ধিমান লোকে তাই চাইবে। একে ঠাণ্ডার দেশ, তার ওপরে এই জলের ওপরে বাস! অসুখ না করলে বাঁচি।

মামী বললেন : ঠাণ্ডা কোথায়!

এখন নেই বলে কি রাতেও এই রকম থাকবে ভাবছ!

মামী বললেন : একটা রাত তো তাঁবুর নিচেই কাটানো হল। শীতের বহর দেখতে আর বাকি নেই।

স্বাতি আবার কথা কইল দুজনের মাঝখানে। বলল : আজ একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটেছে।

আমি বললুম : কী ঘটনা বল তো!

স্বাতি বলল : তোমাকে আবার কী বলব! তোমাকে নিয়েই তো ঘটনা!

তারপর মামীর দিকে তাকিয়ে বলল : ওপাশের ঐ চেরি-রাইপে—

বাধা দিয়ে মামী বললেন : চেরিরাইপ কী!

হাউস বোটের নাম।

ও মা, হাউস বোটের আবার নাম আছে নাকি!

স্বাতি হেসে বলল : আমাদের হাউসবোটের নাম ড্রীমল্যাণ্ড— স্বপ্নের দেশ।

মামীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিন্তু মামা বললেন : তারপর কী হল বল।

স্বাতি বলল : চেরিরাইপে আছেন এক মা-মেয়ে। কিছুক্ষণ আগে তাঁরা শিকারায় করে বেড়াতে বের হলেন। গোপালদাকে দেখে মেয়ের মা কী বললেন জান? বললেন, ছেলেটি বেশ।

মামী বললেন : সত্যি নাকি!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : গোপাল আমার খারাপ ছেলে নাকি!

এই পরিহাসের শেষ হল না এইখানেই। চা খেয়ে আমরা যখন বেড়াতে বার হচ্ছিলুম, ঠিক সেই সময়ে স্বাতি বলল: ঐ যে মা, ফিরছে তারা।

শিকারায় আমরা চেপে বসেছিলুম। শিকারাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল হাউসবোটের সিঁড়ির উপরে, সেই মা-মেয়ের শিকারা পাশ দিয়ে চলে গেলেই ঠেলা দিয়ে সে আমাদের শিকারায় লাফিয়ে উঠবে। এমনি সময় স্বাতির কাণ্ড দেখে আমি চমকে গেলুম। তাঁদের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল: নমস্কার।

তারাও চমকে উঠেছিলেন। স্বাতির নমস্কার গ্রহণ করবার আগে চারি দিকে চেয়ে দেখলেন। আর কাউকে দেখতে না পেয়ে দুজনেই এক সঙ্গে বললেন নমস্কার

আর কোন কথা হল না। তাঁদের শিকারা বেরিয়ে গেল আমাদের শিকারাওয়ালাও একটা ঠেলা দিয়ে শিকারার উপরে লাফিয়ে উঠল।

১৪

শিকারাওয়ালার ভারি শখ ছিল আমাদের নেহেরু পার্কে নিয়ে যাবার, সেখান থেকে ডাল লেকের মাঝখানে চারচিনার দ্বীপে। নেহেরু পার্ক নিতান্ত নিকটে, এখান থেকেই এক রকম দেখা যায়। এত কাছের জিনিস দেখে একটা বেলা নষ্ট করতে স্বাতি রাজী নয়। আর মামা রাজী হলেন না ডাল লেকের মাঝখানে যেতে। মোগল উদ্যানগুলি সবই ঐ দিকে। প্রথমে চশমাশাহী, তারপরে নিশাতবাগ ও শালিমার, সকলের শেষে হরওয়ান নামে একটা মাছ ধরার জায়গা। সে সব দেখবার সময় আর নেই। সকালে চা খেয়ে বেরতে হয় সঙ্গে দুপুরের খাবার নিয়ে। তাহলেই দেখা সম্ভব মনের মতো করে।

ডাল লেকের অন্য ধার দিয়ে গেলে আনন্দ অন্য রকমের। কমলবনেব মাঝখান দিয়ে ফ্লোটিং গার্ডেনের ধার দিয়ে জলের উপর নৌকোয় হাটবাজাব দেখতে দেখতে নাগিন লেকে যাওয়া যায়। সেখানেও চমৎকার সব হাউস বোট। যে শৌখিন লোকেরা নির্জনতা ভালবাসেন, তাঁরা পছন্দ করেন এই জায়গা। পথে হরিপর্বত ফোর্ট হজরতবল মসজিদ আর নাসিমবাগ।

ঘাটে পৌঁছে দিতে দিতে শিকারাওয়ালা আমাদের এই সব খবর দিয়ে দিল। তারপর পয়সা নিয়ে সেলাম করে বলল : কাল সকালেই আবার আসব। আমার নামটা মনে রাখবেন, সবাই আমাকে প্রেসিডেন্ট বলে।

এ সেই শিকারাওয়ালা যে আমাদের প্রথম ধরেছিল। হাউস-বোট ঠিক করে দিয়ে মালিকের কাছে সিগারেট নিয়েছিল দুটো। আড়ালে আরও কিছু নিয়েছিল কিনা জানি না। তাকে বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমরা রাস্তায় উঠলুম।

এই রাস্তারই নাম বুলেভার। পথের দক্ষিণে অনেকগুলি ভাল হোটেল আছে। ওবেরয় প্যালেসও এই পথের প্রান্তে। শ্রীনগবের সব চেয়ে ভাল হোটেল ওটি।

কিন্তু আমরা সে দিকে না গিয়ে শহবের দিকে অগ্রসর হলুম। পিছন থেকে টাঙ্গা এসে বলল: আইয়ে সাব।

স্বাতি বলল: কত ভাড়া নেবে?

যো মর্জি।

মর্জিব কথা নয়, পবে দরাদরি করতে পারব না। এক টাকা দেব, পেঁাছে দেবে বাঁধে। আমরা চারজন মানুষ।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: দেড় টাকা।

স্বাতি বলল: না।

তবে পাঁচ সিকে।

তাও না।

আচ্ছা তাহলে দু আনা বেশি দিন।

স্বাতি বলল: তবে আমরা হাঁটব।

টাঙ্গাওয়ালা সপাৎ করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল। টগবগিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

মামী বললেন: এত পথ কি আমরা হাঁটতে পারব!

মামা বললেন: চাবুকটা আমাদের পিঠেই পড়ল।

স্বাতি বলল: এদের রীতি-নীতি আমার জানা হয়ে গেছে বাবা। ও যাবে না, সামনে গিয়ে দাঁড়াবে।

সত্যিই তাই দাঁড়াল। আমরা এগিয়ে আসতেই বলল: আইয়ে।

স্বাতি হাসল সবার দিকে তাকিয়ে। তারই জয় হয়েছে। কিন্তু উঠতে হল সামনে আমার সঙ্গে। মামীর সঙ্গে মামা পিছনে বসলেন।

সোজা রাস্তা ধরে আমরা ডাল গেটে পেঁাছলুম। সামনেই চেনারবাগের খাল। এই খাল ঝিলম নদী থেকে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে

ঝিলমেই গিয়ে পড়েছে। এরই উপরে ডাল গেট। নৌকো যাতায়াতের ব্যবস্থাও এক দিন দেখেছিলুম।

আমাদের পথ বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে ঘুরে পুলের উপর দিয়ে খাল পেরতে হয়। দোকানপাট ও লোকজনে এ অঞ্চল প্রায় সারাক্ষণই মুখর থাকে। ভিতরের দিকে একটা ছোট বাজারও আছে। এ অঞ্চলের হাউস বোটে যাঁরা থাকেন, তাদের জন্যে এই বাজার।

টাঙ্গাওয়ালা সোজা রাস্তায় ছুটে গিয়ে ঝিলম নদীর তীরে পৌঁছে দিল। বলল : এই নতুন পুলের নাম বাদশাহ ব্রীজ। হেঁটে গিয়ে আমাদের বাঁধে উঠতে হবে।

টাঙ্গা থেকে আমরা নেমে পড়লুম। স্বাতি ভাড়া মিটিয়ে দিল।

বাঁধের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মামা বললেন : ওর পছন্দ মতো পয়সা দিলে আমাদেব হয় তো হাঁটতে হত না।

ঝিলম নদীর তীরে যে পথ, তারই নাম বাঁধ। পথ প্রশস্ত নয় বলে যানবাহনের চলাচল নেই। বড় বড় দোকানপাট আছে, আর পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় যাবার পথ আছে। সে সদর রাস্তা এত নিকটে যে পায়ে চলার পরিশ্রম নেই।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ঝিলমের শোভা দেখলুম। নদীর দু তীরে বাঁধা অসংখ্য হাউস বোট। ঝিলম এখানে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত, বাদশাহ ব্রীজের পরে উত্তর দিকে চলেছে। নদীর দু ধারেই শহর—অনেকগুলো পুল দিয়ে যুক্ত। বাদশাহ ব্রীজের পূর্বে একটা পুরনো পুল আমরা দেখেছি। তার নাম আমিরা কদল। কদল মানেই যে পুল, পরে তা আমরা জেনেছিলুম। শ্রীনগরের এই অংশটাই সব চেয়ে জমজমাট। হোটেল দোকানপাট ও বাজারে মানুষ কোলাহল করছে। শৌখিন দোকানপাট সব বাঁধে ও রেসিডেন্সী রোডে। রেসিডেন্সী বিল্ডিঙের ভিতর কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের আর্টস্ এম্পোরিয়াম।

সেণ্ট্রাল মার্কেট ঝিলমের অপর পারে একজিবিশন গ্রাউণ্ডে। সেও মস্ত বাজার। লোকে বলে, সেই বাজারে কোন দরাদরি নেই। সব দোকানেই এক দর।

মামীর বোধহয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। বললেন: আর কত ঘুরবে?

স্বাতি বলল: এবারে তবে সেণ্ট্রাল মার্কেটে চল।

আমার দিকে তাকিয়ে মামা বললেন: আর একটি ভুল কথা।

স্বাতি বলল: ভুল কথা কেন?

মামা বললেন: তোমার গাইড বই এই কথা বলেছে তো! প্রথম দিনেই বাজারে যাও, যা কিছু পয়সা কড়ি সঙ্গে আছে, তা খরচ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফের। বিদেশীর জন্যে সুন্দর ফাঁদ। কিন্তু আমাদের বয়েস হয়েছে তো, ও ফাঁদে আজই পা দেব ভেবেছ!

মামী বললেন: বাজারটা দেখতে আর আপত্তি কী!

বাজার দেখতে আর আপত্তি কী! আপত্তি হল জিনিস দেখতে কোন দোকানে ঢুকেছ কি ফাঁদে পা দিয়েছ!

স্বাতি বলল: তাহলে এখন কী করা যায়?

মামা বললেন: করবে আর কী, সেখানেই চল। শখ যখন হয়েছে, তখন মিটিয়েই এস।

আবার আমরা একখানা টাঙ্গা ধরে পুল পেরিয়ে ওপারে গেলুম। একজিবিশন গ্রাউণ্ডে এক বিরাট ব্যাপার। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হয়। একটা চারকোণা বাজারের নাম সেণ্ট্রাল মার্কেট। চারি দিক ঘিরে দোকান, মাঝখানে অঙ্গন। কাশ্মীরে তৈরি সমস্ত পণ্য এখানে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে তৈরি নয় এমন জিনিসও আছে। এ সমস্ত জিনিসের সঙ্গেই আমরা মোটামুটি ভাবে পরিচিত। কাশ্মীরের জিনিস এখন ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। কলকাতার চৌরঙ্গীতে আছে, নিউ মার্কেটে আছে। কাশ্মীরী ফেরিওয়ালা বাড়ি বাড়ি এসে বিক্রি করে যায়।

কাশ্মীরের সূচীশিল্প খুব পুরাতন কুটীর শিল্প। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা জৈন উল আবদিন পারস্য দেশের শিল্পী এনে এই কুটীর শিল্পের প্রবর্তন করেন।

এর চেয়ে অনেক প্রাচীন হল কাশ্মীরের শাল। মহাভারতে নাকি এই শালের উল্লেখ আছে। জুলিয়াস সীজারের দরবারেও এই শালের আদর ছিল। আফগান ও মোগল বাদশাহরা এই শাল বিদেশী রাজাদের উপহার পাঠাতেন। তিব্বত ও লাদাখের এ জাতের ভেড়ার লোম থেকে পশমি সুতো তৈরি হয়। সেই সুতো থেকে এই শাল তাঁতে বোনা। শাহ-তুস ও শাহ-তুসের শাল বলে অত্যন্ত চড়া দামে যা বিক্রি হয়, তা নাকি এক রকমের পাখির বুকের লোমে তৈরি। শালওয়ালাদের কাছেই এ সব গল্প শোনা যায়।

কাশ্মীরের আর একটি শিল্প হল কাঠের কাজ। শুধু ওয়ালনাট কাঠের আসবাব নয়, নানা রকম শৌখিন দ্রব্যও থরে থরে দোকানে সাজানো থাকে। সিগার ও গয়নার বাক্স টেবল ল্যাম্প ট্রে বুক-স্ট্যাণ্ড ও খেলনা। তার উপরে নানা ধরনের নক্সা।

কাঠের দোকানে আর এক রকমের জিনিস পাওয়া যায়। পেপিয়ার মেসির শৌখিন দ্রব্য। কাগজের মণ্ড পরতে পরতে জমিয়ে ছাঁচে ঢেলে এই জিনিসগুলি তৈরি হয়। সিগার ও পাউডারের বাক্স ফুলদানি টেবল ল্যাম্প আরও কত কী। নানা রঙের ফুল ও নক্সা করা এই জিনিসগুলি দেখে কাগজের বলে আর মনে হয় না।

কাশ্মীরের আর একটি নিজস্ব জিনিস হল কার্পেট নামদা ও গাব্বা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৈন উল আবদিন পারস্য দেশ থেকে কারিগর এনে কার্পেট তৈরি আরম্ভ করেন। প্রথম দিকে নক্সা ঠিক পার্সিয়ান কার্পেটের মতোই ছিল, এখন কাশ্মীরের নিজস্ব নক্সাও আছে। তাঁতে বোনার মতো করে এই কার্পেট বোনা হয়। নামদা ও গাব্বাও কার্পেটের মতো বিছোবার জিনিস, কিন্তু দাম অনেক কম। নামদা তৈরি হয় উল জমিয়ে, আর গাব্বা কম্বলের মতো।

এ সবের উপরেও রঙীন সুতোর নক্সা।

রেশমি শাড়ির দোকানও অনেক দেখলুম। কাশ্মীর সরকার সিল্ক তৈরি করছেন। সাদা ও ছাপা দু রকম শাড়িই এখানে বিক্রি হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের শাড়ির মতো দাম।

এতক্ষণ মামী কোন কথা বলেন নি। এইবারে বললেন: যাবার আগে খান কয়েক শাড়ি কিনতে হবে।

মামা বললেন: তবু ভাল যে আজই কিনতে চাও নি।

স্বাতি বলল: এত জিনিস থাকতে তুমি শুধু শাড়ি কিনবে?

মামী বললেন: প্রয়োজন নেই এমন জিনিস কিনে কী হবে!

মামা বললেন: কাশ্মীরে লোকে গরম কাপড়ই কেনে। শাল দোশালা—

স্বাতি বলে উঠল: সার্ট পাঞ্জাবী সুটের কাপড়ও তৈরি হয় শুনেছি।

মামী আর একটি দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। রূপোর বাসনের দোকান। চা ও কফির সেট প্লেট কুঁজো গেলাস প্রভৃতি দরকারি ও শৌখিন বাসন। নানা ধাতুর অলঙ্কারও আছে। এ সবের আকার ও আকৃতি একেবারে কাশ্মীরের নিজস্ব।

কাশ্মীরে আর একটি জিনিস হয় যা ভারতের আর কোথাও হয় না। সে জাফরাণ। জাফরাণের ক্ষেত এখানে আছে। ঘাসের মতো তার চাষ হয়। শুকনো ফুল বিক্রি হয় দোকানে। তোলা হিসেবে দাম।

আজ আমরা কিছুই কিনলুম না। দোকানের ভিতরে ঢুকেও কিছু দেখলুম না। মামা খুশী হলেন আমাদের এই বৈরাগ্য দেখে। বললেন: ভালই করেছ। দোকান তো সব মোটামুটি দেখা হল, ঘরে বসেই হয়তো কেনা যাবে।

মামী বললেন: কী করে?

যেমন করে সবাই কেনে। এ দেশের অর্ধেক লোকই তো

ফেরিওয়ালা। ট্যাঁকে কড়ি আছে টের পেলেই মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরবে।

সেন্ট্রাল মার্কেট থেকে বেরিয়ে মামা বললেন : এবারে কোথায় ?

মামী বললেন : আমি নিশ্চিন্ত আছি।

কেন ?

এখানে তো স্বাতি সংসার করছে, রাতে খাওয়াদাওয়ার ভাবনা তার।

বাজার হাট দেখতে দেখতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার কখন গভীর হয়েছিল আমরা খেয়াল করি নি। মামীর কথায় এতক্ষণে তা মনে পড়ল।

মামা বললেন : সত্যিই তো, হাউস বোটে কিছু খেতে পাওয়া যাবে তো !

স্বাতি হেসে বলল : আজ তো আমরা আহাডুতে গুস্তাবা খাব।

মামা চোখ বড় বড় করে স্বাতির দিকে তাকালেন। মামী জিজ্ঞাসা করলেন : সে আবার কী ?

স্বাতি বলল : আহাডু হল হোটেলের নাম, আর গুস্তাবা খাঁটি কাশ্মীরী খাবার। পণ্ডিত নেহেরুর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল।

মামা বললেন : কিন্তু এ সব কথা জানলে কোথায় ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : সালামার কাছে।

তারপরেই একখানা টাঙ্গা ঠিক করে উঠে বসল। আমরাও বসলুম। আহাডুতে খেয়ে আমরা হাউসবোটে ফিরব।

১৫

আমার ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে যে এত বিস্ময় সঞ্চিত ছিল, তা আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবি নি। এবারে যখন কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলুম, তখন নিশ্চিত জানতুম যে পূজার পূর্বেই আবার কলকাতায় ফিরব। মনোরঞ্জন আমাকে তার সঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়েছিল। বারাণসী যাবে, হরিদ্বারেও হয়তো যাবে। পরে তার এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলেছিল—ভৃগুর সন্ধান করবে। বারাণসীতে সাক্ষাৎ না পেলে হরিদ্বারে তার সন্ধান করবে। এর পিছনে তার আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি সন্দেহ করি নি।

পরে সবই জেনেছিলুম। মনোরঞ্জন একা যাত্রা করে নি। তার সঙ্গে মুখার্জি পরিবার ছিল অন্য গাড়িতে। এই পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল পুরীতে। সাবিত্রী তাঁদের কন্যা। তার জন্য একটি সৎপাত্র চাই। আমাকে তাঁরা নির্বাচন করেছিলেন, আর মনোরঞ্জন তাঁদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বারাণসীর গঙ্গায় নৌকোর উপরে বসে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়েছিল। আত্মরক্ষা করতে আমি সমর্থ হয়েছিলুম।

তারপর সেই ভদ্রলোকের অলৌকিক কথা। হৃষীকেশে তিনি এমন একটা কথা বললেন যে সবাইকে ফেলে আমাকে মসুরি ছুটতে হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল মিত্রা ও চাওলার সঙ্গে। তারা দিল্লী ফিরছিল, আমাকেও তারা দিল্লীতে টেনে আনল।

আমার বিধাতা যে নিজেও বাউণ্ডুলে তা আমি বিশ্বাস করি। তা না হলে আমাকে নিয়ে এই খেলা কেন! মামারা বেড়াতে বাহির হচ্ছিলেন। ঠিক যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমি এসে পৌঁছতেই তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। উত্তর-ভারতের যা বাকি ছিল, সেই পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশও দেখা হয়ে গেল। কিন্তু ভ্রমণের শেষ হল না। এলুম কাশ্মীরে।

মামা বোধহয় মামীর কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা পারলেন না। সামনে থেকে বাঘের মতো গর্জন এল : এই টাঙ্গা!

টাঙ্গাওয়ালা ডাল লেকের দিকে মোড় নিয়েই থেমে পড়ল।

সবিস্ময়ে আমরা দেখলুম যে সামনে বাঘ নয়, হালদার মশাই পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। এইবারে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললেন : নমস্কার গোঁসাইজী।

দু হাত জোড় করে মামা বললেন : নমস্কার।

হালদার মশাই হেসে বললেন : এ পথ দিয়ে যে ফিরবেন তা আমি জানতুম। সেই জন্যেই দাঁড়িয়েছিলুম এইখানে।

স্বাতি বলল : কী করে জানলেন?

উত্তরে তিনি শুধু হেঁ হেঁ করলেন।

আমি বললুম : রাতেও কি তেঁতুল কিনতে বেরিয়েছেন নাকি?

ভদ্রলোক বললেন : ঠিক ধরেছেন। এবারে তেঁতুল নয়, জোয়ান। এক মুঠো চিবিয়ে জল খেয়ে নেব। রাতের আহারটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে।

তারপরে স্বাতির দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন : কী কথা ছিল!

স্বাতি বলল : সেই কথাই তো বলছিলাম।

সত্যি নাকি!

ড্রীমল্যাণ্ডে আছি, আসবেন কাল সকালে।

মামা বললেন : আর আপত্তি না থাকলে কাল মধ্যাহ্নের আহারটা গরিবের সঙ্গেই হতে পারে।

আহ্লাদে হালদার মশাই একেবারে বিগলিত হয়ে বললেন : ছি ছি, কি যে বলেন আপনি! তা নিশ্চয়ই যাব, একবার নয় একশো বার যাব।

মামা আর একবার তাঁকে নমস্কার করে বললেন : আচ্ছা, আজ চলি তাহলে। চল টাঙ্গা।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম, আর স্বাতি আমার মুখের দিকে। মামার দিকে চেয়ে যে সে লজ্জা পেয়েছিল, আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু আমার দিকে তাকাল কৌতুকের দৃষ্টিতে। মামী কোন কথা কইতে পারলেন না। তাঁর চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে রইল।

পথ চলতে চলতে আমার মনে হল যে হালদার মশাই এখন মামারও প্রিয়পাত্র হয়েছেন। শুধু মামীকেই পারেন নি বশ করতে। মামাও সেই কথাই বললেন: লোকটাকে তুমি যত খারাপ ভাব, ঠিক ততটা নয়। মানুষের উপকারও ও করে।

মামী বললেন: তবে আর কি, ওর পায়ে ধরে খোশামদ কর।

মামা হেসে বললেন: যব্ বখত পড়ে বাঁকা, তব্ গাধেকে কহিয়ে কাকা।

স্বাতি হেসে উঠল। আর মামী বললেন: তার আগে মরণ ভাল।

মামা বললেন: মেয়েদের মরণে মুক্তি, কিন্তু পুরুষদের বাঁচতে হয় ঐ মেয়েদের মুখ চেয়ে। মরণকে তোমরাই বলতে পার শ্যাম সমান।

মামার এই সব সরস মন্তব্যে স্বাতি লজ্জা পাচ্ছিল। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলল: কাল আমরা কোথায় যাব গোপালদা?

আমি তার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম: সে ভাবনা তো আমার নয়।

তোমার পরামর্শও কি চাইতে পারি না কি!

পরামর্শের দরকার থাকলে টুরিস্ট অফিসে চল।

সেই ভাল। সকালে চা খেয়েই আমরা টুরিস্ট অফিসে যাব।

তখনও আমি নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতুম না। নিশ্চিন্ত আরামে রাত্রে নিদ্রা হয়েছিল। শীত ছিল না, তবু একখানা কম্বল গায়ে দিয়েছিলুম। মামা বলেছিলেন: নতুন জায়গায় বিশ্বাস নেই। সাবধানে থাকা উচিত।

নিজে তিনি লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন।

জলের উপরে ঘুমোবার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। যাঁরা পূর্ববঙ্গে যাতায়াত করেছেন, তাঁরা নদীর উপরে স্টিমারে রাত্রি যাপন করেছেন। সমুদ্রের উপরে জাহাজে রাত কাটিয়েছেন অনেকে। কিন্তু আমার এ অভিজ্ঞতা ছিল না। এক অপূর্ব অনুভূতিতে মন আমার আচ্ছন্ন হয়েছিল।

সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে বসে স্বাতিও এই কথাই বলেছিল: এ আমাদের একেবারে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল।

মামা বললেন: বাইরের দিকে না তাকালে বোঝা যায় না যে আমরা জলের ওপরে আছি।

মামী বললেন: একে নৌকো বলে না, এ বাড়িই।

স্বাতি বলল: এই জন্যেই একে বলে নৌকো-বাড়ি।

আমি বললুম: নৌকো-বাড়ি নয়, বাড়ি-নৌকো। হাউসবোট।

চা খেয়ে স্বাতি রান্নার তদারক করতে যাচ্ছিল। মামী বাধা দিয়ে বললেন: থাক, তোমাকে আর ও দিকে যেতে হবে না। কাল যথেষ্ট গিন্নীপনা হয়েছে।

মায়ের আপত্তির কারণ স্বাতি জানে। উনুনের কাছে যাওয়া তিনি পছন্দ করেন না। তাতে গায়ের রঙ পোড়ে। বিবাহেব আগে মেয়েদেব সতর্ক থাকতে হয়। একবাব রঙ পুড়লে সে রঙ আর ফেরানো যায় না। জোর করে কিছু করতে গেলে মামী হয়তো সকলের সামনেই কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলবেন। তাই স্বাতি উত্তর দিল: তাহলে তো ভালই হল। চল গোপালদা, এই বেলা আমরা টুরিস্ট অফিসটা ঘুরে আসি।

মামা পাইপ ধরিয়ে একেবারে বাহিরেব বেঞ্চিতে এসে বসলেন। আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। সালামা তার ডিঙ্গিতে করে আমাদের ওপারে পৌঁছে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : একটা টাঙ্গা ধরব ?

স্বাতি বলল : না, হাঁটব তোমার সঙ্গে।

কিন্তু পথ তো কম নয়।

ফুরোতে দেরি হলে দৌড়ব, কিন্তু অন্যের সাহায্য নেব না।

আমি কষ্টের কথা বলছি।

আমি আনন্দের কথা ভাবছি।

হেসে বললুম : তুমি যে সেই পুরনো কথা বলছ।

কোন্ কথা ?

কোথায় যেন একবার বলেছিলে –

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : তোমার মনের কোথায় যেন খানিকটা দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে, ফাঁক পেলেই তা বেরিয়ে পড়ে।

বললুম : ভুল হল।

সত্যকে অস্বীকার কোরো না।

আমিও তোমায় সত্যকেই সম্মান করতে বলছি।

তাহলে আমি যা বললাম, তা তুমি মিথ্যা বল ?

না।

তবে ?

বলে স্বাতি গভীর আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম : তুমি ভাবছ আমার মনের মধ্যে কোথায় একটু দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। কিন্তু আমি জানি যে মন আমার দুর্বলতায় ভরা। তা যদি তোমার মতো সারাক্ষণ চেপে থাকি তো তাই আমার মিথ্যা আচরণ হবে।

স্বাতি আমার উত্তর শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোন কথা কইল না, তারপর হেসে উঠে বলল : আজকাল তো বেশ কৌতুক করতে শিখেছ।

এবারে আমি বললুম : সত্যকে অস্বীকার কোরো না। এ যদি কৌতুক হবে, তবে বারে বারে আমি আসি কেন?

তৎপর ভাবে স্বাতি বলল : ভ্রমণের শখে। এই সুন্দর পৃথিবী ঘরের মানুষকে টানে বাইরে। নতুন পথে যে নেশা ঘনিয়ে আছে!

আর পুরনো সঙ্গীর মায়া! ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকবার নিমন্ত্রণ পেলেও কি ছুটে আসতে হবে না!

স্বাতি বলল : তোমার এই কথায় মিত্রাদির একটা গল্প মনে পড়ছে। একটা ছুটির দিনে নিজের হাতে মাংস রান্না করে মিস্টার চাওলাকে খেতে দিয়েছিলেন। মিস্টার চাওলা খুশী হয়ে বেশি খেয়ে বলেছিলেন, তোমার হাতের রান্না ভারি মিষ্টি। মিত্রাদি এই কথা শুনে কী করেছিলেন জান?

না।

কেঁদে ফেলেছিলেন।

কেন?

অসহায় ভাবে বলেছিলেন, জীবনটা যেন উলঙ্গ হয়ে গেল। ভাল লাগার কথা এমন ঢাক পিটিয়ে বলতে নেই, তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

আমি মেনে নিয়ে বললুম : খুব সত্যি কথা। চাওলা কী উত্তর দিল?

তিনিও কেঁদে বলেছিলেন, জীবনের গায়ে এত কাপড় চাপালে তার ভারে আমি পাগল হয়ে যাব।

বললুম : চাওলা কোন দিন কাঁদবে না।

মিত্রাদিও না।

তবে তারা কী করেছিল?

হেসেছিলেন প্রাণ ভরে।

তারপরে নিজেই হেসে উঠল উচ্ছল ভাবে।

এই স্বাতিকে আমি অনেক দিন অনেক জায়গায় দেখেছি॥

মায়াময় পরিবেশে মনের কাছে ঘনিয়ে এসেছে তার স্পর্শকাতর মন নিয়ে, তারপরেই হেসে উঠে সেই আবেশের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে। আজ আমি তার কাছে যেতে চেয়েছিলুম, সে আমাকে তার হাসি দিয়ে দূরে ঠেলে দিল।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছ ?

বললুম : এক জাদুকরের কথা ভাবছি।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : মস্ত জাদুকর, পৃথিবীজোড়া তার নাম। একবার এক দেশে গিয়ে শুনল যে সে দেশে এক ডাইনী বুড়ি আছে, দিনকে সে রাত করতে পারে। তার সঙ্গে ভাব করার শখ হল জাদুকরের, ডাইনী বুড়ির কাছে সেই খবর পাঠাল। বুড়ি তাকে এক সিনেমায় নিমন্ত্রণ করল, আর ব্যালকনিতে বসে দুজনের আলাপ হল। জাদুকর তটস্থ হয়ে বসে সিনেমা দেখছে, কোন্ সময় ডাইনী তাকে ভেড়া বানিয়ে দেবে এই ভয়।

ডাল গেট ছাড়িয়ে পুল পেরিয়ে আমরা টুরিস্ট অফিসের পথ ধরেছিলুম। স্বাতি সাগ্রহে প্রশ্ন করল : তারপর ?

বললুম : তারপরে বুড়ি এক সময় জাদুকরকে জিজ্ঞেস করল, ঐ যে ছবিতে তুমি যে নায়িকাকে দেখছ, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ? জাদুকর বলল, না। নেই পরিচয় ! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। বলে বুড়ি সেই নায়িকাকে ডাকল। নায়িকা অমনি ছবির পর্দা থেকে বেরিয়ে একেবারে ব্যালকনিতে এসে উপস্থিত।

স্বাতি বলে উঠল : অসম্ভব কথা।

বললুম : তার পরের কথা শোন। দুজনের পরিচয় করিয়ে দিল বুড়ি। জাদুকর হাত বাড়িয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে গিয়ে দেখল যে কেউ কোথাও নেই, আর বুড়ি তার নিজের চেয়ারে বসে মিটমিট করে হাসছে। জাদুকর লজ্জায় মাথা হেঁট করে

ঝুপ করে বসে পড়ল।

প্রথমে স্বাতি হেসে উঠেছিল। তারপরে গম্ভীর হয়ে বলল: তুমি কি আমাকে ডাইনী বুড়ি বলছ?

না না, তা কেন বলব! তবে জাত্বকরের মতো আমিও সারাক্ষণ সতর্ক থাকি। সিনেমার নায়িকাকে আমার বড় ভয়।

দূর থেকে দেখেই ভয় পেয়েছ বুঝি! কিন্তু মা কী বলেছেন জান? বলেছেন, মেয়েটি বেশ, তোমার সঙ্গে সুন্দর মানাবে।

এ মামীমাব কথা, না তোমার? কাল তো মেয়ের মায়ের কথাও শুনিয়েছিলে!

স্বাতি এ কথার উত্তর আর দিল না। টুরিস্ট রিসেপ্‌সন সেণ্টারে পৌঁছেই তরতর করে ভিতরে চলে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

পরশু রাত্রে যা ভাল করে দেখি নি, এখন তা দেখলুম। পাশাপাশি আট দশটা কাউণ্টার আছে। প্রথমে বসেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেকটর টুরিজ্‌ম্‌। তারপরে রিটায়ারিং রুম রিজার্ভেসন, হোটেল ও হাউসবোট ভাড়া ও রেসন কার্ডের কাউণ্টার। মোটর বাস কোম্পানী তিন চারটি—গভর্ণমেণ্ট ট্রান্সপোর্ট, কাশ্মীর টুরিস্ট বাস, মেল বাস ও বাধাকিষেণ আউট এজেন্সী। আউট এজেন্সীতেই রেলের খবর। আমরা সবাইকে ডিঙিয়ে শেষ কাউণ্টারে গেলুম। সেখানে গভর্ণমেণ্টের সাইট সীইং সার্ভিস।

জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক খবর সংগ্রহ করা গেল। বাসের টিকিট কেটে কাশ্মীরের সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখা যায়। মোগল গার্ডেন দেখবার তুটো সার্ভিস আছে। একটা সকাল সাড়ে আটটায় ছাড়ে, দ্বিতীয়টা দুপুর তুটোয়।

পহলগামের বাস রোজ সকাল সাড়ে আটটায় ছাড়ে। এই বাসে গেলে আচ্ছাবল ও কোকরনাগ দেখা হয় না। সে তুটো জায়গা দেখতে হলে অন্য বাসে উঠতে হয়। হপ্তায় তা তুবার চলে।

গুলমার্গের বাসসকাল সাড়ে নটায় ছাড়ে। খিলেনমার্গে উঠতে হলে এক রাত্রি গুলমার্গে থাকা উচিত। তা না হলে পরিশ্রম বেশি হয়। উলার লেক দেখতে হলে সকাল নটায় বেরতে হয়। তারপর সোনমার্গ ও যুসমার্গ। টুরিস্ট বাসে চেপে এ সব জায়গাও দেখে আসা যায়।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: আজকেই সব টিকিট কেটে নেওয়া যাক।

কিন্তু আমি বললুম: মামীমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে না!

স্বাতি বলল: এ সব জায়গা তো দেখতেই এসেছি, ব্যবস্থা করে যাওয়াই ভাল।

বললুম: এখন শুধু মোগল গার্ডেনের টিকিট কেটে ফেবা যাক। খেয়েদেয়ে বেরনো যাবে।

স্বাতি বলল: গুলমার্গ পহলগাম আর উলার লেকের টিকিট কেটে নিই। এক দিন পর এক দিন।

বলে আমার মতামতের অপেক্ষা না কবেই এক সঙ্গে সব টিকিট কেটে নিল।

যে ভদ্রলোক কাউন্টারে ছিলেন, তিনি বললেন: এ ভালই হল। আগে থেকে কেটে রাখবার জন্যে ভাল সীট পেলেন, একেবারে প্রথম দিকে। তা না হলে দূরের জায়গায় যেতে পিছনে বসলে কষ্ট হয়। বিশেষ করে উলার লেক, সে রাস্তা ৩ত ভাল নয়।

এই সঙ্গেই পবামর্শ দিলেন: বাস ছাড়বার ঘণ্টা খানেক আগে আসবেন।

বাসেব টিকিট এখানে আমাদের দেশের মতো নয়, নতুন ধবনের টিকিট, বেশ শৌখিন জিনিস। বাসগুলিও শৌখিন। ব্যবস্থাও ভাল। একজন লোকও বেশি উঠবে না, নামবেও না একজন লোক। কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াবে তা ঠিক আছে, জেনে

নিলেই হল। উলার লেকে যেতে খাবার নিয়ে বেরুতে হয়, গুলমার্গে ও পহলগামের পথে খাবার ব্যবস্থা আছে।

বেড়াবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে আমরা যখন হাউসবোটে ফিরে এলুম, হালদার মশাই তখন মামার সঙ্গে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন: আসুন আসুন, আপনার জন্যেই এতক্ষণ বসে আছি।

আমি জানি যে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় তিনি বসে নেই। আজ তিনি এখানে খাবেন, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য এসেছেন। তবু আমি ভদ্রতা করে বললুম: খুব দেরি হয়ে গেছে, তাই না!

না না, দেরি আর কী! বেরুলে এ রকম হয়েই থাকে।

স্বাতি মামাকে বলল: দুপুর একটার আগেই আমাদের বেরুতে হবে বাবা। মোগল গার্ডেনের টিকিট কিনে এনেছি।

মামা উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন: তা দুপুরে কেন, বিকেলে বেরনো যেত না?

স্বাতি বলল: বাস দুটোয় ছাড়ে বলে আমাদের একটায় পৌঁছতে বলেছে।

মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে আজ দুপুরে ব্যবস্থা না করলেই ভাল হত। কাল সকাল বেলা বেরুলে তিনি খুশী হতেন। মামীও বোধহয় তাই পছন্দ করতেন।

স্বাতিও এই কথা বুঝতে পেরে বলল: কিছু কষ্ট হবে না সন্ধ্যে হবার আগেই আমরা ফিরে আসব।

মামা আপত্তি করলেন না, বললেন: আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

বলে হালদার মশায়ের দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে বললেন: না না, আজ আর আমাকে নড়তে বলবেন না। কোমরের ব্যথা এখনও যায় নি। বুড়ো

বয়সে কি ঘোড়ায় চড়া আমার কর্ম !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আজ কোথাও বেরালেন না ?

বেরিয়েছে সবাই। কেউ ঐ পাহাড়ে উঠেছে, কেউ গেছে বাজার করতে। বউএর জন্যে শাল কিনবে, আর ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলনা।

আপনি কিছু কিনলেন না ?

সে উপায় কি আর আছে ?

কেন ?

ক গণ্ডার ব্যাপার, সে তো জানেন ! এক বাক্স আপেল নিলেও ভাগে দুটো পড়বে না। তাই ভাবছি, কিছু আখরোট নিয়ে যাব. গুণে খেতে হবে না।

মুখের পাইপ সরিয়ে মামা হেসে উঠলেন।

খেয়েদেয়ে যথাসময়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। একখানা টাঙ্গা ডেকে হালদার মশাই আমাদের তুলে দিয়ে বললেন : আমি হেঁটেই যাব। গুরুতর আহার হয়েছে। না হাঁটলে হজম হবে কেন !

আবার সেই টুরিস্ট রিসেপ্‌সন সেণ্টার। খান কয়েক বাস দাঁড়িয়ে আছে। সেই পুরনো কাউণ্টারে গিয়ে টিকিট দেখাতেই বাসের নম্বর টিকিটের উপর লিখে দিল। আমরা নিজেদের বাস চিনে নিলুম।

সহসা স্বাতি আমার গায়ে একটা চিম্‌টি কাটল। আমি চমকে উঠলুম।

অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে বলল : দেখ।

নিকটেই সেই মেয়ে ও তার মাকে দেখলুম। সেই রকমের প্রসাধন ও বেশবিন্যাস। মনে হল, আমাদের সঙ্গেই মোগল গার্ডেনে বেড়াতে যাবেন।

কিন্তু বাস ছাড়লে দেখলুম যে তাঁরা অন্য বাসে উঠেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন আমাদের।

মামীও তাঁদের দেখেছিলেন, বললেন: ওঁরাও কি একই জায়গায় যাচ্ছেন নাকি?

সকৌতুকে স্বাতি বলল: হ্যাঁ।

আমাদের বাস যখন ছাড়ল, তখনও আমি জানতুম না যে নাটকের শুরু হতে আর দেরি নেই, আর আমাকেই নামতে হবে নায়কের ভূমিকায়। কী বেদনাদায়ক এই অভিনয়, কী মর্মান্তিক! হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও মুখে তা প্রকাশ করা যাবে না। সভ্য পৃথিবীর এই নিয়ম। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই না।

১৬

যুগে যুগে যাত্রী এসেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। মহর্ষি কশ্যপ এসে এই উপত্যকাকে বাসোপযোগী করেছিলেন। তারপরে চতুর্বর্ণের হিন্দু আসত প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে। ত্রেতা যুগে ভরত শত্রুঘ্নও অযোধ্যা থেকে অবকাশ যাপনে এসেছিলেন। এ অঞ্চলের লোক দাবী করেন যে দ্বাপরে অর্জুনও এসেছিলেন। জম্মুর কাছে দুটি সুন্দর হ্রদ আছে, নাম মানসর ও সরুঁইসর। পৃথিবীর বুকে একটি তীর নিক্ষেপ করে পথ তৈরি করে অর্জুন পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি আর একটি পথ তৈরি করে পাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই দুটি জায়গাতেই এখন দুটি সরোবর হয়েছে। তারই নাম মানসর ও সরুঁইসর।

কাশ্মীরের এক ভদ্রলোক এই প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত গল্প লিখেছেন। অর্জুন পাতাল জয়ের জন্য পাতালে গিয়ে দেবতাদের বধ করতে আরম্ভ করেন। তখন নাগরাজ শেষনাগ তাঁর কন্যা উলূপীকে অর্জুনের হাতে সম্প্রদান করেন। এইখানেই গল্পের শেষ নয়। অর্জুন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর উলূপীর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তার নাম বভ্রুবাহন। এর দীর্ঘ দিন পরে পাণ্ডবরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। বভ্রুবাহন তখন পরাক্রান্ত বীর। তিনি সেই যজ্ঞের ঘোড়া আটকে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে পাণ্ডবরা সসৈন্যে নিহত হয়েছিলেন। উলূপী এই ঘটনা জানতে পেরে পুত্রকে সব কথা খুলে বলেন। তখন বভ্রুবাহন তার দৈব শক্তিতে অর্জুন ও অন্য সবাইকে পুনর্জীবিত করেন।

এই কাহিনী কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনী, মহাভারতের কাহিনী এ নয়। মহাভারতে অর্জুন বনবাস কালে গঙ্গাদ্বারে যখন বাস করছিলেন, তখন এক দিন নাগরাজকন্যা উলূপী স্নানরত অর্জুনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি ঐরাবতকুলজাত কৌরব্য নাগের

কন্যা, আমাকে আপনি ভজনা করুন। অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেন ও তাঁদের পুত্রের নাম ইরাবান। বভ্রুবাহন অর্জুন ও মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পুত্র। বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল মণিপুরে, কাশ্মীরে নয়। তবে উলূপী তখন নিকটে ছিলেন এবং নাগলোক থেকে সঞ্জীবন মণি এনে হতচেতন অর্জুনকে রক্ষা করেন। অনেকে জানেন না যে এই উলূপী বিধবা ছিলেন। গরুড়ের হাতে তাঁর পতি নিহত হয়েছিলেন। দ্বাপরের অর্জুন বিধবা বিবাহ করতে দ্বিধা করেন নি।

পর পর কয়েকখানা বাস ছেড়েছিল। আমাদের পরিচিত পথে ডাল লেকের ধার দিয়ে এই বাস মোগল উদ্যানের দিকে যাবে।

কিন্তু মোগলদের আগে আরও অনেকে এই দেশে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে অশোক ও কণিষ্কও বোধহয় এসেছিলেন। এ দেশ তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আরও কত রাজা ও রাজকুমার এসেছিলেন, আমরা তার খবর রাখি নে।

খবর রাখি বৌদ্ধ যাত্রীর। নাগার্জুন ও অশ্বঘোষ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহারাজা কণিষ্কের রাজত্ব কালে এসেছিলেন কাশ্মীরে। হরোয়ান নামে একটা জায়গায় কিছু দিন বাস করেছিলেন। আজ আমরা প্রথমেই সেখানে যাব।

তারপরে চীনা ভ্রমণকারীরা এসেছিলেন। চে-ইয়েন চে-মঙ্ ফা-হিয়েন হিউএন চাঙ সোয়ান হুই ও ও-কঙ্। থোনমি সম্ভোটা এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। তিনি শুধু তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যেরই জনক ছিলেন না, কাশ্মীরে সংস্কৃত শিখে তিনি তিব্বতী-বর্ণমালা সৃষ্টি করে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে এসেছিলেন মারপা-লোমাভা ও লোমাভা রিনচেন জংপোর বিরাট দল। এঁরাও অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন।

ডাল লেকের ধার দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলেছিল। ডান

হাতে শঙ্করাচার্য পাহাড়, আর বামে লেকের দিক থেকে শীতল বাতাস আসছিল অল্প অল্প। আরামে চোখের পাতা বুজে আসছিল। এমন সময় স্বাতি কথা কইল সামনে থেকে। বলল: গোপালদা কি ময়ে পড়লে?

বললুম: না।

তবে যে একেবারে চুপ করে আছ?

আপন মনে কথা কইলে সবাই পাগল ভাববে।

আমার উত্তর শুনে মামা হেসে উঠলেন।

স্বাতি বলল: চশমাশাহী সব চেয়ে কাছে, কিন্তু আমরা এখন সেখানে নামব না।

কেন?

হরোয়ান সব চেয়ে দূরে, সেখানেই আমরা আগে যাব।

বললুম: সেই ভাল।

এবারে স্বাতি বলল: কেন?

ঐটেই সব চেয়ে প্রাচীন জায়গা। তার নাম ছিল কুণ্ডল বন বিহার। মহারাজা কণিষ্ক সেখানে বৌদ্ধদের একটা সভা আহ্বান করেছিলেন—দি গ্রেট বুদ্ধিস্ট কাউন্সিল। বসুমিত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

স্বাতি পরম বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম: শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য নয়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতেও কাশ্মীরের খ্যাতি নিশ্চয়ই ছিল।

মামা বললেন: বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা তাহলে অস্বীকার করা যায় না!

উপায় নেই। বৌদ্ধ তীর্থ না হলে চীনা ভ্রমণকারীরা বারে বারে এখানে আসতেন না। আর—

আর কী?

আর শঙ্করাচার্য। তিনিও এই দেশে এসেছিলেন বলে সকলের

বিশ্বাস। হিন্দুধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই মহাপুরুষ ভারতের প্রায় সর্বত্র গিয়েছিলেন। তাঁর দিগ্বিজয়ে লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠার বিলোপ। এই পাহাড়ের উপর তাঁরই নামে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বৌদ্ধ প্রাধান্য না থাকলে শঙ্করাচার্য এ দেশে আসতেন না।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কাশ্মীরে এখন কোন বৌদ্ধ নিদর্শন নেই?

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন: সত্যিই তো এবারে দেশ দেখাবার ভার স্বাতির ওপরে। আমরা গোপালকে কেন জিজ্ঞেস করছি!

স্বাতিও গম্ভীর হয়ে বলল: গোপালদা তাঁর পুরাতত্ত্বের থিসিসটা দাখিল করে এসেছেন শুনেছি, সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করা। তা না হলে—

বললুম: তা না হলে এ সমস্তই তোমার গাইড বইএ আছে।

মামা আমার কথার ধরনে হেসে উঠলেন। তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: বল।

আমি স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম: শ্রীনগরের হজরতবল মসজিদে হজরত মহম্মদের পবিত্র চুল আছে জান?

স্বাতি বলল: শুনলাম এইবারে।

বললুম: কাশ্মীরে তেমনি বুদ্ধদেবের পবিত্র দাঁত ছিল।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সত্যি নাকি!

হিউএন চাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে আমরা তাই পড়েছি। ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কাশ্মীরে আসেন, তখন এখানে দুটি প্রবরসেনপুর ছিল। একটিকে পুরাতন রাজধানী, অন্যটিকে নূতন রাজধানী বলা হত। পুরাণাধিষ্ঠান মানে পুরাতন রাজধানী। কালক্রমে এই শব্দটিই বিকৃত হয়ে পাণ্ডেথান হয়েছে। বর্তমানে শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দূরে এটি একটি গ্রাম। আর হিউএন চাঙের দেখা নতুন রাজধানীই বর্তমান শ্রীনগর শহর। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে

এই নামের উল্লেখ দেখে সহজেই শ্রীনগরের বয়স অনুমান করা যায়। তেরো শো বছরের কম তো নয়। অনেকে বলেন যে খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শো বছর আগে সম্রাট অশোক কাশ্মীরে রাজধানী স্থাপন করেন শ্রীনগরীতে। গোনর্দ বংশেও একজন অশোক আছেন, তিনি আরও প্রাচীন রাজা।

মামা বললেন : বুঝেছি। এই হিসেবে শ্রীনগর শহরের বয়েস দু হাজার দু শো বছরেরও বেশি হল।

স্বাতি বলল : বুদ্ধদেবের দাঁতের কী হল ?

বললুম : হিউএন চাঙ লিখেছেন যে প্রাচীন রাজধানীর নিকটে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। সেই স্তূপে ছিল বুদ্ধের পবিত্র দন্ত।

এখন নেই ?

না। যত দিন ঐ দাঁত ছিল কাশ্মীরে, তত দিন তার মাহাত্ম্য দিকে দিকে ধ্বনিত হত। নানা দেশ থেকে বৌদ্ধরা আসত এই তীর্থে। হিউএন চাঙও এসে সব দেখে শুনে ফিরে গেছেন। বারো বছর পর তিনি যখন পাঞ্জাবে অবস্থান করছেন, তখন শুনলেন যে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন কাশ্মীর আক্রমণ করে স্তূপ থেকে সেই দন্ত নিয়ে চলে গেছেন।

কেন ?

পরাক্রান্ত রাজার এই রীতি। প্রথম জীবনে হর্ষবর্ধন শৈব ছিলেন, কিন্তু সকল ধর্মেই তাঁর ভক্তি ছিল। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সেই সময়েই তিনি এই কাজ করেন। হিউএন চাঙের তিনি বন্ধু ছিলেন এবং তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য কান্যকুব্জে তিনি যে সভা আহ্বান করেন, ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সভায় কুড়িজন করদ রাজা চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তিন হাজার জৈন ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়েছিলেন। এক হাজার ফুট উঁচু একটি মন্দির নির্মাণ করে তার মধ্যে প্রমাণ মাপের একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন। এক মাস

ধরে প্রতি দিন প্রভাতে একটি শোভাযাত্রা বার হত। একটি সোনার বুদ্ধমূর্তির মাথায় রাজা নিজে ছত্র ধরতেন, তাঁর বেশ হত দেবরাজ ইন্দ্রের মতো। সোনা রূপো ও মণি মুক্তো ছড়াতে ছড়াতে তাঁরা অগ্রসর হতেন। মন্দিরে পৌঁছে সুগন্ধি জলে বুদ্ধের স্নান করিয়ে পুজো করতেন। তারপর ভোজ হত। ভোজের পরে ধর্মসভা।

তারপর ?

তারপর সেই হত্যার চেষ্টা।

ইতিহাসের কথা মামা ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন : কে কাকে হত্যার চেষ্টা করল ?

বললুম : শেষ দিন মন্দিরে আগুন লাগল। সেই গোলমালের মধ্যে একজন আততায়ী মহারাজ হর্ষবর্ধনকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর অনুরাগ দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

তারপর ?

তারপর তিনি হিউএন চাঙকে সঙ্গে করে প্রয়াগে এলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে একটি উৎসব করতেন। সন্তোষক্ষেত্র নামে একটি দানক্ষেত্রে তিনি সকল ধর্মের মানুষকে অকুণ্ঠ হাতে দান করতেন। তিন মাস ধরে নিজের সব কিছু দান করে রাজা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছে একখানি কাপড় ভিক্ষা নিয়ে তিনি বুদ্ধের উপাসনায় নিরত হলেন।

স্বাতি বলল : এ যে ধান ভানতে শিবের গীত হল। হিউএন চাঙ কাশ্মীরে এসে কী করলেন তাই বল।

বললুম : হিউএন চাঙ কাশ্মীরে এসেছিলেন পশ্চিম দিক থেকে। সেখানে পাথরের এক সিংহদ্বার ছিল। রাজার মাতুল এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। তিনি রাত্রিবাস করেছিলেন যে মঠে তার নাম হু-সে-কিয়া-লো। এইটিই প্রাচীন হুস্কর বা হুস্কপুর। রাজা

হুষ্কের হুষ্কপুর স্থাপনের প্রসঙ্গ আমরা রাজতরঙ্গিণীতে পেয়েছি। আবু রিহান এই স্থানকেই উস্কর বলেছেন। বেহাৎ নদীর তীরে উস্কর শহর যে কালক্রমে বরাহ মূল বা বারমূলা হয়েছে, তাও তিনি বলেছেন।

মামা বোধহয় বুদ্ধের দাঁতের কথা ভাবছিলেন। বললেন: কনৌজ থেকে হর্ষবর্ধন এসে বুদ্ধের দাঁত কেড়ে নিয়ে গেলেন, কাশ্মীরের কোন লোক তাঁকে বাধা দিল না?

মহারাজ হর্ষবর্ধনকে সে যুগে কে বাধা দেবে! কাশ্মীরে তখন হিন্দু রাজা দুর্লভ। হর্ষবর্ধনকে তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। বোধহয় ভেবেছিলেন যে এতে তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব হবে নির্বিবাদে।

এবারে আমি স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলুম: কাশ্মীর সম্বন্ধে হিউএন চাঙ কী বলেছেন জান?

জানি নে।

বলেছেন, এ দেশে প্রচুর শস্য ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। জলবায়ু শীতল অথচ শুষ্ক। বাতাস কম, বরফ বেশি। সর্বদাই বরফ দেখতে পাওয়া যায়। আর মানুষ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার সবটুকু নিশ্চয় সত্য নয়।

কী বলেছেন?

কাশ্মীরের অধিবাসীরা দেখতে সুশ্রী শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী, কিন্তু চঞ্চল ও দুর্বল চিত্ত। আর—

আর কী?

বাসে কেউ আমাদের কথা শুনছেন না দেখে বললুম: বড়ই ধূর্ত।

মামা হেসে উঠে বললেন: নিশ্চয়ই তাঁকে কেউ ঠকিয়েছিল।

একে একে সব মোগল উদ্যান আমরা পেরিয়ে গিয়েছিলুম। এবারে হরোয়ানের পথ। সেখানে পৌঁছতে আর বোধহয় দেরি ছিল

না। তার আগেই আমি বললুম: হিউএন চাঙ যখন কাশ্মীরে. হজরত মুহম্মদ তখন মারা যান। সে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। কি করে তাঁর পবিত্র চুল কাশ্মীরে এল, ইতিহাসে সে ঘটনাও আছে।

কিন্তু সে ঘটনা বলবার আর সময় হল না। আরও দুখানা বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আমাদেরও বাস এসে সেখানে দাঁড়াল। সকলের সঙ্গে আমরাও তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম।

যাত্রীদের অনুসরণ করে আমরা একটা সরোবরের ধারে পৌঁছলুম। পাহাড়ে ঘেরা একটি সুন্দর সরোবর। এই পাহাড়কে নাকি মহাদেব পর্বতশ্রেণী বলে, আর এই সরোবর থেকেই শ্রীনগরের জল সরবরাহ হয়। শ্রীনগর এখান থেকে এগার মাইল দূরে।

পথের উপর দাঁড়িয়ে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলুম। অনেকে ক্যামেরা বার করে ছবি নিলেন, তারপর বাসে ফিরে এলেন। বাস এখানে কতক্ষণ দাঁড়াবে আমরা জেনে নিই নি, তাই আমরাও ফিরে এলুম।

যাঁরা দেরিতে এলেন, তাঁদের মুখে ট্রাউট হ্যাচারির কথা শুনলুম। কাশ্মীর সরকার এখানে ট্রাউট মাছের চাষের ব্যবস্থা করেছেন। ছোট বড় নানা বয়সের মাছ তাঁরা দেখে এলেন।

বাস প্রায় আধ ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যা সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল, তা দেখা আমাদের হল না। এখানে যে মাটি খুঁড়ে পুরাতত্ত্বের অনেক নিদর্শন বার করা হয়েছে, তা পরে বই পড়ে জেনেছিলুম। বইএ বিশদ ভাবে কিছু লেখে নি, কাজেই কাশ্মীরের একটি প্রাচীন অধ্যায় আমাদের অজানা রয়ে গেল।

মহারাজা কণিষ্কের আমলে এই অঞ্চলে একটি বিরাট বৌদ্ধ ধর্মসভা হয়েছিল। ডক্টর কাও নামে কাশ্মীরের একজন ঐতিহাসিক একটি নিবন্ধে এই কথা লিখেছেন। ইনি কণিষ্কের রাজত্ব কাল বলেছেন ১২০ থেকে ১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। আমি যত দূর জানি, কণিষ্কের কাল এখনও সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নি। সাধারণ ভাবে মনে করা

হয় যে ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা হন এবং এই দিনটি চিরস্মরণীয় করবার জন্য বর্তমান শকাব্দের প্রচলন করেন।

আরও একটি কথা ইতিহাসে পড়েছিলুম। মহারাজা কণিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে এঁর নাম চন্দন কণিক। জলন্ধরে তাঁর জন্ম, রাজা ছিলেন গান্ধারের। নিজ ভুজবলে তাঁর সাম্রাজ্য মধ্য এসিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তার করেন। চীন জয় করে কয়েকজন চীনা রাজকুমারকেও নিজের রাজ্যে এনে রেখেছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে যখন অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। কণিষ্কের ইচ্ছা ছিল যে রাজগৃহে এই সভার অধিবেশন হবে। কিন্তু আর্যপার্শ্বিক প্রভৃতি অর্হতেরা আপত্তি করে বলেছিলেন, রাজগৃহে এখন নানা মতাবলম্বী বিধর্মীর বাস, সেখানে অধিবেশন হতে পারে না। রাজা বললেন, তবে কোথায় হবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'গিরিমেখলা বেষ্টিত যক্ষরাজ রক্ষিত সিদ্ধর্ষি সেবিত' কাশ্মীরই উপযুক্ত স্থান। তারপরে এ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল।

কাশ্মীর তখন কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেছেন কণিষ্কপুরে, বর্তমান শ্রীনগর থেকে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে পীর পঞ্জাল গিরিশ্রেণীর উপরে। এই কণিষ্কপুরেই সেই মহাসভার অধিবেশন হয়েছিল কি না, আমাদের ঐতিহাসিকেরা তা বিচার করে দেখবেন।

কণিষ্ক যে কাশ্মীরে বাস করেছিলেন, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। রাজতরঙ্গিণীতে কণিষ্কের উল্লেখ আছে, কণিষ্কপুর প্রতিষ্ঠার কথাও আছে। নানা স্থান থেকে তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ ও অর্হৎদের কাশ্মীরে ডেকে এনেছিলেন। নানা দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁর সভায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র কণিষ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে সবাই মিলে তাঁকে মহাসভার সভাপতি নির্বাচন করেন।

মহারাজা কণিষ্কের সভায় পণ্ডিতের অভাব ছিল না। শুধু বসুমিত্র নন, প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনও তাঁর সভায় ছিলেন, আর ছিলেন ভারত-বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চরক। সে যুগের আর একজন অদ্বিতীয় রত্ন অশ্বঘোষও কণিষ্কের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। অশ্বঘোষ কবি সঙ্গীতজ্ঞ দার্শনিক, সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মহাসভায় তিনি সহ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। পৃথিবীতে কণিষ্কই প্রথম রাজা যিনি একজন সাহিত্যিককে এই সম্মান দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে পৃথিবীর আর কোন দেশে সাহিত্য রচিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

বাল্মীকি ও বেদব্যাস পৌরাণিক কবি, অশ্বঘোষের পরিচয় আছে ইতিহাসে। চীনা ও তিব্বতী রচনা থেকে আমরা তাঁর অনেক কথা জানতে পারি। সাকেত বা অযোধ্যায় তাঁর জন্ম। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হয়েছিলেন। মহাযান সম্প্রদায়ের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে পরিচিত। তিনি গীতিকার ছিলেন, সঙ্গীতজ্ঞ বলে তাঁর সুনাম ছিল। গণ্ডীস্তোত্রগাথা তাঁর গীতিকাব্য। বুদ্ধ-চরিত মহাকাব্য তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ভাষা ছন্দ ও উপমায় অপরূপ। সৌন্দরানন্দ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, শারিপুত্র প্রকরণ একখানি নাটক। বজ্রসূচী সূত্রালঙ্কার ও মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ তাঁর সমাজতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের গ্রন্থ।

মহাকবি কালিদাস জন্মেছেন অশ্বঘোষের কয়েক শত বৎসর পরে।

১৭

স্বাতি পিছন ফিরে বলল : গোপালদা কি আবার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

বললুম : এ প্রশ্ন তোমার পুরনো হয়ে গেছে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখলেই তুমি এই প্রশ্ন কর।

মামা বললেন : তুমি যে কিছু ভাবছ, তা আমরা বুঝতে পারি। আর ঐ ভাবনাটা জোরে জোরে ভাবতে বলি।

আমি আমার পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইলুম না। হরোয়ানে মাটি খুঁড়ে যা বার করা হয়েছে তা না দেখাই রয়ে গেল। সে সম্বন্ধে কিছু জানতুম না বলে আপসোস করি নি। হরোয়ান শ্রীনগর থেকে উত্তরে, কণিষ্কপুর দক্ষিণে, তার বর্তমান নাম নাকি কামপুর। এ দুটি জায়গা অভিন্ন, এ কথা বলার মতো কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই। এ কথা জেনে নেবার মানুষ যখন জানা নেই, তখন এ নিয়ে আর আলোচনাও করি নি। ফেরার পথে আমরা মোগল উদ্যানগুলি দেখব। সে কথা মনে পড়তেই বললুম : মোগল-বাদশাহদের কথা ভাবছি।

স্বাতি বলল : তুমি যে এই রকমের কিছু ভাবছ, আমরাও তাই ভেবেছিলাম।

মামা বললেন : আর আমরা যে তোমার কথাই ভাবছিলুম, তুমিও হয়তো তাই ভেবেছিলে।

বলে হাসতে লাগলেন।

স্বাতি বলল : এ রাজ্যে প্রথম এসেছিলেন জাহাঙ্গীর, তাই না ?

বললুম : জাহাঙ্গীর তাঁর বাবা আকবরের সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন। কাশ্মীরের মুসলমান রাজাদের মধ্যে যখন গৃহবিবাদ, সেই সময় একজন আকবর বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। আকবরের তখনি এখানে আসবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা

তিনি অনেক দিন দমন করেছিলেন। তারপর যখন তিনি কাশ্মীর জয় করলেন, তখন তিনি লাহোরে ছিলেন। বছর দুই পরে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সপরিবারে কাশ্মীরে এলেন।

স্বাতি বলল: একটা বাগিচা নিশ্চয়ই তৈরি করে গেছেন?

বললুম: সে কথা তোমার বইএ পড়েছি। আমরা এই ডাল লেকের যে পারের দিকে চলছি, তার অপর পারে একটি সুন্দর বাগান আছে, তার নাম নাসিম বাগ। নাসিম মানে সকালের বাতাস। এই বাগানে জলের ফোয়ারা আর ফুলের গাছ নেই, আছে বড় বড় চেনার গাছ। লোকে এই ছায়াঘন সুন্দর বাগানে দাঁড়িয়ে ডাল লেকের শোভা দেখে, আর সকালের বাতাস করে উপভোগ।

তারপর?

আকবর আরও দুবার কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেদিনের কাশ্মীরবাসী এই নাসিম বাগের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয় নি, দিয়েছে অন্য কারণে। ম্লেচ্ছ রাজ্য থেকে ব্রাহ্মণেরা দেশান্তরে চলে যাচ্ছে শুনে তিনি ব্রাহ্মণদের নিকট কর আদায় বন্ধ করেন। ঘোষণা করেন যে কেউ ব্রাহ্মণের কাছে কর আদায় করলে তিনি তার ঘর ভেঙে দেবেন, আর তাঁদের পূজো করলে তিনি দেবেন পুরস্কার। রামদাস নামে বাদশাহর এক কর্মচারী ব্রাহ্মণদের সোনা রূপো দান করে উপকার করতেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: কোন্ পথে আকবর কাশ্মীরে এসেছিলেন?

কঠিন প্রশ্ন।

আমাকে ভাবতে দেখে স্বাতি বলে উঠল: না জানলে বানিয়ে বল।

হঠাৎ আমার তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীর কথা মনে পড়ল। তাতে এই পথের বর্ণনা আছে। বললুম: তার দরকার হবে না জাহাঙ্গীর বাদশাহ সে গল্প লিখে রেখে গেছেন।

মামা বললেন: সত্যি নাকি!

বললুম ঃ প্রথমবার আকবর এসেছিলেন ঝিলমের উপত্যকা ধরে। কিন্তু ভিমবের ও পাথলি হয়ে এলে পথ সংক্ষিপ্ত হয় বলে আকবর সেই পথ তৈরি করবার হুকুম দেন। তাঁর চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন মুহম্মদ কাসিম খান। তিনিই মোগলদের আসবার জন্য ভাল পথ তৈরি করেন।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে বললুম ঃ জাহাঙ্গীরের লেখার ইংরেজী অনুবাদ আছে মেময়ার্স। সেখানা পড়ে দেখো। পথের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে, আছে সরাই ও উদ্যান রচনার কথা। কাশ্মীরকে জাহাঙ্গীর যেমন ভালবেসেছিলেন, ভারতবর্ষের আর কোন সম্রাট এমন ভালবাসেন নি। তাঁর রাজত্ব কাল মাত্র বাইশ বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি আটবার কাশ্মীরে এসেছিলেন।

স্বাতি বলল ঃ এ আর এমন বেশি কী!

বেশি নয়। ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল আগ্রায়। বাদশাহ কখনও আগ্রা, কখনও দিল্লী, কখনও বা লাহোর কিংবা কাবুলে থাকতেন। তখন পাঠানকোট পর্যন্ত রেলগাড়ি ছিল না, মোটর বাসও ছিল না পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর। পায়ে হেঁটে পাল্কীতে ঘোড়ায় ও হাতীতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হত। তারপর যুদ্ধবিগ্রহ বিদ্রোহ এ সব তো লেগে থাকত। তবু তিনি কাশ্মীরে আসতেন। গভীর ভাবে ভাল না বাসলে কি আর বারে বারে আসতেন!

মামা সংক্ষেপে বললেন ঃ সত্যি কথা।

বললুম ঃ জাহাঙ্গীর কাঙ্গড়া উপত্যকাতেও গিয়েছিলেন। আকবর কাশ্মীর জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু কাঙ্গড়া জয় করতে পারেন নি। এ কাজ পেরেছিলেন জাহাঙ্গীর।

বাস এসে সদর রাস্তার উপরে দাঁড়াল। আমাদের আগে যে বাস ছেড়েছিল, তারাও এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা কেউ ভিতরে

গেছে, কেউ যাচ্ছে, আবার কেউ ডাল লেকের দিকে বেড়াতে গেছে। আমিও সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। শিকারায় করে যারা মোগল উদ্যান দেখতে আসে, আমি তাদের ঘাট দেখে এলুম। দূরে নয়, নিকটেই সেই ঘাট।

মামা মামী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি ফিরে আসতেই স্বাতি বলল : এ কোন্ জায়গায় এলাম বলতে পার ?

বললুম : কোন মোগল গার্ডেনে।

সে কথা আমরাও জানি। তার বেশি কিছু জানবার চেষ্টা করেছ ?

জানবার দায়িত্ব যার, সেই জানা'ব বলে নিশ্চিন্ত আছি।

তবে সেই আনন্দেই থাক। আমি অনেকক্ষণ আগে আমার দায়িত্ব পালন করেছি।

বাগানের দরজার দিকে এগোতে এগোতে মামা বললেন : তোমাদের তরোয়ালের খেলা দেখতে বেশ লাগে।

বলুন, শুনতে বেশ লাগে।

স্বাতি বলল : দেখতেও মন্দ লাগে না। বাস থেকে নেমে সবাই বাগানে ঢোকবার জন্যে অপেক্ষা করছি—

কথাটা স্বাতি শেষ করতে পারল না। বাগানের ভিতরে পৌঁছে আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। এ বাগান কোন মৃত মোগল বাদশাহর বাগান নয়, এ বাগান তার সজীব সৌন্দর্য নিয়ে আজও সকলের মনোহরণ করছে। পিছনে পর্বত, তার পাদদেশ থেকে ফুলের বাগান ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। অজস্র ফোয়ারা, ঝরণার মতো জল নামছে পাথরের গা বেয়ে, দুধারে ফুলের সমারোহ। পায়ে চলার পথ পাথর দিয়ে বাঁধানো। সেই পথে আমরা এগিয়ে চললুম।

তর্কের কথা স্বাতি ভুলে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল : এই বাগানের নাম শালিমার।

আমি বললুম : শুধু শালিমার, না শালিমার বাগ ?

স্বাতি বলল : শালিমার মানে জানলে এ প্রশ্ন করতে না।

মামা বললেন : সত্যি নাকি!

মামা আমাদের কথা শুনতে পেয়েছেন জেনে স্বাতি লজ্জা পেল, তাই উত্তর দিল ইংরেজীতে : শালিমার মানে অ্যাবোড অফ লাভ।

প্রেমের আবাস। প্রেম কথাটা স্বাতি সহজে বলতে পারে না, তার মুখে বাধে। হৃদয়ের গোপনতম স্থানে লুকিয়ে রাখবার ধন প্রেম, বাহিরের আলোতে তাকে টেনে আনতে প্রেমিকের অপরিসীম দ্বিধা। হৃদয়ে যত দিন প্রেম থাকে লুকিয়ে, তত দিনই লজ্জা। একবার প্রকাশ হয়ে পড়লেই আচরণ সহজ হয়ে যায়। স্বাতি তার লজ্জা লুকোবার চেষ্টাতেই আবার বলল : জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই উদ্যান রচনা করেছিলেন নূরজাহান বেগমের জন্যে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল : কত সালে বল না গোপালদা!

বললুম : ১৬১৯ সালে।

স্বাতি থমকে দাঁড়িয়ে বলল : এ নিশ্চয়ই আন্দাজে বললে। ইতিহাসে এ সব কথা লেখা থাকে না।

হেসে বললুম : তোমার বইএ লেখা আছে। শ্রীনগর থেকে ন মাইল দূরে ডাল লেকের উত্তর-পূর্ব কোণে এই বাগান। লম্বায় প্রায় বারো শো হাত, আর পাঁচ শো হাত চওড়া। দশ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে চারি দিক ঘেরা।

মামা এই দেওয়াল দেখবার জন্য চারি ধারে তাকালেন। বড় বড় চেনার গাছের আড়ালে দেওয়াল। না বলে দিলে দৃষ্টি সে দিকে যায় না।

কথায় কথায় আমরা বাগানের মাঝখানে এসে পৌঁছে গেলুম। এই জায়গাটিই সব চেয়ে সুন্দর। একটি কালো মার্বেল পাথরের বাড়ি, দুপাশে ঘর, আর মাঝখানে খোলা। কয়েকটি কালো পাথরের মসৃণ থামের উপর চার চালার মতো রঙীন ছাদ। জলের ধারা যেন নদীর মতো বইছে। আমরা এই জলস্রোতের পাশের বাঁধানো পথ

দিয়ে এগিয়ে বড় চেনার গাছটার নিচে পেঁাছে থমকে দাঁড়ালুম। ওধার থেকে যাঁরা আসছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা স্বাতিকে বললেন: নমস্কার।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সেই মা ও মেয়ে। শিকারায় চেপে আমাদের হাউসবোটের সামনে দিয়ে যেতে আমরা দেখেছি। তাঁরা বাগানের শেষ পর্যন্ত দেখে এখন ফিরছেন।

স্বাতি সোল্লাসে বলে উঠল: নমস্কার।

মামী দু হাত জুড়ে নমস্কার করে মেয়ের মাকে বললেন: আপনারাও বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি!

বলে কাউকে যেন খুঁজতে লাগলেন। আমার মনে হল, তিনি এই মহিলাদের সঙ্গে কোন পুরুষ আছেন কিনা তাই দেখছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা কইলেন না।

মহিলা প্রতিনমস্কার করে বললেন: এ দেশে ঘরে বসে থাকা কঠিন।

মেয়ে আমার দিকে একবার চেয়ে দেখে বলে উঠল: ঘরে বসে থাকব কোন্ দুঃখে! বসে থাকবার জন্যে তো বাড়ির বাইরে বেরই নি।

মামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: সত্যিই তো।

তারপরে পরিচয় হল। মিসেস চৌধুরী ও তাঁর কন্যা শম্পা কলকাতা থেকে উড়োজাহাজে করে এসেছে। মিস্টার চৌধুরী আসতে পারেন নি, তাঁর বিজনেসের চাপ এখন বেশি। কিসের ব্যবসা তা তাঁরা বললেন না। মামার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন: মিস্টার চৌধুরীকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন?

মামা চেনেন না বলতে পারলেন না, বললেন: হ্যাঁ, তা—

মিসেস চৌধুরী বললেন: চিনবেন বৈকি, কলকাতায় সবাই তাঁকে চেনেন।

তারপরই মামীর দিকে চেয়ে বললেন: আপনার ছেলেমেয়ে?

মামী কোন উত্তর দেবার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই

মিসেস চৌধুরী বললেন: সন্ধ্যেবেলায় আসুন না আমাদের বোটে আমরা আপনাদের পাশেই আছি, চেরিরাইপে।

শম্পা আমার মুখের দিকে তাকাল সকৌতুকে। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামী কী জবাব দেবেন বুঝতে না পেরে মামার দিকে তাকালেন। মামা বললেন: বেশ তো, আবার দেখা হবে।

বলে এগিয়ে গেলেন।

আবার আমরা নমস্কার বিনিময় করলুম।

চার ধাপে এই বাগান সম্পূর্ণ হয়েছে, শেষ ধাপ একেবারে পাহাড়ের কোলে। মামা মামী শেষ পর্যন্ত গেলেন না, আমি গেলুম স্বাতির সঙ্গে। ফেরার পথে সে জিজ্ঞাসা করল: শম্পাকে কেমন দেখলে?

বললুম: নূরজাহানের মতো।

স্বাতি এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল: কিছু বুঝতে পারলাম না।

বললুম: ভয় নেই, আমি সেলিম নই। সেলিম হলে বুঝিয়ে বলার দরকার ছিল।

স্বাতি আমাকে নিষ্কৃতি দিল না, বলল: নাই বা হলে, শাহজাদা, তাকে নূরজাহান কেন বললে বুঝিয়ে বল।

নূরজাহান বেগমের বাগানে দাঁড়িয়ে তাঁরই কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ইতিহাস পড়ে সবাই জেনেছে যে সেলিম পাগল হয়েছিলেন নূরজাহানের জন্যে, কিন্তু নূরজাহান কী করেছিলেন তা জানতে হলে ডাও সাহেবের হিন্দোস্তান পড়তে হবে।

স্বাতি বলল: ভূমিকা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে গল্পটা বল।

বললুম: আকবর বাদশাহর ছেলে মুহম্মদ নূর-উদ্দীন, শেখ সেলিম চিস্তির ভবনে জন্ম বলে আর এক নাম সেলিম। আর বাদশাহর কর্মচারী পারস্য দেশের গায়স বেগের কন্যা মেহের উন্নিসা। দুজনের

দেখা হল গায়স বেগের বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণে। উৎসব শেষে সবাই চলে যাবার পরে মেহের উন্নিসা এলেন সেলিমের সামনে সুরাপাত্র হাতে। বাদশাহী নিয়ম ছিল তাই। মেহেরের রূপ-লাবণ্যে সেলিম মুগ্ধ হলেন। ভুলে গেলেন যে নিজের প্রাসাদে তাঁর দুই স্ত্রী বর্তমান—এক মহলে যোধাবাঈ, অন্য মহলে বিকানীর রাজকন্যা। বুদ্ধিমতী মেহের উন্নিসা শাহজাদার হাতে সুরাপাত্র দিয়েই চলে যান নি, তাঁকে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, আর নেচেছিলেন অপরূপ ভঙ্গিতে। তারপর—

তারপর কী?

মামা মামীর কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলুম, তাই সংক্ষেপে বললুম: একটি কটাক্ষ। সেই কটাক্ষেই সেলিম কাবু হলেন।

আকবর এই সংবাদ পেয়ে মেহের উন্নিসার বিবাহ দেওয়ালেন আলিকুলি বেগের সঙ্গে। এঁরই নাম শের আফগান। সেলিম বাদশাহ হয়ে শের আফগানকে হত্যা করিয়ে মেহের উন্নিসাকে নিজের হারেমে এনেছিলেন। নিজে নাম নিয়েছিলেন জাহান্‌গীর, মানে জগৎজয়ী আর মেহের উন্নিসার নাম প্রথমে রেখেছিলেন নূর মহল, মানে অন্তঃপুরের আলো। পরে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছিলেন নূর-জাহান, মানে জগতের আলো।

আমার কথার ওপরে স্বাতি শুধু একটি প্রশ্ন করবার সুযোগ পেয়েছিল, বলল: নূরজাহানের কটাক্ষের কথা তোমার কেন মনে পড়ছে?

এ কথার উত্তর দেবার আগেই আমি মামার প্রশ্ন শুনলুম: বাস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে তো?

স্বাতি বলল: নিশ্চয়ই করবে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল: তারপর নূরজাহানের কী হল বল।

ফেরার জন্য আমরা তখন পা বাড়িয়েছি। বললুম: জাহাঙ্গীর

যখন নূরজাহানকে প্রথম দেখেন, তখন তাঁদের বয়স সাতাশ ও উনিশ। যখন তাঁদের বিয়ে হল, তখন তাঁদের বিয়াল্লিশ ও চৌত্রিশ বছর বয়স। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে নূরজাহানই জাহাঙ্গীরের নামে রাজ্য শাসন করেছেন। এই বাগান জাহাঙ্গীর নূরজাহানের জন্য তৈরি করেছেন, না নূরজাহান জাহাঙ্গীরের জন্যে, তা কেউ বলতে পারে না। কেন না নূরজাহানও কম শৌখিন ছিলেন না। গোলাপ থেকে আতর তৈরি করেছিলেন ইৎর-ই-জাহাঙ্গীরী, পেশোয়াজের জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র দুদামী আর ওড়নার জন্য পাঁচতোলিয়া, রেশমী ও জরির বাদলা ও ফরাস-ই-চন্দনী নামের কার্পেট—এ সব জিনিসও তাঁর নিজের আবিষ্কার।

স্বাতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: বিয়ের সময় জাহাঙ্গীর তাঁকে কী দিয়েছিলেন জান?

মামা বললেন: শের আফগানের মাথা নয় তো?

বললুম: না। বিধবা মেহের উন্নিসাকে তিনি পাঁচ ছ বছর হারেমে রেখেছিলেন। বিয়ে করেন নি, এমন কি দেখা সাক্ষাৎও করতেন না। মেহের উন্নিসাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অনেক কৌশল করেছিলেন।

স্বাতি বলল: বিয়েয় কী দিয়েছিলেন তাই বল।

বললুম: জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথায় সে কথা লিখে রেখে গেছেন। দেন মোহর মানে যৌতুক দিয়েছিলেন আশি লক্ষ আশরফি আর এক ছড়া মুক্তোর কণ্ঠী। তার মানে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ সিক্কা টাকা আর ষোল লক্ষ সিক্কা টাকার কণ্ঠী। তাতে চল্লিশটি মুক্তো ছিল, এক একটি মুক্তোর দাম চল্লিশ হাজার সিক্কা টাকা।

বাসে উঠে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: সিক্কা টাকার মানে কি?

আমি সংক্ষেপে বললুম: বাদশাহী টাকা।

বাস তখন ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা পুরনো পথ ধরে হরোয়ান থেকে শ্রীনগরে ফিরছি। দু মাইলে শালিমার দেখলুম। তারপর

আরও দেড় মাইল পেরিয়ে নিশাত বাগ। নিশাত বাগ মানে প্রমোদ উদ্যান। এটি নূরজাহানের ভাই আসফ শাহর তৈরি। আসফ শাহর সঠিক নামটি আমার জানা নেই। কেউ শাহ্ বলেন, কেউ ঝা, কেউ আবার খান বলেন। শাহ ও খান মুসলমানের পদবী, কিন্তু ঝা ব্রাহ্মণের। তবু আসফ ঝা নাম আমি বইএ দেখেছি। ইনি শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

নিশাত বাগে পৌঁছে দেখলুম যে এই উদ্যানটি শালিমারের চেয়েও বড়। লম্বায় প্রায় সমান, বড় চওড়ায়। ডাল লেকের ধার থেকে স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। শালিমারের মতো চারটি নয়, দশটি ধাপ। বাগানের মাঝখান দিয়ে যে জলের ধারা বইছে, তা এই দশ জায়গায় ঝরণার মতো ঝরছে। এই বাগানে এক তলার বদলে দোতলা বাড়ি, কিন্তু শালিমারের মতো মনোরম নয়। এই বাগানটিও একটি তের ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

শম্পা ও তার মায়ের সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হল। আবার কথা হল খানিকক্ষণ। এখানে এই রকমই হয়। এই পথে বেরলে বারে বারে দেখা হয়, আলাপ হয়, ঘনিষ্ঠতাও হয়। নির্বিকার থাকা এখানে বেশ কঠিন।

এর পরে আমরা চশমাশাহী এলুম। চশমাশাহী মানে রাজকীয় ঝরণা। শ্রীনগর শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল। ডাল লেক থেকে খানিকটা দূরে। শিকারায় এলে নিশাত বাগ ও শালিমার দেখতে হাঁটতে হয় না। এখানে সে সুবিধা নেই। তবে পথ এমন বেশি নয় যে হাঁটতে কারও কষ্ট হবে।

এই বাগানটি শাহজাহানের তৈরি। পাহাড়ের গায়ে একটি ঘরের ভিতর ঝরণা আছে। তার জল উপকারী বলে যাত্রীরা অঞ্জলি ভরে এই জল পান করে। বাগানটি ছোট, তিনটি ধাপেই শেষ। আমরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে উঠে গিয়ে ঝরণার জল খেলুম।

লক্ষ্য যে আমাকে লক্ষ্য করছিল, তা জানতে পারলুম তার কথা শুনে। আমি জল খেয়ে মুখ তুলতেই বলল : ছি ছি, এই জল আপনি খেলেন!

বললুম : না, কেন তাতে দোষ কী হয়েছে! তার বদলে নিজের দোষটা মেনে নিয়ে বললুম : বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল।

সঙ্গে খাবার জল আনেন নি আপনারা?

না।

তবে আমাকে বললেন না কেন?

হেসে বললুম : এবার থেকে বলব।

খানিকটা তফাৎ থেকে স্বাতি আমাকে দেখছিল। আমাকে তাকাতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাসে বসে মামা বললেন : তাহলে শাহজাহান পর্যন্ত কাশ্মীরে এসেছিলেন!

আমি বললুম : ঔরঙ্গজেবের কথাও পড়েছি ফরাসী চিকিৎসক বার্নিয়ারের লেখায়। কাশ্মীরে ঔরঙ্গজেব কত দিন ছিলেন, তা জানি নে। তবে এসেছিলেন ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগের বছর ডিসেম্বরের ছ তারিখ যাত্রা করেছিলেন। একটা মারাত্মক কেলেঙ্কারী না হলে বার্নিয়ার হয়তো এ কাহিনী লিখতেন না।

মামা কৌতূহলী হয়ে বললেন : ঔরঙ্গজেব তো শুনেছি ভারি কড়া লোক ছিলেন!

কড়া লোক ছিলেন বলেই তো কেলেঙ্কারী হয়েছিল।

এবারে স্বাতিও সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : তাঁরা যাচ্ছিলেন গুজরাট ভিমবেরের পথে শম্বুক গতিতে।

শম্বুক গতিতে কেন?

তাহলে লোকজনের কথা বলতে হয়। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর রাজধানী চলেছিল। আমীর ওমরাহ সভাসদ পার্ষদ সৈন্য সামন্ত কুলি মজুর ঘোড়া খচ্চর এমন কি হাতির পিঠে বাদশাহর গোটা হারেম

পর্যন্ত। বার্নিয়ার সাহেব শুধু কুলির একটা হিসাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, লিখেছেন ত্রিশ হাজার, এক বাদশাহর জিনিসই বইছিল ছ হাজার কুলি।

মামা তাঁর চোখ কপালে তুলে বললেন : সর্বনাশ!

তাহলেই বুঝুন যে এই বাহিনীর গতি শম্বুকের মতো না হয়ে কী হবে! পাহাড়ে সৈন্য সামন্ত পাহারা দিচ্ছে, সমতলভূমি ও উপত্যকা দুদিকেই নজর রেখেছে তারা। এমনি সময় একটা একটা করে পনরটা হাতী খাদে গড়িয়ে পড়ল। শুধু হাতী তো নয়, হাতীর উপরে ছিল বাদশাহী হারেমের সুন্দরীরা। হাওদায় বসে পরম নিশ্চিন্তে জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছিলেন, সহসা কী হল বোঝা গেল না, পর পর পনরটা হাতী পড়ে গেল।

মামা আর একবার বললেন : সর্বনাশ।

বললুম : তারপর বিপদ দেখুন। কথাটা বাদশাহর কানেও পৌঁছল। তিনি হুকুম দিলেন, থাম। যে যেখানে যেমন অবস্থায় ছিল, সব দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বাদশাহ সৈন্যদের হুকুম দিলেন, খোঁজ। অমনি খোঁজ খোঁজ রব উঠল, কোথায় পড়েছে হাতী, কোথায় কাঁদছে সুন্দরীরা। কিন্তু কে তাদের খুঁজে পাবে! দিন গেল, একটা রাতও গেল। এই পাহাড়ের উপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতে সবাই জমে গেল, কিন্তু উদ্ধার কিছুই করা গেল না।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এ কি সত্যি ঘটনা?

বললুম : বার্নিয়ার সাহেব তো সত্যি বলেই লিখে গেছেন।

কথায় কথায় পাঁচ মাইল পথ আমরা অতিক্রম করে এলুম। নেহরু পার্কের সামনে আমাদের বাস থামল। দু একজন নামছিলেন। এর পরে বাস সোজা গিয়ে টুরিস্ট রিসেপ্‌সন সেণ্টারে ঢুকবে। স্বাতি বলল : এস, আমরাও এখানে নেমে পড়ি।

দিনের আলো তখন নিবে এসেছিল, অন্ধকার হতে আর দেরি নেই। আমরাও নেমে পড়লুম।

১৮

পরদিন সকালে চা খেয়ে আমরা হাউসবোটের ছাদের উপরে উঠলুম। মামা উঠতে রাজী হলেন না, বললেন: আজ যখন ছুটি, তখন ছুটিটা উপভোগ করতে দাও।

মামী বললেন: কেন, ছাদে উঠলে কি তোমার ছুটি নষ্ট হবে?

মামা তাঁর পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন: বেশ তো বসে আছি, আবার ওঠাউঠি কেন!

তাই বল।

বলে মামী রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি আর স্বাতি উঠলুম ছাদে।

লেকের জল এখানে স্থির হয়ে আছে। নীল জল। তার উপরে সামনের পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। মাঝে মাঝে কাঁপছে সেই ছায়া, শিকারার ক্ষুদে দাঁড়ে স্থির জলে আঘাতের দোলায়।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বাতি বসে বলল: আজ আমাদের এমনি করেই কাটাতে হবে।

আমিও বসে উত্তর দিলুম: কাল তো গুলমার্গ! ঘোড়ায় চড়তে হবে। আজকের এই বিশ্রাম তাই মন্দ লাগবে না।

পারবে ঘোড়ায় চড়তে?

ঝাঁসির রাণীর সঙ্গে যেতে হলে পারতেই হবে।

সর্বনাশ! তুমি কি আমাকেও ঘোড়ায় চড়াবে নাকি!

তা না হলে কি মামীর মতো মানুষের কাঁধে চাপবে!

কেন, হেঁটে উঠতে পারব না?

শাস্ত্রে বলেছে, যত্র দেশে যদাচারঃ। এ দেশে কেউ হাঁটে না।

হয় ঘোড়ায় চড়ে, নয় ডুলিতে। এতে আপত্তি থাকলে ডাল লেকে ভেসে বেড়াও।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে সে একখানা শিকারাকে লক্ষ্য করছে। শিকারাটা ঝিলম নদীর দিক থেকে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলুম : অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ ?

স্বাতি বলল : একটা বাইনকুলার থাকলে ভাল হত।

কেন ?

দূরের মানুষকে তাহলে সহজে চেনা যেত।

শিকারায় আমি দুজন মানুষ দেখলুম, ঘনিষ্ঠ ভাবে পাশাপাশি বসে আছে। একজন পুরুষ, আর একজন মহিলা। পুরুষটি যেন চেনা চেনা।

স্বাতি প্রশ্ন করল : আমাদের গণেশবাবু না ?

গণেশবাবুই তো।

স্বাতি লক্ষ্য করে বলল : সঙ্গে সেই বিদেশী মহিলা।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললুম : হুঁ।

দীর্ঘ শ্বাস ফেললে কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি ?

কটাক্ষে আমি স্বাতির দিকে তাকিয়ে বললুম : গণেশবাবু কি আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান ?

তবে ?

শ্রীনগরে প্রথম রাতের কথা মনে পড়ছে। তুমি লক্ষ্য করেছিলে কিনা জানি নে, আমি করেছিলুম।

কোনও মনে রাখবার মতো কথা ?

না।

তবে এখন মনে পড়ছে কেন ?

ওদের দেখে। গণেশবাবু আমাদের আগে হাউসবোটের খবর নিয়েছিলেন। তাঁর ভাড়া পছন্দ হয় নি বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন,

দালালেরা তাঁকে আটকেছিল। তাদের কথাবার্তা কিছু কানে এসেছিল, কিন্তু নিজেদের জন্যে ব্যস্ত ছিলুম বলে সেদিন তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

গণেশবাবুর শিকারা এবারে আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোককে এবারে পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। গদির উপরে গা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক প্রায় শুয়েছিলেন, আর বিদেশী মহিলাটি বসেছিলেন পাশে। তাঁর গায়ের রঙ আজ তত ফর্সা দেখাচ্ছে না। কিংবা সিগারেটের হাল্কা ধোঁয়ায় কিছু মলিন দেখাচ্ছে। মহিলাটি সিগারেট খাচ্ছিলেন। মনে হল, একটা হাল্কা গানের সুর ঐ শিকারার দিক থেকে ভেসে আসছে।

স্বাতি বলল : থামলে কেন ?

বললুম : ওদের দেখছি।

তা আমিও দেখতে পাচ্ছি। সেদিন কী শুনেছিলে তাই বল।

সেদিন দরাদরির কথা শুনেছিলুম। একজন দালাল কিংবা হাউসবোটের মালিক গণেশবাবুকে লোভ দেখিয়েছিল, বলেছিল, পুরো বোট না নিয়ে একখানা ঘর নিলে সস্তা হবে। গণেশবাবু বলেছিলেন, পাশের ঘরে কোন পল্টন থাকবে না তো ! সেই দালাল হেসে বলেছিল, না, সঙ্গী আপনার ভাল লাগবে। গণেশবাবু বোধ হয় সেই সঙ্গীর লোভেই তার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

স্বাতি নীরবে শিকারাটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল, তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : বেশ জীবন !

বেশ জীবনই বটে।

স্বাতি বলল : কাশ্মীর বড় দরিদ্র দেশ বলে শুনেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে অন্য রকম দেখছি।

আমি বললুম : কাশ্মীর তো আমরা দেখি নি, আমরা যে শ্রীনগর দেখছি তার নাম ভূস্বর্গ। বিদেশী যাত্রীদের মন ভুলিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা দেখছি সর্বত্র। আমরাও এখানে বিদেশী, আমাদেরও এরা

ভোলাতে চায়। দেখছ না গণেশবাবুর অবস্থা।

স্বাতি বলল: উনি তো এই জন্যেই এসেছেন।

গণেশবাবুর শিকারা তখনও অদৃশ্য হয়ে যায় নি। আমি সেই দিকেই চেয়েছিলুম। তারপরে দেখলুম সেই দৃশ্য। তখনই বুঝতে পারলুম যে স্বাতি গণেশবাবুর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি. ফেলেছে অন্য দৃশ্য দেখে। খানিকটা তফাতে একটা সুদৃশ্য হাউস-বোটের পিছনে একটি কাশ্মীরী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করছেন। দুজনের চেহারা ও বেশবাসের পার্থক্য দেখে আত্মীয় বলে মনে করতে কষ্ট হয়। বললুম: ও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

অসহায় স্বাতি বলল: কোন্ দিকে তাকাব?

হেসে বললুম: আমার দিকে।

সহসা স্বাতির কী মনে হল জানি নে, উচ্ছল ভাবে হেসে উঠল বলল: শম্পা তাহলে রাগ করবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: মা তোমাকে কিছু বলেন নি বুঝি?

না।

হালদার মশাই?

তিনি তো অনেক কথাই বলেছেন।

অনেক কথা নয়, শম্পার কথা।

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললুম: আজ তোমার কথা বড় হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। কিছু বলার থাকলে সরল ভাবে বল।

স্বাতি বলল: শম্পার সঙ্গে মা তোমার বিয়ে দিচ্ছেন।

সত্যি নাকি!

বলে আমি পরম উৎসাহে হেসে উঠলুম।

স্বাতি বলল: আমি কি ঠাট্টা করছি ভাবলে! তাহলে নিতান্ত ভুল করবে। কাল সকাল বেলায় হালদার মশাই যখন শিকারায়.

চেপে আমাদের কাছে আসছিলেন, তখন শম্পাদের দেখতে পেয়েছিলেন চেরিরাইপের বারান্দায়। শিকারা থামিয়ে দুদণ্ড গল্প করে এসেছিলেন। তোমার গল্প। আর শম্পার গল্প করেছিলেন বাবা মার কাছে।

তুমি এ গল্প কার কাছে শুনলে ?

আমার সামনেই তো এ গল্প হল। তুমি তখন লাদাখীদের নাচ দেখতে গিয়েছিলে নিশাত বাগের এক কোনায়। নাচ শিখে নিয়েছ তো! এইবারে নাচতে হবে।

বলে হাসতে লাগল।

আমিও হেসে বললুম : এখন কি নাচছি না?

এ আর কি নাচ! এবারে নাকে দড়ি পড়বে, আর ডুগডুগি বাজবে নাচের সময়। তালে তাল ফেলতে পারবে তো!

পারব না কেন, এত দিন তোমার কাছে তালিম কী নিলুম!

স্বাতি বলল : তুমি তামাশা ভাবছ! কিন্তু মোটেই তা ভেব না। মা খুব সীরিয়াস। কাল রাতে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। দিনে দিনে তোমার হ্যাংলামি বাড়ছে কিনা, তাইতেই সাবধান হওয়া দরকার।

তাঁদের মেয়ের সম্বন্ধে কী বললেন ?

আমার সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিন্ত, আর কিছু ভাববার দরকার নেই।

বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

পায়ে ধুলো লাগবে বলে পৃথিবীটাকেই চামড়া দিয়ে মোড়া দরকার।

মানে ?

নিজের মেয়েকে যখন সামলানো যাবে না, তখন পৃথিবীর সব পুরুষগুলোকেই সামলাতে হবে। সত্যিই, মামীমার বুদ্ধির তারিফ করতে ইচ্ছা করছে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল: আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন?

ডাল লেকের জলে ভারি সুন্দর পদ্ম ফুটেছে, আর একটা রামছাগল জলের ওপরে হেঁটে হেঁটে সেই পদ্ম খাচ্ছে, তার পায়ের খুরে পদ্মের সবুজ পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললুম: ওটা নিশ্চয়ই তোমাদের পোষা রামছাগল, তা না হলে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারত না। অন্যের ছাগল হলে জলের কাছেই যেত না।

আর পদ্ম যে খাবার জিনিস নয়, তাও বুঝত।

ভুল হল। ছাগল বলেই খেয়েছে, ভেড়া হলে খেত না। এ যুগের বাজারে ভেড়ার দামই বেশি। এবারে যাতে ভেড়ার স্বপ্ন দেখতে পার, তার জন্যে চেষ্টা কর।

আমাদের হাউসবোটের পাশের জল ছলছল করছিল, আর ছোট ছোট তরঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। স্বাতি সেই দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল: দেখবে এস।

আমি উঠে তার দিকে চলে এলুম। নিচে তাকিয়ে দেখলুম দুটি পাতি হাঁস। পদ্মপাতার মাঝখানে তারা খেলা করছে। তারই শব্দ, তারই তরঙ্গ। মুখে আমার কথা এল না।

কাশ্মীরে এসে ঘরে বসে থাকবার উপায় নেই। একজনের পরে আর একজন ফেরিওয়ালা আসবে নানা পণ্যের শিকারা বেয়ে। বাহিরে বসে থাকলে শিকারা থামিয়ে প্রশ্ন করবে, পণ্য দ্রব্যের বর্ণনা দিয়ে প্রলুব্ধ করবে, সুযোগ পেলেই উঠে পড়বে হাউসবোটে। ভিতরে লুকিয়ে থেকেও রক্ষা নেই। দু একজন জানালা দিয়ে উঁকি দেবে, একটু আস্কারা পেলেই ঢুকে পড়বে ঘরের ভিতর। হাউস-বোটের ছাদের উপরেও আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি নি। রামখেলাওন এসে খবর দিল : প্রেসিডেণ্ট এসেছে।

স্বাতি বলল : কেন?

কখন বেরবেন জানতে চাইছে।

বাবা কী বললেন?

আপনার কাছে জানতে পাঠালেন।

স্বাতি বলল : কী আপদ বল। নিশ্চিন্তে একটু যে বসে থাকব, তার উপায় নেই।

বলে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কী চাই?

প্রেসিডেণ্ট আমাদের শিকারাওয়ালার নাম। সবিনয়ে বলল : আপনাদের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।

স্বাতি বলল : আমরা কি কোথাও বেরব নাকি?

প্রেসিডেণ্ট বলল : ঘরে বসে থাকবেন কেন! আসুন, আপনাদের নাগিন লেকে ঘুরিয়ে আনি।

স্বাতি বলল : আজ নয়।

তবে ঝিলম দেখতে চলুন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাতেই বললুম : বেশ তো বসে আছি!

প্রেসিডেন্ট বলল : তবে ও বেলা আসব, খাওয়া-দাওয়ার পর ঝিলম দেখাতে নিয়ে যাব। একটা একটা করে সাতটা কদল আপনাদের দেখিয়ে দেব।

সমস্যার একটা সমাধান হয়েছে ভেবে রামখেলাওন ফিরে গেল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার উঠে এসে বলল : মা আপনাদের ডাকছেন।

স্বাতি বলল : আমাকে?

দুজনকেই।

কেন, আবার কোন্ প্রেসিডেন্ট এল!

রামখেলাওন বলল : দুজন এঁসেছেন।

স্বাতি বলল : নিশ্চয়ই হালদার মশাই এসেছেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে।

বলতে বলতেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল।

আমিও তাকে অনুসরণ করে নিচে নামলুম। তারপরে বসবার ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। হালদার মশাই নন, দেখলুম শম্পা ও তার মাকে। মামা ও মামীর সঙ্গে তাঁরা গল্প করছেন। কখন তাঁরা এসেছেন, ছাদের উপরে বসে আমরা তা জানতে পারি নি। তবে কথার ধরনে মনে হল যে তাঁরা তখনি এসেছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে মিসেস চৌধুরী কলরব করে বললেন : বড় অসময়ে এসে পড়েছি বুঝি!

আমি তাঁদের নমস্কার জানালুম নীরবে। স্বাতি বলল : সারাক্ষণই তো এখানে বেড়াবার সময়।

মিসেস চৌধুরী বললেন : তাইতেই ভাবলুম, ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়ি। তা না হলে হয়তো কোথাও বেরিয়ে পড়বেন, দেখাই হবে না।

বেলা তখন অনেক হয়েছিল। তাই এই ভোর বেলার উল্লেখে আমি আশ্চর্য হলুম।

শম্পা চারি দিকে চেয়ে দেখছিল, হঠাৎ বলে উঠল : এমন বাজে জায়গায় উঠেছেন কেন ?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

মিসেস চৌধুরী একবার তাঁর মেয়ের মুখের দিকে, আর একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন : মানে এর চেয়ে ভাল হাউসবোট তো আছে—

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : এখানে খারাপ কী দেখলেন ?

শম্পা বলল : ভালই বা কী দেখছি !

ততক্ষণে মামা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন, বললেন : পয়সা থাকলে ভাল জায়গাতেই উঠতুম।

মামার উত্তর শুনে মামী আশ্চর্য হলেন, আর স্বাতি বল্ল সত্যি কথাটা। মামা চটে গেছেন, চেষ্টা করে রাগ সংযত করছেন।

মিসেস চৌধুরীও কিছু সন্দেহ করে বললেন : যাক সে কথা। আজ কোথাও বেরচ্ছেন কিনা তাই বলুন।

স্বাতি বলল : এখনও ঠিক করি নি।

তবে ভালই হল। আজ আর আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি না।

কোথায় নিয়ে যাবেন ?

চেরিরাইপে। আজ দুপুরে আপনারা আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খাবেন।

মামা বিহ্বল ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। মামীও তাকালেন আমার দিকে। আমি একবার শম্পার দিকে তাকিয়ে দেখলুম। তার পরে উত্তর দিলুম নিমন্ত্রণের। বললুম : তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এক দিন খেলেই তো হল।

মিসেস চৌধুরী বললেন : এক দিন কেন, আজই আসুন না।

বলে মামার মুখের দিকে তাকালেন।

এবারে মামী বললেন : আমরা তো বাইরে কোথাও—

বলেই থেমে গেলেন। খাই নে কথাটা বোধহয় মুখে আটকে

গেল। গত দু রাতই আমরা হোটেলে খেয়েছি।

চোখ কপালে তুলে শম্পা বলল: এ যুগেও আপনারা এমন সেকেলে আছেন! আশ্চর্য!

স্বাতি হেসে বলল: আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। সেকালকে আমরা শ্রদ্ধা করি বলেই সেকেলে থাকবার চেষ্টা করি।

স্বাতির কথা শুনে শম্পা যেন শিহরে উঠল। বলল: হাউ ফানি! আমরা কি ভূত যে পেছনে হাঁটব!

সহসা মামী এই তর্কের মীমাংসা করে দিয়ে বললেন: গোপাল যাও না স্বাতিকে নিয়ে!

মিসেস চৌধুরী অত্যন্ত তৎপর ভাবে বললেন: সেই ভাল। আপনাদের যদি আপত্তি থাকে তবে ছেলেমেয়েই আসুক।

স্বাতি হয়তো আপত্তি করত, কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বললুম: সেই ভাল।

স্বাতি বিস্মিত হল আমার কথায়, কিন্তু কিছু বলল না।

মিসেস চৌধুরী বেশিক্ষণ বসলেন না। সময় মতো আমাদের যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফিরে গেলেন।

মামী বললেন: মেয়েটি দেখতে বেশ।

মামা বললেন: কথাবার্তাও ভাল।

আমার বিরাগ মামী বুঝতে পেরেছিলেন, তাই এই মন্তব্য মানলেন না, বললেন: এত তাড়াতাড়ি মানুষের বিচার কোরো না।

যথাসময়ে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম। সালামা তার নিরাভরণ শিকারায় আমাদের পৌঁছে দিয়ে এল।

যাবার পথে স্বাতি বলল: মিত্রাদির কথা আমার মনে পড়ছে।

আমি বললুম: আমার আরও একটি কথা মনে পড়ছে।

কী?

সন্দেহ নেই। আর এই পরিবেশে মিসেস চৌধুরীকে চমৎকার মানিয়েছে। তাঁর সাজ দেখে শম্পার মা বলে মনে হচ্ছে না, শম্পা বলেও কারও ভুল হতে পারে।

তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে স্বাতির দিকে তাকিয়ে আমিও চমকে উঠলুম। এই পরিবেশে তাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। সাদাসিধে সুতোর শাড়ি পরেছে একখানা, নিরাভরণ দেহ, রঙের প্রলেপ নেই কোনখানে। আমি নিজের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখলুম। আমাব খদ্দরেব জামাকাপড় আরও উৎকট দেখাচ্ছে। আমাদের দেখে চমকে ওঠা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

স্বাতি বলল ঃ মিস চৌধুরী বুঝি বেড়াতে গেছেন ?

মিসেস চৌধুরী মিহি সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন। পাখার হাওয়ায় সেই শাড়ির আচল খসে পড়েছিল। সেখানা বুকের উপর তুলে বললেন ঃ ঠিক বেড়াতে নয়। ওর এক বন্ধু এসেছে, তারই সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

বলে তাঁর সিগারেট শেষ করে অ্যাস ট্রেতে গুঁজে রাখলেন।

শম্পা একা এল না, এল তার সেই বন্ধুর সঙ্গে। একেবারে নিখুঁত সাহেবী পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক। বয়স আমার চেয়ে বেশি, কিন্তু আচরণ চঞ্চল। প্রথমেই হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস চৌধুরীর দিকে, তারপরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। স্বাতি তার হাত গুটিয়ে নিয়ে দু হাত জুড়ে নমস্কার করল। ইনি মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলেত থেকে টেক্সটাইল পড়ে এসে একটা বড় চটকলে চাকরি করছেন।

মিসেস চৌধুরী আমাদের পরিচয় দিলেন। আমি বললুম ঃ মিস্টার গোস্বামী নয়, আমাকে গোপাল বলবেন।

আর আমাকে স্বাতি।

বলে স্বাতি হাসল। আমি এই হাসির অর্থ বুঝি। ওঁরা

আমাদের ভাই বোন মনে করেছেন, আর স্বাতি তা বুঝতে পেরেছে।

মিসেস চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন: মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় কেমন আছেন?

শম্পা তাড়াতাড়ি বলল: ও কথা জিজ্ঞেস করে বন্দ্যোকে তুমি দুঃখ দিও না মা।

দুঃখ পাবেন কেন?

সে মহিলার তো মাথা খারাপ!

মিসেস চৌধুরী বিস্ফারিত চোখে বললেন: মাথা খারাপ!

বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রকমে বললেন: এক রকম তাই! তিনি তাঁর ঠাকুরঘর আঁকড়েই ভব নদী পার হয়ে যাবেন বলে ভাবছেন।

স্বাতি বলল: পূজোআর্চা বুঝি ভালবাসেন?

বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন: আগে তাই ভাবতুম, এখন দেখছি ও ভালবাসা নয়, একেবারে পাগলামি। দিনে দিনেই বেড়ে যাচ্ছে।

বুঝেছি।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চুরট ধরালেন, তারপর বসে বসেই বললেন: এবারে উঠি তাহলে।

শম্পা চেঁচিয়ে উঠল: ও নো বন্দ্যো, হউ আর নট সো আন্‌কাইণ্ড। তুমি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে।

নিতান্ত কাতর স্বরে বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন: আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম শম্পা।

শম্পা বলল: তা আমি জানি, কিন্তু খাবার সময় এমন করে চলে যেও না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মিসেস চৌধুরীর দিকে চেয়ে ঘন ভাবে চুরট টানতে লাগলেন। এখন আর তাঁর কোন চঞ্চলতা নেই, একেবারে নিরুদ্বেগে বসে রইলেন।

শম্পা উঠে গিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বলল: অ্যাপাটিফ্।

অল্পক্ষণ পরেই সেই অ্যাপাটিফ্ এল, ছোট ছোট গেলাসে ক্ষুধাবর্ধনকারী রঙীন পানীয়। আমার কাছে যখন ট্রে এল, আমি বললুম : খাই নে।

স্বাতি বলল : আমিও না।

মিসেস চৌধুরী বললেন : সে কি, এ একেবারে খাঁটি জিনিস, বাড়িতে তৈরি। কলকাতা থেকে সঙ্গে এনেছি।

আমি বললুম : আমাদের ক্ষিধে বেশি বলেই খাই নে।

বলেন কি, আপনার এমনিতেই ক্ষিধে পায়!

শুধু আমার নয়, দেশের সমস্ত গরিবেরই আমার মতো অবস্থা। ক্ষিধেয় যারা চেঁচায়, তাদের আমরা চোখে চোখে রাখি। সরকারও ভয় পায় তাদের।

বন্দ্যোপাধ্যায় হেসে বললেন : ভারি মজার কথা বলছেন!

বলে পাত্রটা নিঃশেষ করে আবার হাত বাড়ালেন।

খেতে যাবার আগে মিসেস চৌধুরী একখানা নতুন টেপ লাগিয়ে গেলেন। এটিও বিদেশী বাজনা। বন্দ্যোপাধ্যায় চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ শুনলেন, তারপর বললেন : ব্লু ড্যানিয়ুব।

মিসেস চৌধুরী গদগদ ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন : ভিয়েনায় আমরা টেপ করেছি।

স্বাতি সরাসরি খেতে না বসে শম্পাকে বলল : হাতটা ধুয়ে আসি।

আমি বললুম : আমিও।

খেতে বসবার আগে হাত ধোবার প্রয়োজন শম্পা বুঝল না। মিসেস চৌধুরী আমাদের বাথরুমটা দেখিয়ে দিলেন। আমরা একে একে হাত ধুয়ে এলুম।

টেবিলে বসে স্বাতি ছুরি কাঁটা চামচে সরিয়ে রেখে বলল : আমাকে মাপ করবেন, আমি এ সব দিয়ে খেতে পারি নে।

এ কথা সত্য নয়। কাঁটা চামচে দিয়ে তাকে আমি সহজ

ভাবে খেতে দেখেছি। ট্রেনের কামরায় সে সাধারণত হাত দিয়ে খায় না। বলে, বাড়ির বাইরে কাঁটা চামচেই ভাল। তার আজকের এই ব্যবহারের কারণও আমি বুঝি। এ একটা প্রতিবাদ। বিদ্রোহ করবার জন্যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। মামী বলেছিলেন, আজ এ কী সাজ হল! সংক্ষেপে সে বলেছিল, এই ভাল।

স্বাতির সঙ্গে আমিও হাত দিয়ে খেলুম। সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। চীনারা কাঠি দিয়ে ভাত খায় শুনে আমরা যে রকম আশ্চর্য হই, আমাদের হাত দিয়ে খেতে দেখে তাঁরও বোধহয় তেমনি মনে হল। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বো-টা নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। পরে দেখেছিলুম যে সেটা তাঁর মুদ্রা-দোষ। কোন কিছু দেখে বা শুনে আশ্চর্য হলেই তিনি তাই করেন, আর ব্যস্ত হলে টানেন বো ধরে।

মিসেস চৌধুরী এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন: আজ বিকেলে আপনারা কী করবেন?

স্বাতি বলল: ঠিক নেই।

চলুন না কোথাও বেড়াতে যাই।

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি জানি, এই গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা মামা পছন্দ করবেন না। তাই বললুম: আজ বোধহয় আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে।

কেন?

কাল পরিশ্রম আছে।

কাল বুঝি দূরে কোথাও যাচ্ছেন?

এইবারে বুঝতে পারলুম যে ভুল করে ফেলেছি। কোথায় যাচ্ছি জানতে পারলে হয়তো সঙ্গী হতে চাইবেন। স্বাতিও এই কথা বুঝল। তাই ইচ্ছে করেই বলল: কাল আমরা গুলমার্গে যাচ্ছি।

সত্যি নাকি!

বলে মিসেস চৌধুরী শম্পার দিকে তাকালেন।

শম্পা বলল : তুমি কি করবে বন্দ্যো ?

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোধহয় আমাদের সঙ্গে একত্রে যাবার ইচ্ছা ছিল না। তাই উত্তর দিতে দেরি করছিলেন। ইতিমধ্যে মিসেস চৌধুরী বললেন : চল না, আমরাও গুলমার্গে যাই।

কথাটা বলেছিলেন শম্পাকে, কিন্তু উত্তর দিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন : বেশ তো, এখান থেকে ফেরার পথে আমি তিনখানা টিকিট কেটে নেব।

মিসেস চৌধুরী এই প্রস্তাব পছন্দ করলেন না। বললেন : আপনি কেন কষ্ট করবেন, বিকেলবেলা আমরাই কেটে নেব।

আমার আর কষ্ট কী ! আমি তো ঐখানেই আছি।

এই কথার সূত্র ধরে জানতে পারলুম যে ভদ্রলোক কাল রাতে শ্রীনগরে এসে পৌঁছেছেন। ট্রেনেই এসেছেন। এইবারে একটা হাউসবোটে এসে উঠবেন। কিন্তু শম্পার আগ্রহ দেখেও মিসেস চৌধুরী এই প্রসঙ্গটা সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন।

খেয়েদেয়ে আমরা শম্পাদের শিকারায় উঠলুম। বন্দ্যোপাধ্যায় তখন চুরট ধরিয়ে শম্পার সঙ্গে গল্প করতে বসেছেন। মিসেস চৌধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

একটুখানি পথ। ছুটো কথা বলতে না বলতেই পথ ফুরিয়ে যায়। আমি ফিসফিস করে বললুম : ভদ্রমহিলার কোনও মতলব আছে মনে হচ্ছে।

স্বাতি হেসে বলল : তুমিও ঐ বন্দ্যোর মতো কথা বলছ।

কী রকম ?

সেও তোমার মতো ফিসফিস করে শম্পাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার মায়ের মতলবটা কী বল তো ! এদের এমন খাতির করছেন কেন ?

শম্পা কী উত্তর দিল ?

ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে বলেছিল, চুপ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : তুমি নিজের কানে এই কথা শুনলে ?

স্বাতি তেমনি হেসে বলল : তোমাকে দেখেই চুপ করতে বলেছিল।

কিন্তু আমাদের খবর এঁদের কে দিল ?

হালদার মশাই।

কে বললে তোমাকে ?

স্বাতি নির্লিপ্ত ভাবে বলল : কাল তিনি নিজেই তো এ কথা বলে গেলেন। আমাদের কাছে যখন খেতে আসছিলেন, তখন দেখা হয়েছিল এঁদের সঙ্গে। বসবার ঘরে শম্পা বিলিতি বাজনার সঙ্গে নাচছিল, সেই নাচ দেখেই তিনি চিনেছিলেন। তারপর শিকারা থামিয়ে মিস্টার চৌধুরীর খোঁজ নিয়ে আমাদের খবর দিয়ে এসেছিলেন। আমাদের মানে তোমার খবর।

বলে স্বাতি হাসতে লাগল। তার এই কৌতুকে ভরা মিষ্টি হাসি দেখে রাগ হয় যত, ভাল লাগে তার চেয়ে বেশি। বললুম : আমাকে নিয়ে তাহলে তুমি খেলা করছ !

খেলা কি খারাপ জিনিস ! খেলায় স্বাস্থ্য ভাল হয়।

এ যে মনের খেলা ! এতে মন ভাঙে।

যে মন ভাঙবার সেই মনই ভাঙে, শক্ত মন কিছুতেই ভাঙে না।

বলেই সে চেঁচিয়ে উঠল : রোকো, এই আমাদের ড্রিমল্যাণ্ড।

ড্রিমল্যাণ্ডই বটে !

২০

ড্রিমল্যাণ্ডের বারান্দায় উঠেই স্বাতি বলল : প্রেসিডেণ্টের কাণ্ড দেখ।

ওপারের ঘাট থেকে একখানা শিকারা সাঁ সাঁ করে আমাদের দিকে আসছিল। নামটি পড়া যাচ্ছে, এটি প্রেসিডেণ্টেরই শিকারা।

বসবার ঘর থেকে মামী বললেন : তোমরা ফিরলে নাকি ?

কিন্তু স্বাতি ভিতরে গিয়ে বলল : তোমরা বসে আছ ?

মামা তাঁর পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলছিলেন। বললেন : কপালে কি আজ বিশ্রাম আছে ! সেই হতভাগা তোমাদের অপেক্ষা করে আছে।

বুঝতে পারলুম যে মামা প্রেসিডেণ্টের কথাই বলছেন, এবং দুপুরে বেরতে তাঁর আপত্তি নেই। আপত্তি থাকলে এ রকমের মৃদু অনুযোগ করতেন না।

প্রেসিডেণ্ট এসে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম : এখুনি বেরতে হবে, না ঘণ্টাখানেক পরে ?

বিনীত ভাবে সে বলল : যেমন আপনাদের মর্জি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

হুকুম হলে ঝিলমের উপর সাতটা কদল দেখিয়ে আনতে পারি শ্রীনগর শহরটা দেখা হয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ঘণ্টাখানেক পরে বেরলে হয় না ? মামার ও মামীমার একটু বিশ্রাম হয়ে যেত।

মামী বললেন : আমার বিশ্রামের দরকার নেই।

মামা বললেন : আমারই বা এমন কী দরকার !

তবু আমরা ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে বেরলুম। সঙ্গে নিলুম

আপেল আর বাবুগোসা। স্বাতি বলল: আখরোটও নাও, চিনেবাদামের বদলে আখরোট ভেঙে ভেঙে খাওয়া যাবে।

নিজে একটা ক্যামেরা সঙ্গে নিল।

হাউসবোট থেকে শিকারায় নামা খানিকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা স্বচ্ছন্দে নামলুম। মামাও আগের চেয়ে অনেক নির্ভয়ে নামলেন।

চেরিরাইপের সামনে দিয়ে যাবার সময় স্বাতি বলল: এখনও গান হচ্ছে!

আমি বললুম: ফক্সট্রট।

মামা বললেন: এ সবও জানা আছে নাকি?

স্বাতি বলল: কী জানা নেই, তাই জিজ্ঞেস কর।

বললুম: নাচতে জানি নে।

কিন্তু নাচাতে জান।

বলে মামা হেসে উঠলেন। আর আমি লজ্জা পেলুম তাঁর মন্তব্য শুনে।

ডাল লেক থেকে ঝিলম নদী পর্যন্ত যে জলপথ তার কিয়দংশ বোধহয় কৃত্রিম। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছিল বলে মনে করি। অসুবিধা শুধু একটি ছিল। খাদের মতো নিচু জমি দিয়ে ঝিলমের প্রবাহ, আর ডাল লেক উঁচু মালভূমিতে। জলের লেভেল সমান নয় বলে ডাল লেকের সমস্ত জল ঝিলমের স্রোতে বয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই আশঙ্কাতেই আগে ডাল গেট তৈরি হয়েছে। উঁচু-নিচু জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য দু পাল্লার লক্‌গেট। ঝিলম নদী থেকে একটা সরু খাল বেরিয়ে শ্রীনগর শহরটাকে বেষ্টন করে আবার ঝিলমেই পড়েছে। এরই উপরে লক্‌গেট। ডাল লেকের নৌকো তাই সরাসরি ঝিলমে পড়ে না, পড়ে এই খালে। এই জায়গারই নাম চেনারবাগ।

যতই আমরা ডাল গেটের নিকটবর্তী হতে লাগলুম, পরিবেশ

ততই পরিবর্তিত হতে লাগল। জল অপরিচ্ছন্ন। হাউসবোটগুলি তেমন সুন্দর নয়। বড় বড় গাছে সব যেন অন্ধকার হয়ে আছে। বাতাস আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে। গেটের দেওয়ালে যেন শ্যাওলা দেখলুম। কিন্তু গেটে আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। আগে থেকেই একখানা শিকারা অপেক্ষা করছিল। আমরা এসে পৌঁছবার পরেই গেট উঠল, আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লুম, কিন্তু বেরতে পারলুম না। অন্য ধারে আর একটা গেট। এবারে পিছনের গেটও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বন্দী হয়ে গেলুম।

প্রেসিডেন্ট বলল : এইবারে দেখুন, আমরা নিচে নামছি।

সত্যিই তাই। জলের লেভেল নিচু হচ্ছে। মানে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কত ফুট জল নামল, কতটা নিচে নামলুম, আমরা তা বুঝতে পারলুম না। তারপরে যখন ওধারের গেট উঠল, তখন চেনারবাগের খালে বেরিয়ে এলুম স্বচ্ছন্দে। মনে হল না যে দুধারের জলের সমতল এক নয়।

এই চেনারবাগেই হালদার মশাইরা আছেন। এখন তিনি ঘুমচ্ছেন না বেড়াতে গেছেন, তা জানি নে। স্বাতিরও ঠিক একই কথা মনে পড়েছিল, বলল : হালদার মশাইকে দেখা যাচ্ছে কি ?

মামী জিজ্ঞাসা করলেন : এইখানে থাকেন বুঝি ?

পিছনের বড় বড় হাউসবোটগুলো দেখিয়ে স্বাতি বলল : ওরই একটার মধ্যে আছেন।

মামা বললেন : লোকটার অসীম ক্ষমতা ! পরের পয়সায় সারা দেশটা ঘুরে দেখল। রামেশ্বর থেকে অমরনাথ।

চেনারবাগের এইখানে বেশ জল আছে। এ যে ডাল লেকের জল তা বুঝতে পারি। পুলের উপর দাঁড়িয়ে খালের ও ধারটা আমরা প্রায় শুকনো দেখেছি। এ ধারটাতেও অল্প জল। কিন্তু ডাল গেটের পর থেকে যেন স্রোত বইছে। শিকারা পারাপারের সময়ে বোধহয়

এই জল ডাল লেক থেকে ঝিলমের দিকে যাচ্ছে। আমরাও যাচ্ছি সেই দিকে।

'কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ' গ্রন্থে এই ডাল গেট সম্বন্ধে কিছু অন্য কথা আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুবার প্রবল বন্যায় শ্রীনগর শহরের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তাই দেখে মহারাজা গোলাব সিং এই ফাটক নির্মাণ করেছেন। ফাটক বন্ধ থাকলে হ্রদের জল এইখানে আসতে পারে না। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শ্রীনগরের নানা স্থানে নাকি এই রকমের ফাটক আছে।

আমাদের শিকারা চলেছিল চিনারের ছায়ায় ছায়ায়। চিনার কাশ্মীরের প্রাণ। এই পত্রবহুল বিরাট গাছগুলি কাশ্মীরের রূপ আরও কমনীয় করেছে। একটি প্রবাদ আছে চিনার সম্বন্ধে—চিনার কেড়ে নিলেই কাশ্মীরের রূপ যাবে ফুরিয়ে। কথাটা যে কিছু সত্য তাতে সন্দেহ নেই।

চিনার সম্বন্ধে সব চেয়ে আশ্চর্য কথা বলেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনগরে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে অনেক ঘর বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ইতিহাসে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তিনি মসজিদের কথা জিজ্ঞাসা না করে চিনারের কথা জানতে চেয়েছিলেন, চিনার গাছগুলো পুড়ে যায় নি তো? বলেছিলেন, একটা মসজিদ পুড়ে গেলে আর একটা মসজিদ গড়া যায় অল্প সময়ে। কিন্তু একটা পুরনো চিনার পুড়লে আর একটা চিনার হয় না তাড়াতাড়ি।

জাহাঙ্গীর বাদশাহও চিনার ভালবাসতেন। শুধু তাঁর তুজুকেই এই গাছের উল্লেখ করে যান নি, তিনিই পরিকল্পনা করেছিলেন চার চিনারের। চার দিকে চারটি চিনার গাছ এমন করে লাগিয়েছিলেন যে কোন সময়েই সূর্যের আলো এই কুঞ্জ ভেদ করবে না। শীতল ছায়ায় বিশ্রাম নেবে রৌদ্রদগ্ধ পথিক।

ইতিহাসে নাকি আছে, আকবর বাদশাহ পারস্য থেকে এই বৃক্ষ এনে কাশ্মীরে রোপণ করেছিলেন। এর পার্সী নাম দরখ্‌তে ফজল, মানে আশীর্বাদের গাছ। অনেকে একে ইরাণের গাছ বলেন। আরও প্রাচীন কালে হেরোডোটাস আর্কিমেনিয়ান রাজাদের প্রিয় গাছ ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। প্লিনির ন্যাচারাল হিস্ট্রীতেও এই গাছের উল্লেখ আছে। আয়োনিয়ান সাগর পেরিয়ে আনা হয়েছিল ডায়োমেডিয়া দ্বীপে, সেখান থেকে সিসিলি ও ইটালিতে। তারপর ফ্রান্সে ও স্পেনে। এই গাছের ছায়ায় যারা বিশ্রাম নিত, তাদের নাকি শুল্ক দিতে হত রোমের সরকারকে। এই গাছের গোড়ায় জলের বদলে মদ ঢালা হত। এমনও সব অদ্ভুত গল্প আছে যে ইটালির একটা বিরাট গাছের গুঁড়ির ভিতরে রাজামহারাজাদের খানার জন্যে প্রশস্ত ঘর তৈরি হয়েছিল। এ সব কথা এখন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এখন চিনার দেখা যায় মধ্য এশিয়ার ফরগনাতে, আর এই কাশ্মীরে। এ দেশে এ গাছে কেউ আঘাত করে না, গাছের ক্ষতি করা লোকে পাপ বলে মনে করে। একদা পাঠানরাও তাই বলত। তাদের রাজত্ব কালে কেউ এ গাছ কাটলে তার শাস্তি হত।

এ সমস্তই আমার পড়া কথা। যে ভদ্রলোক চিনার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটি লিখেছেন, তিনি এই গাছ বিদেশী বলে মনে করেন না। চিনার তিনি এ দেশের নিজস্ব সম্পত্তি বলেই মনে করেন। তার প্রমাণ এই গাছের দেশী নাম ভুনি। এই শব্দটি নাকি সংস্কৃত শব্দ ভবানীর রূপান্তর। করুণাময়ী মা ভবানী। পুরাকালে যে গাছ ভবানী নামে পরিচিত ছিল তা এই দেশেরই সম্পদ। আকবর বাদশাহ তাকে ভালবেসে নিজের নাসিম বাগে লাগিয়েছিলেন সযত্নে। সত্য কথা না জেনে লোকে পারস্যের গাছ বলেছে।

কাশ্মীরে আরও অনেক উপকারী গাছ আছে। উইলো গাছের তক্তা দিয়ে ফার্নিচার হয়, দেওদার দিয়ে হয় বাড়ি তৈরি।

পাইন ফার বার্চ, অ্যাশ ওক পপলার, আরও কত গাছ আছে। কিন্তু চিনারের মতো রাজকীয় গাছ আর নেই। বাঙলাদেশে যেমন বটগাছের ছায়ার সঙ্গে বঁধুর মায়ার তুলনা করা হয়েছে, তেমনি কাশ্মীরের এই চিনার গাছের ছায়া। স্বাতি একটা গাছের দিকে তাকিয়ে বলল : এ গাছে ফল হয় না?

উত্তর দিল প্রেসিডেন্ট, বলল : না।

এইখানেও অনেক হাউসবোট পারের সঙ্গে লেগে আছে। টুরিস্টদের জন্য এ সব হাউসবোট যে নয় তা তাকালেই বোঝা যায়। জীর্ণ দশার নিচু নিচু হাউসবোট, দরজা জানালা কম। দু একজন যাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তারা খেটে খায়, শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে তাদের উপার্জন। দারিদ্র্যের বিজ্ঞাপন চারি দিকে ছড়ানো আছে।

মাঝে মাঝে জলের উপর কাঠের গুঁড়ি ভাসছে। এক সঙ্গে অনেক গুঁড়ি। সেই সব বাঁচিয়ে শিকারা সন্তর্পণে চলেছে। তারপর এক সময় গিয়ে ঝিলমের স্রোতে পড়ল। স্বচ্ছ জলের প্রশস্ত স্রোত। শ্রীনগর শহর তার দুধারে। প্রেসিডেন্ট তার শিকারা জলস্রোতে ভেসে যেতে দিল না। এক জায়গায় স্থির করে বলল : ঐ দেখুন শ্রীনগরের প্রথম পুল, নাম আমিরা কদল। ঝিলমের ওপরে এমনি সাতটি পুল আছে। আমরা এই সব পুল দেখতে দেখতে এগোব। পুলকেই আমরা কদল বলি।

বাদশাহ ব্রীজও আমরা দেখলুম। এই আধুনিক পুলটির উপর দিয়ে আমরা ঝিলমের অপর পারে সেণ্ট্রাল মার্কেটে গিয়েছি। এ ধারের মতো ও ধারেও অনেক হোটেল আছে। একেবারে ঝিলমের উপরেই এই সব হোটেল। এপার থেকে তাদের সাইনবোর্ড দেখা যায়।

ওপারের পুরনো রাজপ্রাসাদটিও আমরা দেখলুম। এখন এটি সদর দপ্তর হয়েছে। ঘাটে শিকারা বেঁধে উপরে উঠে যাওয়া যায়।

এই ঝিলমের নামই বিতস্তা, অনেকে বেহেৎ বলে। কাশ্মীর রাজ্যের জীবন হল ঝিলম, ঝিলমকে কেন্দ্র করেই তার সমৃদ্ধি। ভেরিনাগে তার উৎস থেকে খানাবল পর্যন্ত নৌকো চলে না, তারপর থেকে বারামূলা পর্যন্ত পঁয়ষট্টি মাইল স্রোতে নানা জাতের নৌকোয় কাশ্মীরের বাণিজ্য চলে অব্যাহত ভাবে। বারামূলার পরে আবার পার্বত্য এলাকা। ঝিলম সেখানে খরস্রোতা। কাশ্মীরের তাতে ক্ষতি নেই। বারামূলার অল্প দূরেই তার সীমান্ত।

আমাদের শিকারা চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। ঝিলম এখানে উত্তরবাহী। তার দু ধারে সমৃদ্ধ শহর। দ্বিতীয় সেতু হাবা কদল ও তৃতীয় সেতু ফতে কদল পর্যন্ত ঘন বসতি দেখতে দেখতে আমরা এগোলুম। এইখানেই দেখতে পেলুম শাহ হামদান নামে একটি সুন্দর মসজিদ। নদীর দক্ষিণ পারে একখানা কাঠের দোতলা বাড়ি দেখে প্রেসিডেন্টকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম : এটা কী?

তার কাছেই শাহ হামদানের নাম শুনলুম। পারস্যের হামদান নামে একটি জায়গা থেকে মীর সৈয়দ আলি নামে একজন ফকির ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য কাশ্মীরে এসেছিলেন। ইনিই শাহ হামদান নামে পরিচিত। তখন সুলতান কুতব উদ্‌দীনের রাজত্বকাল। সুলতান এই ফকিরের স্মৃতি রক্ষার জন্য মসজিদটি নির্মাণ করেন। তারপর সিকান্দর শাহ এটিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মসজিদটি একবার পুড়ে যায়। বর্তমান মসজিদ নূতন করে নির্মিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করল : ভিতরে গিয়ে দেখবেন?

মামীর মনের কথা আমি জানি। মসজিদে ঢোকার নামে তিনি আঁতকে উঠবেন। তাই তাড়াতাড়ি বললুম : বাইরে থেকেই বেশ দেখতে পাচ্ছি।

দেওদার কাঠের তৈরি এই মন্দিরের ছাদ চারচালা, তার উপরে

চারকোনা চূড়ো। সকলের উপরে একটি সোনার গোলা রৌদ্র কিরণে ঝকমক করছে।

প্রেসিডেন্ট বলল: ভিতরটা দেখলে আরও ভাল লাগত। যেমন সুন্দর ছাদ, তেমনি সব ঝাড়লণ্ঠন। মেঝের গালিচাও দেখবার মতো।

প্রেসিডেন্ট যা বোঝাল তাতে বুঝতে পারলুম যে মসজিদের ভিতরে ঢুকলে কাশ্মীর শিল্পের একটি নিখুঁত নমুনা দেখতে পাওয়া যেত। আমরা দেখবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করলুম না বলে সে বোধহয় দুঃখ পেল। বলল: নামলে মহাকালী মন্দিরও দেখতে পেতেন। মসজিদের পাশেই এই মন্দির।

আমাদের গাইড বইএ আমি অন্য কথা পড়েছিলুম। সেই কথা বলে মামীকে আমি সান্ত্বনা দিলুম, বললুম: এই মন্দির এখন আর নেই, হিন্দুরা এখন ঝিলমের জলে কালীর পুজো করে।

মামী প্রশ্ন করলেন: কী হল মন্দিরের?

বললুম: জানি নে। বইএ সে কথা লেখে নি।

আমাদের শিকারা খুব ধীরে ধীরে চলেছিল। প্রেসিডেন্ট বলল: কাঠের মসজিদের উল্টো দিকে পাথর মসজিদ। নদীর বাঁ পারে এটি। লোকে এখন শাহি মসজিদ বলে।

এই মসজিদের ইতিহাসও আমি গাইড বইএ পড়েছি। মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এটি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। এ দেশের কিছু সুন্নি মুসলমান স্ত্রীলোকের তৈরি এই মসজিদটি উপাসনার উপযুক্ত স্থান বলে স্বীকার করে নি। এখন এই মসজিদে তাই রাজ্যের ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের সদর দপ্তর বসেছে।

তারপরে চতুর্থ সেতু জৈনা কদল। সুলতান জৈন উল আবদীন এই সেতু নির্মাণ করেছিলেন বলে তাঁরই নামে নাম হয়েছে। এ দেশে তিনি বাদশাহ নামে পরিচিত।

নদীর দক্ষিণ পারে জৈনা কদলের ঠিক নিচেই বাদশাহী সমাধি। প্রেসিডেন্ট বলল : বাদশাহর মায়ের কবর ভিতরে, বাইরে নিজের। এখন এই জায়গার নামই হয়েছে বাদশাহ।

মামার দিকে তাকিয়ে আমি বললুম : পদে পদে বিপদ হচ্ছে।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কেন ?

আমাদের গাইড বইএ একটা অদ্ভুত কথা পড়েছি। পাঁচ গম্বুজের এই বাড়িটা এক সময় নাকি মহাশ্রী মন্দির ছিল। ইতিহাসে আছে যে কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেন এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। দেওয়ালের লিপিতে নাকি এই কথার প্রমাণ আছে।

মামা বললেন : কিছু বিচিত্র নয়। মুসলমানেরা দেশের অনেক মন্দিরকে মসজিদ করেছে। এই মন্দিরের ভিতর হয়তো নিজের মাকে কবর দিয়ে থাকবে।

ঝিলমের তীরে আর একটি মন্দিরের কথা আমি পড়েছি। রঘুনাথ মন্দির। একশো বছর আগে কোন ডোগরা রাজা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শিকারা থেকে আমি সেই মন্দির দেখতে পাই নি। দেখবার কথা আমার মনে ছিল না।

জৈনা কদল থেকে হরিপর্বতের দিকে যেতে জামা মসজিদ। কাশ্মীরের এই বৃহত্তম মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন সুলতান সিকান্দর শাহ চতুর্দশ শতাব্দীতে। কিন্তু আগুন লেগে তিনবার পুড়ে যায়। শেষবার ঔরঙ্গজেব বাদশাহ এটি তৈরি করে দেন। এই মসজিদের বয়স আজ প্রায় তিনশো বছর হল।

ধীরে ধীরে আমরা আরও দুটি পুল পেরিয়ে গেলুম—আলি কদল ও নওয়া কদল। লোকালয় এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, দেখার মতো আর কিছুই নেই। শ্রীনগরের সপ্তম ও শেষ পুল হল সাফা কদল।

প্রেসিডেন্ট আমাদের বোঝাল যে এক সময় শ্রীনগরে এই সাতটিই কদল ছিল, এখন নটি হয়েছে। নিতান্ত হাল আমলে তৈরি

হয়েছে বাদশাহ ব্রিজ ও রাজবাগ ব্রিজ। বাদশাহ ব্রিজ তৈরি করতে বারো লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

ফেরার পথে স্বাতি বলল: এই ঝিলমের তীরেই শুনেছি কাশ্মীরের সমস্ত কারখানা।

প্রেসিডেণ্ট বলল: দেখবেন নাকি একটা?

স্বাতি বলল: কিসের কারখানা দেখাবে?

কাঠের জিনিস ও পেপিয়াব মেসি এক জায়গাতেই তৈরি হয় কার্পেট তৈরিও দেখতে পাবেন।

বলতে বলতেই সে একটা ঘাটে শিকারা বাঁধল।

মামা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দিনের আলো আরও অনেকক্ষণ থাকবে। তাঁব উদ্বেগ লক্ষ্য করে প্রেসিডেণ্ট বলল: ভয় নেই, আমরা এবারে কাটা খালের ভিতর দিয়ে ফিরব। শহরে পৌঁছতে একটুও দেরি হবে না।

শিকারা থেকে নেমে আমাদেব পায়ে হেঁটে খানিকটা যেতে হল। প্রেসিডেণ্ট আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কারখানাব মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মেঝেয় বসে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন, আর কাবিগবদেব কাজ দেখছিলেন। মস্ত বড় ঘর. তার ভিতর অনেকগুলি কারিগর নানা রকমের কাজ করছে। পেপিয়ার মেসির জিনিসের উপর নক্সা আঁকছে কেউ, কেউ কাঠের উপর সূক্ষ্ম কাজ করছে। উপরতলার একটা বড় ঘরে তৈরি জিনিসপত্র সব সাজিয়ে রেখেছে।

যে লোকটি আমাদের সব দেখাচ্ছিল তার মুখে চিত্রতারকাদের নাম শুনলুম। অর্ডার দিয়ে তারা নানা রকমের শৌখিন জিনিস করাচ্ছে, তার খুবই শৌখিন দাম। বিচিত্র ছবি আঁকা এক একটা সেণ্টার টেবলের দাম বলল ষোল শো টাকা। মামা বললেন: সাদা টাকায় এ সব কেউ কিনবে না।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা কার্পেটের ফ্যাক্টরি দেখলুম।

ছোট ছোট অন্ধকার ঘরের ভিতর অনেকগুলি করে লোক কাজ করছে। জানালা দিয়ে সামান্য আলো আসছে, সেই আলোতে আমরা নক্সা তোলার কায়দা দেখলুম। কাশ্মীরে কার্পেটের দাম খুবই বেশি। জিনিস হয়তো ভাল, কিন্তু এত দামী জিনিস কলকাতায় কম চলে। মির্জাপুর অঞ্চলের কার্পেট অনেক সস্তা, অনেক জনপ্রিয়।

ফেরার সময় আমরা কাটা খালের ভিতর ঢুকে পড়েছিলুম। দুধারের ঘরবাড়ি, মেয়েপুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়ে দেখতে দেখতে ফিরছিলুম। প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল: লালমণ্ডি বাগিচা আর জাদুঘর দেখবেন তো?

মন আমার ভারাক্রান্ত হয়েছিল, আর কিছু দেখবার বাসনা হল না। স্বাতি বলল: বাগান অনেক দেখেছি, আর চিড়িয়াখানা জাদুঘর দেখবার বয়স এসেছি পেরিয়ে।

মামা বললেন: গোপাল কেন চুপ করে আছ?

কেন চুপ করে আছি, সে কথা আমি বলতে পারলুম না। সেই কারখানার মালিক আমাকে তাঁদের ভিজিটার্স বুকে দু লাইন লিখে দিতে বলেছিলেন। কয়েকখানা পাতা উল্টে একটা নাম দেখিয়েছিলেন আমাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনি এই প্রতিষ্ঠান দেখে কয়েকটা লাইন সেই খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। আমি কিছু লিখতে পারি নি, এক রকমের অদ্ভুত বেদনায় বুক আমার ভরে গিয়েছিল। বাঙলার এই তেজস্বী সন্তান কাশ্মীরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই আকস্মিক মৃত্যু আজও রহস্যময় হয়ে আছে। তার যথাযোগ্য অনুসন্ধান সেদিন হয় নি। বাঙলা যেমন করে নেতাজীকে হারিয়েছে, তেমনি করে হারিয়েছে শ্যামাপ্রসাদকে। বাঙলার পুরনো গৌরব যাঁরা ফিরিয়ে আনতে পারতেন, তাঁদের আমরা অকালে হারিয়েছি। দুর্ভাগা বাঙলা। দুর্ভাগ্য বাঙালীর।

বিষাদে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

২১

আজ সকাল সাড়ে নটায় আমাদের গুলমার্গ যাত্রা। তার ঘণ্টাখানেক আগেই বেরতে হবে। মামী মহা-সমস্যায় পড়েছিলেন। মামা এত সকালে ভাত খেতে রাজী হবেন না, আবার না খেয়ে বেরলে সারা দিন হয়তো খাওয়াই হবে না। শম্পারাও গুলমার্গে যাচ্ছে। বাড়ির বাহিরে খাই নে বলে তাদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখন তাদের চোখের সামনেই হোটেলে খাবেন কোন্ লজ্জায়।

মামা বললেন ঃ পয়সা দিয়ে হোটেলে খাবু, তাতে আবার লজ্জা কিসের!

মামী বললেন ঃ তোমার লজ্জা নেই, কিন্তু আমার আছে। আমি ওদের চোখের সামনে হোটেলে বসে খেতে পারব না।

স্বাতি হেসে বলল ঃ হোটেলে খেতে হবে না, আমি তার ব্যবস্থা করেছি।

কী রকম?

আমাদের খাবার আমি সঙ্গে নিয়েছি!

বাসে উঠে আমরা কতকটা আশ্বস্ত হলুম। শম্পারা অন্য বাসে যাবে। তাদের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। এতক্ষণ মামী তাঁর মোটা চুরট ও চঞ্চল আচরণ লক্ষ্য করেছিলেন। এইবারে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ও ভদ্রলোক কে?

স্বাতি উত্তর দিল ঃ মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ মেয়েটা ওকে বন্ধু বলছিল কেন?

বন্ধু নয়, বলছিল বন্দ্যো, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষেপ।

তারপরেই গম্ভীর ভাবে বলল ঃ ভদ্রলোক বিলেত ফেরত, একটা বড় চটকলে খুব বড় চাকরি করেন।

তবে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না কেন?

স্বাতি মামীর পাশে বসে আস্তে আস্তে কথা কইছিল। আমি কান পেতে শুনছিলুম। সত্য কথা স্বাতি গোপন করে গেল। বলল: ছুজনের বেশ ভাব দেখতে পাচ্ছি।

মামী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: তবে ওর মা গোপালেব জন্যে অমন ব্যস্ত হয়েছে কেন!

আমি এই কথা শুনে চমকে উঠলুম, কিন্তু স্বাতি চমকাল না। মনে হল, এ খবর সে আগে থেকেই জানে। বলল: মা বোধহয় মেয়ের মনের কথা জানে না। তাই মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়কে-ফেলে—

কথা অসমাপ্ত রেখে স্বাতি আমার দিকে তাকাল আড়চোখে।

মামী বললেন: বয়স একটু বেশি, আর—

মামী থামতেই স্বাতি প্রশ্ন করল: আর কী?

মেয়েটা সুন্দর, গোপালের সঙ্গে ভালই মানাবে।

স্বাতি আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে পরম কৌতুকে বলল: কিন্তু গোপালদা কি ওদের সঙ্গে তাল দিতে পারবে!

পারবে না কেন! ও কি বিদ্যেবুদ্ধিতে কারও চেয়ে খাটো!

এ কথার উত্তর দিতে স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল: খাটো যে আসলেই। পয়সা না থাকলে কি মানুষের দাম আছে এই ছুনিয়ায়!

আমি ভুল শুনি নি, ভুল শুনতে পারি না। স্বাতির কণ্ঠে আমি বেদনার স্থর শুনলুম। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে কৌতুকে হাসল না, জানালার দিকে তাকিয়ে তার মুখ লুকোল।

ঝিলমের পরপার থেকে আমরা বারামূলার পথে চলেছিলুম। ন-দশ মাইল যাবার পর বাম হাতে গুলমার্গের রাস্তা। টেঙ্গমার্গ নামে একটা জায়গায় বাস দাঁড়াবে, শ্রীনগর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে। তারপরে চার মাইল চড়াই ভেঙে গুলমার্গ। সেখানে

আমরা হেঁটে উঠব, না ঘোড়ায় চড়ে, তা এখনও ঠিক হয় নি। সে কথা আমরা এখন ভাবছি না।

নিশ্চিন্ত মনে মামা পাইপ টানছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: কাল নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কী হল, সে কথা তো বললে না?

বললুম: কিছু হয় নি বলেই বলি নি।

মামা বিরক্ত ভাবে বললেন: সেখানে কি খুনোখুনি হবে ভেবেছিলে! কী কথাবার্তা হল, তাই জানতে চাইছি।

বললুম: স্বাতি সঙ্গে না থাকলে ওদের সাহেবিআনা সামলাতে পারতুম না।

কী রকম?

অমন বিলিতি বাজনার সঙ্গে কি আমি নাচতে পারি!

তবে কি স্বাতি নাচল!

না, বাজনাটাই সে থামিয়ে দিল।

ততক্ষণে স্বাতি নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলল: গোপালদা তোমাকে ফাঁকি দিচ্ছে বাবা। লুকিয়ে লুকিয়ে নাচবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, আর একবার বললেই নাচবে।

মনের আনন্দে মামা হেসে উঠে বললেন: ওদের নাচবার লোক তো আজ দেখতে পেলুম। তোমাকে দরকার কেন?

বোধহয় ওর পা খোঁড়া, বিলিতি নাচ নাচতে গেলে উল্টে পড়বে।

দিশি নাচ পারবে তো!

কিন্তু ওরা যে বিলিতি নাচ পছন্দ করে!

মামা এবারে গম্ভীর হয়ে বললেন: আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জান! মেয়ের মা ঐ বাঁড়ুজ্যেকে পছন্দ করে না। কিছু একটা গোলমাল আছে, অথচ এড়াতেও পাচ্ছে না। বাঁড়ুজ্যেই পেছনে লেগে আছে, আর আস্কারা পাচ্ছে ঐ মেয়েটার কাছে।

মামার অভিজ্ঞতায় আমি আশ্চর্য হলুম, কিন্তু উত্তর দিলুম না।

একটু থেমে তিনি আমাকে বললেন : সুবিধে মতো নিজের পরিচয়টা দিয়ে দিও, তোমাকে আর জ্বালাতন করবে না।

কাশ্মীরের সরকারী বাসগুলি ভারি সুন্দর। বাহিরের মতো ভিতরটাও পরিচ্ছন্ন, পুরু গদি-আঁটা উঁচু চেয়ার, আরাম করে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা। যাত্রী একটিও বেশি নেওয়া হয় না। সবাই টুরিস্ট, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছে। শুধু শ্রীনগর নয়, আশেপাশের সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখে ফিরবে। ভারত সরকারের পুস্তিকা ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। তাতে কাশ্মীরের সব খবর জানা যায়। তারপর এদের টুরিস্ট রিসেপ্‌সন অফিসে ফাঁদ পাতাই আছে। যাত্রীরা এমন ভাবে টিকিটের জন্যে কাড়াকাড়ি করছে যে কোন জায়গায় যেতে না পারলে বুঝি জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শুধু গুলমার্গ আর পহলগাম নয়, উলার লেক, সোনমার্গ ও যুসমার্গ। যুসমার্গের পশুচারণ ক্ষেত্রটিও যেন পৃথিবীর একটি সুন্দরতম দর্শনীয় স্থান। কাশ্মীরের হাওয়াতেই একটা পাগলামি আছে। যাত্রীরা যাত্রীদের দেখেই পাগল হয়।

আমরা বাঁধানো সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতে গুলমার্গের রাস্তা কখন ধরেছি খেয়াল করি নি। খেয়াল হল যখন দেখতে পেলুম যে বাস ক্রমাগতই উপরে উঠছে। শ্রীনগরের উচ্চতা মাত্র পাঁচ হাজার দুশো ফুট, আর গুলমার্গ সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। বাস এসে যেখানে থামবে তার উচ্চতা জানি নে, শেষ চার মাইল চড়াই বেশি বলে মোটর এখন চলে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে চলবে।

যে পথ ধরে আমরা চলেছি, তা পাহাড়ের গা বেয়ে নয়, মালভূমির উপর দিয়ে পথ। কাঙড়া উপত্যকায় আমরা এই রকম পথ দেখেছি।

এক সময় আমরা টেঙ্গমার্গে পৌঁছে গেলুম। ছোট একটি লোকালয়, দূরে দূরে ঘর বাড়ি পাহাড়ের কোলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। বাস দাঁড়াবার জায়গাটিই শুধু লোকজন ভাণ্ডি ও

ঘোড়ায় জমজমাট। যাত্রীদের বিশ্রামাগার ও হোটেল আছে, আর আছে কলরব। আমাদের রিটার্ন টিকিট, আজই আমরা ফিরব। বিকেল চারটের পরে আমাদের বাস ছাড়বে। এই সময়ে নাকি স্বচ্ছন্দে গুলমার্গ ও খিলেনমার্গ দেখে ফিরে আসা যায়। দু একজন বিছানা বাক্স নিয়ে গুলমার্গে কয়েক দিন থাকতে এসেছেন। ভালমন্দ নানা রকমের হোটেল আছে, ডাকবাংলো আছে। গুলমার্গে কয়েক দিন না থাকলে নাকি তার সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ হয় না।

বাস থেকে নেমেই আমরা বুঝতে পারলুম যে এখানে দেখবার কিছু নেই। যা কিছু দেখবার, তা সবই উপরে। গম্ভীর মুখে মামা বললেন: অথ কীম্?

আমি তাঁর ভয়েব কারণ বুঝি। তিনি তাঁর ভারি দেহ নিয়ে ঘোড়ায় উঠতে পারবেন না, হাঁটা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। মামী তো ডাণ্ডিতে চড়বেনই, তাঁকেও ডাণ্ডিতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সেই কথাটি কায়দা করে বলতে হবে।

ঘোড়াওয়ালা ও ডাণ্ডিওয়ালা দু দলই এগিয়ে এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলুম: ভাল ডাণ্ডি আছে তোমাদের?

মুহূর্তের মধ্যে তারা দুখানা ডাণ্ডি আর দুটো ঘোড়া এনে উপস্থিত করল।

কে ডাণ্ডিতে উঠবে আর কে ঘোড়ায়, সে কথা জিজ্ঞাসা করলুম না। বললুম: বেশি পয়সা নেবে না তো?

তারা বলল: সরকারী রেট দেখে পয়সা দেবেন।

সরকারী রেটও একজন জানিয়ে দিল। গুলমার্গ যাতায়াতের ডাণ্ডি ভাড়া চোদ্দ টাকা, খিলেনমার্গ পর্যন্ত আরও দশ টাকা। আর ঘোড়ার রেট দু রকম। ভাল ঘোড়া যাতায়াতে সাড়ে ছ টাকা। গুলমার্গ পর্যন্ত সোয়া তিন।

আমি বললুম: ঘোড়ায় ওঠা বিপজ্জনক।

পিছন থেকে একটি লোক এগিয়ে এসে বলল : কিছু ভয় নেই বাবু, দু টাকায় একজন হেল্‌পার নিয়ে নেবেন।

পরে দেখেছিলুম যে ঘোড়াওয়ালার দায়িত্ব ঘোড়া দিয়েই শেষ। সঙ্গে সঙ্গে যায় বটে, কিন্তু সাহায্য বিশেষ করে না। ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখে শুনে নিয়ে যায় হেল্‌পার। এ কাজটি ঘোড়াওয়ালাই করতে পারে, কিন্তু সাধারণত করে না।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : কি করবে ভাবছ ?

বললুম : ডাণ্ডিই নিরাপদ।

ততক্ষণে ডাণ্ডিওয়ালারা মামীকে প্রায় বসিয়ে নিয়েছে এবং মামাকে বসাবার জন্যে লেগে গেছে। মামা একবার ঘোড়ার দিকে তাকালেন, তারপর ডাণ্ডির দিকে চেয়ে বললেন : তা হলে ডাণ্ডিতেই উঠতে বলছ ?

মামী বলে উঠলেন : তা নয় তো কি ঘোড়ায় চড়বে ভাবছ ?

মামা আর ইতস্তত করলেন না। ডাণ্ডিতেই উঠে বসলেন।

স্বাতি এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এবারে আমার দিকে চেয়ে বলল : এস গোপালদা, আমরা হাঁটব।

মামা বললেন : সে কি, চার মাইল পথ তোমরা হাঁটবে কেন ?

আমি বললুম : ঘোড়ার পিঠে তোমাকে চমৎকার মানাবে। মনে হবে, ঝাঁসির রাণী চলেছে লড়াই করতে।

স্বাতি বলল : আর তোমাকে দেখে লোকে তাঁতিয়া টোপি বলে ভুল করবে।

ততক্ষণে ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি কাঁধে তুলে এগিয়ে গেছে। স্বাতিও তাদের অনুসরণ করে হনহন করে এগিয়ে গেল।

আমি বললুম : আমাকে সঙ্গে নেবে না ?

স্বাতি পিছনে হাত বাড়িয়ে বলল : এস।

হতাশ হল ঘোড়াওয়ালারা।

স্বাতির পাশে পৌঁছে আমি বললুম: এতটা পথ তুমি হাঁটবে?

স্বাতি বলল: কেন, পারব না ভাবছ?

প্রশ্নটা পারার নয়, প্রশ্নটা কষ্টের। যে কষ্ট এড়ানো যায়, অকারণে তা কেন করবে!

ঘরে শুয়ে ঘুমলেই সব চেয়ে বেশি আরাম হয়!

তাহলে এই জীবনের আনন্দ উপভোগ করত কে!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল: ঘোড়ায় চড়ে কি সেই আনন্দ বেশি উপভোগ হত!

পাথর বেছানো উঁচু নিচু পথে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি, আর কথা বলছি ঘনিষ্ঠ ভাবে। যারা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, তারা পথের এক ধার দিয়ে চলেছে একজনের পরে আর একজন। যে দিকে পাহাড় সে দিক দিয়ে ঘোড়া চলে না, চলে খাদের দিক দিয়ে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই পথ কিছু মসৃণ হয়েছে, তাই সে পথ ছেড়ে কিছুতেই আসে না পথের মাঝখানে। ঘোড়ার পিঠে যারা বসে আছে, তাদের অস্বস্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। খাদে গড়িয়ে পড়বার ভয়ে তারা সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে আছে। আমি বললুম: ঘোড়ায় চড়লে আমরাও কি অমনি ভয়ে ভয়ে চলতুম?

স্বাতি বলল: জীবনের পথেও তো আমরা ভয়ে ভয়ে চলেছি। পায়ে হেঁটে সাহস বাড়ুক, তারপরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলব।

আমি হেসে বললুম: তারই জন্যে কি তুমি তৈরি হচ্ছ?

তোমাকে তৈরি করছি। এত বড় হিমালয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। ভয়ে তুমি তার কাছে গেলে না। হিমালয় কি তুমি দেখবে না?

সময় হলেই দেখব।

কবে সে সময় হবে?

মন যখন অন্তর্মুখী হবে, তখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হবে না।

তখন কি তুমি সাধনার মার্গ নেবে?

হেসে বললুম: এ তো সাধনা, ভোগের জন্য সাধনা। এই সাধনাই এ যুগের মানুষকে পাগল করে রেখেছে। মুক্তির জন্য সাধনা আর কেউ করবে না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্বাতি কোন কথা কইল না।

পায়ের নিচের পথ সমতল নয়। সে দিকে নজর রাখতে হয়েছে। আবার চোখ তুলে পার্বত্য পথের শোভাও দেখছি। মামা ও মামীর ডাণ্ডি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যারা ঘোড়ায় চলেছে, তাদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নির্জন পথে আমরা যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছি।

রৌদ্রে উত্তাপ নেই, শুধু আলো এসে পথের উপর ছড়িয়ে পড়ছে, আর শিরশির করে ঝাউএর হাওয়া গায়ে লাগছে। এক সময় স্বাতি বলল: জীবন মানে তো মুক্তি নয়, বন্ধনের বাসনা। শুধু প্রীতির বন্ধন নয়, ভোগেরও বন্ধন। ভোগে বিরাগ জন্মালেই আমরা মুক্তি চাই, তার আগে নয়।

আমি হেসে বললুম: সাবাস!

স্বাতি চমকে উঠে বলল: মানে?

মানে, এই আধ্যাত্মিক চেতনার জন্যেই তো লোকে হিমালয়ে তপস্যা করতে যায়! গুলমার্গের পথেই যে তোমার সেই চেতনা লাভ হল!

স্বাতি হাসল না। বলল: সব পেয়েছি ভেবে কি তুমি আজ বৈরাগী হতে পার?

বললুম: কোন দিনই পারব না। যত পাব, পাবার লোভ আমার তত বাড়বে।

পিছনে আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলুম। স্বাতি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল: এখনও তো কিছু পাও নি। এখন তোমার কিসের লোভ?

গম্ভীর হয়ে বললুম: কারও লোভে ধরা দেবার লোভ।

স্বাতি এ কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। পাশ দিয়ে একটি বিদেশী দম্পতি ছুটো বড় ঘোড়ায় চেপে টগবগ করে এগিয়ে গেল। পথের ধার দিয়ে তারা যাচ্ছে না, যাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে পাশাপাশি। উচ্ছল হাসিতে পার্বত্য পথ প্রাণবন্ত করে তারা চলে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা কথা কইতে পারলুম না।

এক সময় স্বাতি বলল: এরই নাম জীবন। ভোগ নয়, বন্ধন নয়, মুক্তিও নয়। শুধু আনন্দময় জীবন।

তারপরে শব্দ পেলুম কুলিদের। একটা ডাণ্ডি আসছে। ডাণ্ডির আরোহীকেও চিনতে পারলুম। মিসেস চৌধুরী রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আসছেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাদেরও চিনতে পারলেন। বললেন: এই, আস্তে।

বাহকেরা বুঝল যে কিছুক্ষণ আর দৌড়নো চলবে না। তাই তাদের চলার গতি কমিয়ে দিল।

মিসেস চৌধুরী বললেন: এ কি, আপনারা হেঁটে উঠছেন! আপনাদের ঘোড়া কোথায়?

স্বাতি বলল: ঘোড়া কী হবে! এতটুকু পথ হেঁটে উঠতেই তো আনন্দ!

মিসেস চৌধুরী প্রতিবাদ না করে জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা মা আসেন নি?

তাঁরা এগিয়ে গেছেন।

এবারে আমার দিকে চেয়ে বললেন: হেঁটে পাহাড়ে ওঠারও একটা থ্রিল আছে। ভাল লাগছে নিশ্চয়ই!

বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাহকদের বললেন: জলদি চল।

এতক্ষণ এই হুকুমেরই অপেক্ষা ছিল। বাহকেরা আবার ছুটল।

ডাণ্ডি খানিকটা এগিয়ে যেতেই স্বাতি বলল: বাবা মার সঙ্গে ওঁর দরকারি কথা আছে।

কী কথা ?

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ে উনি অস্থির হয়ে আছেন।

ভয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে, না নিজের মেয়েকে ?

দুজনকেই।

কিন্তু মামীমা শুধু তোমাকেই ভয় পান, আমাকে নয়।

সেই আনন্দেই থাক।

হঠাৎ দেখলুম যে পাহাড়ের গা বেয়ে দুজন ভদ্রলোক পথের উপরে উঠে এলেন। এ একটা চোরা পথ। পাহাড়ীরা এই পথে ওঠা নামা করে। পথ তাতে অনেক সংক্ষেপ হয়। দুজনের কারও বয়স বেশি নয়। আমাদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেনঃ আপনারাও চোরা পথে উঠুন, আরও বেশি আনন্দ পাবেন !

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হনহন করে এগিয়ে গেলেন। আমি এই উপদেশের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানালুম।

বুঝতে কষ্ট হল না যে এঁরা আমাদের পরের বাসে এসে পৌঁছেছেন। আরও অনেক যাত্রী আসছেন পিছনে। তাঁদের মধ্যে দুজন আমাদের পরিচিত—শম্পা ও বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা বোধহয় ঘোড়ায় চড়ে আসছেন।

এর পরেই আমরা ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলুম। একে একে অনেক যাত্রী পাশ দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু শম্পাদের দেখতে পেলুম না। স্বাতি বললঃ ওরাও কি আমাদের মতো হেঁটে উঠছে নাকি ?

এ কথার উত্তর দেবার আগেই দুজনকে দেখতে পাওয়া গেল। তাঁরা পাশাপাশি আসছেন না, আসছেন একজনের পিছনে আর একজন। দুজনেরই দু পাশে দুজন করে লোক ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটছে। ছোট ছোট ঘোড়া, পা নামিয়ে দিলে হয়তো মাটিতেই ঠেকে যাবে। বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোড়াওয়ালার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। নাকের উপরে একটা ক্ষত। পরে জেনেছিলুম যে

ঘোড়ায় উঠবার সময় ভদ্রলোকের হাতের আঁচড়ে বেচারার নাকটা রক্তাক্ত হয়েছে। এই আঘাতের জন্য লোকটা একবারও প্রতিবাদ করে নি। একটা টাকা বকশিশ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে সেলাম করেছিল। এই ঘটনা আমরা শ্রীনগরে ফিরে শুনেছিলুম।

আমাদের হাঁটতে দেখে শম্পা প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। বলল : এ কি, আপনারা হেঁটে পাহাড়ে উঠছেন!

বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : ঘোড়ায় চড়তে ভয় পেলেন বুঝি!

স্বাতি বলল : কি জানি, যদি গা ঝাড়া দিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দেয়!

বলেন কি!

বলতে গিয়েই বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে যাচ্ছিলেন। ঘোড়াওয়ালা ও হেল্‌পার ছু ধার থেকে ছুজনে ধরে তাঁকে রক্ষা করল।

শম্পা বলল : কথা বোলো না, লাগামটা টেনে চল।

রেকাব থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ফসকে গিয়েছিল। পাশের লোক ছুজন নিচু হয়ে জুতোর সঙ্গে রেকাব জুড়ে দিল।

সহসা স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসি যেন আর থামতে চায় না। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : অমন করে হাসছ কেন?

শম্পাদের শুনিয়ে শুনিয়ে স্বাতি বলল : ঘোড়ায় চড়লে তোমাকে কী রকম দেখাবে তাই ভাবছি।

এক জায়গায় মামা মামী ও মিসেস চৌধুরী আমাদের অপেক্ষা করছিলেন। পাহাড়ীরা ডাণ্ডি নামিয়ে খানিকটা তফাতে বসে গল্প গুজব করছিল। ঘোড়া থেকেও নেমে মাটিতে বসে অনেকে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, অনেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেকখানি। আমাদের দেখতে পেয়েই ডাণ্ডিওয়ালারা উঠে এসে নতুন উদ্যমে যাত্রা করল। আমরা মাটিতে পা ছড়িয়ে বসলুম।

তারপরে আর বসি নি, তারপরে সোজা গুলমার্গ। কয়েকখানি ছোট ছোট বাড়ি পেরিয়েই সেই বিরাট ময়দান। বাড়িগুলির বেশির ভাগই হোটেল। আরও খানিকটা এগিয়ে টুরিস্ট অফিস। একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় মামা মামী ডাণ্ডি থেকে নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মামীকে বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। আমরা কাছে এসে পৌঁছতেই বললেন: তোমাদের আসতে দেরি দেখে ওঁরা ঐ হোটেলে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

মামা বললেন: তুমিও কি ঐখানেই ঢুকবে ভাবছ?

মামী বললেন: আমাদেরও তো এক জায়গায় ঢুকতে হবে, না এই পথের ধারেই বসে খাবে?

বেরবার সময় তো তোমার মুখে অনেক ভাবনার কথা শুনেছিলুম। এখন দেখছি মত একেবারে পালটে গেল!

মামী বললেন: সত্যি বলতে কি, ওদের আমার আর খারাপ লাগছে না। মায়ের দুঃখ তো আমিও বুঝি।

মামা বললেন: হুঁ।

এবারে মামী আমাকে বললেন: বুঝলে গোপাল, ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা বিবাহিত, কিন্তু বেহায়া। শম্পার সঙ্গে ওর মেলামেশা মায়ের মোটেই পছন্দ নয়। চল চল, আমরাও খেতে বসি।

বলে সেই হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন।

মামা বললেন: ওদিকে নয়, এইখানে বসেই আমরা খাব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

২২

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউসুফ শাহ নামে কাশ্মীরের এক সুলতান গৌরীমার্গের নাম বদল করে নূতন নাম রাখলেন গুলমার্গ। ফার্সিতে গুল কথাটির মানে ফুল, গুলমার্গ মানে ফুলের উপত্যকা। আমরা গুলমার্গে এসে কোন ফুল দেখতে পেলুম না, যা দেখলুম তা ঝাউএর বন। সমস্ত পাহাড়ের কোল ঘিরে অসংখ্য ঝাউগাছ আকাশের নীল মেঘ আটকে রেখেছে। আধ মাইল চওড়া ও মাইল তুই লম্বা একটি উপত্যকা, তার মাঝখান দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বছরের কোন সময় হয়তো এই নদীর ধার ফুলে ভরে যায়, তারই জন্য নাম হয়েছে গুলমার্গ।

একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলুম। দূরে এখানকার সার্কুলার রোড পাহাড়ের নিচে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ঝাউ ও ফার গাছে এই পথ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পরিষ্কার দিনে শুনলুম এখান থেকে নঙ্গ পর্বত হরমুখ ও আরও কয়েকটি তুষার শৃঙ্গ দেখা যায়। দেখা যায় ঝিলম নদী ও উলার লেক। আমরা ভেবেছিলুম, আজও আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালারা বলল, তা নয়, আকাশে আজ মেঘ আছে। বরফের পাহাড় দেখতে হলে আজ খিলেনমার্গে উঠতে হবে।

স্বাতি তাদের জিজ্ঞাসা করল : এখানে আর কী দেখবার আছে ?

তারা বলল : এই সবই তো দেখবার।

গল্‌ফ খেলার মাঠ আছে ছুটো। সাহেব মেম বেশি এলে তারা মাঠে গল্‌ফ খেলে, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলে ক্লাবে, আর শীতের সময় বরফের উপর স্কী করে। যারা এখানে থাকতে আসে, তারা বেড়াতে যায় নানা জায়গায়। চার মাইল উপরে খিলেনমার্গ আরও ছু হাজার

ফুট উঁচু। আফারওয়াট বা আলাপাথার লেক আরও চার হাজার ফুট উপরে। নিঙ্গল নালা ফিরোজপুর নালা ববমঋষি লিয়েনমার্গ তোষ ময়দান কণ্টারনাগ—কত বেড়াবার জায়গা।

যারা খিলেনমার্গ যাবে, এখানে তারা বেশি সময় নষ্ট করে নি। একটুখানি বিশ্রাম করেই চলে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে গেছে। যারা হেঁটে এসেছে, তারা আর উপরে যাবে না। ডাণ্ডিতে চড়েও কাউকে উঠতে দেখলুম না।

ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে স্বাতি গল্প করছিল। জিজ্ঞাসা করল: আর কিছু দেখা যায় না এখান থেকে?

যে লোকটা একটু সপ্রতিভ সে বলল: পরিষ্কার দিনে ঝিলম নদী দেখা যায়, আর উলার লেক।

আর কিছু?

ডাল লেক আঞ্চার লেক দেখতে হলে খিলেনমার্গে উঠতে হবে। সেখান থেকে হরিপর্বত আর শঙ্করাচার্যের মন্দিরও দেখা যাবে। পীর পাঞ্জাল হরমুখ আর নঙ্গ পর্বতের দৃশ্য খুব সুন্দর।

গাইড বই থেকে আমরা সব জায়গার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জেনে নিয়েছিলুম। আফারওয়াট আর আলাপাথার একই লেকের নাম। নাগ দেবতার নামে নাম। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই তীর্থ। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতির অনেক আতঙ্ক ও কুসংস্কারের আকর।

সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে এই হ্রদের আকার ত্রিকোণ। জলের রঙ পান্নার মতো সবুজ। শীতে জমে বরফ হয়ে যায়, আর গ্রীষ্মকালে জুলাই মাস পর্যন্ত ছোট ছোট আইসবার্জ ভাসে জলে—খণ্ড খণ্ড বরফ। তুধারের গ্লেসিয়ার থেকে এই বরফ আসে, শীতে জমা বরফও গলে ধীরে ধীরে।

আলাপাথার এক দিনেই দেখে ফেরা যায়। আট মাইল পথ, যাতায়াতে ষোল মাইল। টেঙ্গমার্গ থেকে খিলেনমার্গ যেমন, ঠিক তেমনি। আমাদের সঙ্গে যে যাত্রীরা এসেছে, তাদের অনেকেই তো

ঘোড়ায় চেপে খিলেনমার্গে চলে গেছে, আমাদের সঙ্গেই আবার ফিরবে। তবে সঙ্গে খাবার নিয়ে নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। শুনেছি, একটা রেস্টরেণ্ট আছে তাঁবুর মধ্যে, শৌখিন লোকেরা সেখানে স্ট্রবেরি ও ক্রীম খায়। আলাপাথারে কিছুই নেই। লেকে শুধু জল আছে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

আর একটি হ্রদের নাম হল কণ্টারনাগ। নীলকান্তনাগের অপভ্রংশ। আফারওয়াটের দক্ষিণ দিকে অন্য একটি পাহাড়ের মাথায় এই হ্রদ। যেতে হয় ফিরোজপুর নালার ধার দিয়ে। তারপরে চড়াই তের হাজার ফুটেরও বেশি।

এই ফিরোজপুর নালা ও নিঙ্গল নালার নাম পড়ে স্বাতি বলেছিল: লোকে এই সব নালা দেখতে যায় কেন বুঝি নে!

মামা বললেন: এ সব জায়গায় এসে যারা থাকে, তাদের তো ঘরে বসে সময় কাটে না! তাই ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ফিরোজপুর নালা যাবার অন্য পথ, কিন্তু নিঙ্গল নালা লোকে গুলমার্গ থেকেই যায়। মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। আফারওয়াট থেকে বরফের জল আসছে। লোকে এই নালার ধারে পিকনিক করতে যায়।

গুলমার্গের বাজার থেকে ববমঋষির রাস্তা বেরিয়েছে। বই দেখে জায়গার নামের উচ্চারণ ঠিক বোঝা যায় না। মোগল আমলে বাবা পাম দিন নামে বোধহয় একজন ফকির ছিলেন, তাঁরই একটি স্মৃতিসৌধ আছে। লোকে তাই দেখতে দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে যায়।

স্বাতি বলেছিল: ঋষি তো হিন্দুদের, এ নিশ্চয়ই অন্য কোন কথা।

হয়তো তাই। কিন্তু আমরা তো এ নিয়ে গবেষণা করতে আসি নি!

কৌতূহল যাবে কোথায়!

মামা বললেন: আর কী দেখবার আছে?

বইএর পাতা উল্টে স্বাতি বলল : লিয়েনমার্গ আর তোষ ময়দান। গুলমার্গ থেকে সাত মাইল আর দশ মাইল দূরে। দুটোই ময়দান, তবে লিয়েনমার্গে একটি ছোট নদীও আছে।

সমস্ত শুনে মামী বললেন : এই দেখতেই লোকে এমন কষ্ট করে!

কষ্ট!

কষ্ট নয়! কলকাতা-দিল্লী থেকে কত মাইল পথ পেরিয়ে কত পাহাড় ডিঙিয়ে ট্রেনে মোটরে ডাণ্ডিতে চেপে এখানে এসেছি। কী দেখছি! না, পাহাড়ের মাঝে একটা ফাঁকা মাঠ। আমাদের দেশে কি ফাঁকা মাঠ নেই!

মামা বললেন : আছে বৈকি। গড়ের মাঠ, ধাপার মাঠ—

স্বাতি হেসে উঠল।

আমি বললুম : আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব দেখছি বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। দু দিন থেকে ঘুরে ফিরে সব দেখলে নিশ্চয়ই ভাল লাগত।

মামী বললেন : কী দেখবে?

বরফের পাহাড় পীর পাঞ্জাল হরমুখ—

সে তো আমরা সিমলাতেও দেখেছি, ছবিতেও দেখি। কী আনন্দ তাতে!

স্বাতি বলল : আনন্দ পেতে হলে শীতের সময় আসতে হয়। তখন খিলেনমার্গ থেকে গুলমার্গে আসতে ঘোড়ার দরকার হয় না। পায়ে স্কী লাগিয়ে সোঁ সোঁ করে নেমে এলেই হল।

মামা বললেন : আর একটু এদিক ওদিক হলেই নিশ্চিন্ত। দেহটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্বাতি বলল : বিদেশীরা খুব নির্ভীক। যারা স্কী করতে জানে না, তারাও শিখতে আসে। স্কী শিখবার স্কুল আছে এখানে। জিনিস-পত্র ভাড়া পাওয়া যায়। খিলেনমার্গের নালায় জুন মাস পর্যন্ত বরফ থাকে। তখন তারা স্লেজের শখ মেটায়।

মামা বললেন : এ সব কথাই আমরা শুনি নি।

স্বাতি বলল : এ সব বরফের দেশের কথা। খেলা মানেই তো বরফের ওপরে খেলা, আর প্রাণের দায়ে খেলা। চুপচাপ ঘরে বসে থাকলেই শরীর জমে যাবে।

মামা বললেন : সবই শুনলুম, দেখলুমও কিছু। ফুলের জন্যে গুলমার্গ নাম, কিন্তু ফুল তো কোথাও দেখছি নে।

স্বাতি বলল : ফুলের মরসুম তো শেষ হয়ে গেছে। ফুল দেখতে হলে বসন্তের শেষে আসতে হয়, কিংবা গ্রীষ্মে। তখন জলে পদ্ম, মাঠেঘাটে ফুল, পাহাড়ের গায়েও নানা জাতের গাছ নানা রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। রডোডেনড্রন ফোটে বসন্তে।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল : রডোডেনড্রনকে এরা কী বলে জান ?

হেসে বললুম : জানি নে।

পুণ্ডাপোশ। ডেইজি লিলি জাতীয় ফুল ফোটে বসন্তে, এরা বলে টইকাবাট্নি ও প্রাণিক। লার্কস্পার অ্যান্টিরিনামও ফোটে, এরা বলে কারপিট;সেব ধানা।

স্বাতির মুখের দিকে মামা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিলেন। উৎসাহ পেয়ে স্বাতি বলল : গ্রীষ্মকালে ফোটে সব রকমের মরসুমি; ফুল। পর্টুলেকা থেকে সূর্যমুখী পর্যন্ত দিশী বিদেশী সকল রকমের ফুল।

আমি বললুম : এগুলোরও দেশী নাম বল।

স্বাতি বলল : তুমি কিছু বল।

হেসে বললুম : পর্টুলেকার নাম গুল দোপহর। আর সূর্যমুখীকে বলে গুল আফতাব, মর্ণিং গ্লোরির নাম আশ্‌কা পয়চান।

মামা এবারে আরও আশ্চর্য হলেন।

বললুম : ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকারও সুন্দর নাম আছে—গুলি চিন ও গুল দাউদ। নাস্টার্সিয়ামকে বলে গুল ইয়ারকন্দ। আর—

আর কী ?

ক্যালেণ্ডুলার নাম হামেশি বাহার। আকবর বাদ্‌শাহের সঙ্গে এই দেশে এসে আবুল ফজল বলেছিলেন, ইয়ে দেশ হ্যায় হামেশা. বাহার কি। চিরবসন্তের দেশ হল কাশ্মীর।

এইবারে মামা বললেন: আমি তোমাদের বাহার দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। এ সব স্থানীয় নাম তোমরা কোথায় শিখলে?

আমি হেসে বললুম: একই জায়গায়। স্বাতির কাছে যে গাইড বই আছে, তার শেষের দিকে এই সব নাম আছে। স্বাতি কষ্ট করে কঠিন কঠিন নাম মুখস্থ করেছে, আর আমার মনে আছে, যে নামগুলো একবার পড়লেই মনে থাকে। দ্বিপ্রহরের গুল আর হামেশি বাহার।

নির্মল আনন্দে মামা হেসে উঠলেন।

২৩

আমরা যখন ফেরার উদ্যোগ করছি, তখন মিসেস চৌধুরী এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন : কী হবে এখন ?

মামী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন : কী হয়েছে ?

ওরা তো এখনও ফিরল না !

মামী আশ্বস্ত হয়ে বললেন : ফিরবে সময় মতো।

মিসেস চৌধুরী কাতর ভাবে বললেন : তা কি ফিরবে ! কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই হতভাগার। ইচ্ছে করে থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় গেছে তারা ?

গুলমার্গের রাস্তায় একটু বেড়াবে বলে বেরিয়েছে, কি জানি কোথায় গেছে। ঘোড়াওয়ালাদের পাঠালুম তাদের খবর নিতে, তারাও ফিরছে না।

স্বাতি বলল : আপনি ওদের সঙ্গে গেলেন না কেন ?

মিসেস চৌধুরী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন : কী বলছ তুমি ! আমি এই রোদে বেরব !

সত্যিই তিনি রৌদ্রকে ভয় পান। মাথায় তাঁর আঁচলের একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিলেন, চোখে কালো চশমা। তবু তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। আমরা কিন্তু এই রৌদ্রে বসেই দুপুরটা কাটিয়ে দিলুম। গুলমার্গে গরম নেই, শীতও নেই এখন। আমাদের গরম জামা ডাণ্ডির উপরে ফেলে রেখে একটা গাছের নিচে বসেছিলুম। মিঠে রোদে আরামের আমেজ লেগেছে গায়ে। মিসেস চৌধুরীর কথা শুনে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মামা আর দেরি করলেন না, নিজের ডাণ্ডিতে গিয়ে বসলেন।

এখনও তো সময় আছে, আর একটু দেখুন আপনি।

বলে মামীও তাঁর ডাণ্ডিতে বসলেন।

ডাণ্ডি কাঁধে নিয়ে কুলিরা রওনা হল। আমরাও চললুম পিছনে।

মিসেস চৌধুরী এবারে আমাকে বললেন : আপনি কী বলেন?

আমি বললুম : আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। ওদের জন্যে তো ঘোড়া রইল, ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলবেন।

ঠিক বলেছেন। আমিও তাই ভাবছিলুম।

বলে মিসেস চৌধুরী তাঁর ডাণ্ডিওয়ালাদের কাছে ডাকলেন।

আমরা থামি নি, আমরা এগিয়ে গেলুম।

অল্পক্ষণ পরেই মিসেস চৌধুরীর ডাণ্ডি আমাদের ছাড়িয়ে গেল। যেতে যেতেই তিনি বললেন : একটা ঘোড়াওয়ালাকে বলে এলুম, ওদের তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবার জন্যে।

আমি বললুম : সেই ভাল হয়েছে।

পাহাড় থেকে নামতে পরিশ্রম কম। শুধু একটু সতর্ক থাকতে হয়। ঘোড়ায় চড়ে নামতে বোধহয় অসুবিধে কিছু বেশি। সামনে দু একজনকে হেঁটে নামতে দেখলুম। তাদের ঘোড়া নিয়ে ঘোড়া-ওয়ালারা পিছনে পিছনে যাচ্ছে।

দু একটা চোরা পথ আমরা চিনে ফেলেছি। এবারে সেই পথে আমরা তর তর করে নামতে লাগলুম।

টেঙ্গমার্গে যখন আমরা পৌঁছলুম, বাস ছাড়তে তখনও অনেক দেরি ছিল। আমরা ওয়েটিং রুমে এলুম বিশ্রামের জন্য।

প্রফেসর পণ্ডিতের সঙ্গে এইখানেই আমাদের পরিচয় হল। ভদ্রলোক শ্রীনগরের একটা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্যক্তিগত কাজে এখানে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গেই শ্রীনগরে ফিরবেন। তিনি গভীর অভিনিবেশে একখানা উর্দু বই পড়ছিলেন। কিন্তু চেহারা দেখে তাঁকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছিল। কপালে জাফরাণের তিলক দেখেই আমরা কৌতূহলী হয়েছিলুম।

স্বাতি ফিসফিস করে বলল : তোমার মক্কেল গোপালদা।

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারি নি, পরে তার ইসারা দেখে ব্যাপারটা বুঝলুম। বলল ঃ চেষ্টা কর।

বললুম ঃ উৎসাহ পাচ্ছি নে।

পরে পস্তাবে কিন্তু। সালামাকে জিজ্ঞেস করে মুরগির দাম জানতে পারবে, কিন্তু কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্যের কথা কিছুই জানবে না।

অবশেষে যেচে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব করতে হল। বললুম ঃ কাশ্মীরে আপনারা উর্দু বই পড়েন ?

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকালেন, তারপর সকলকেই একবার দেখে নিলেন। উত্তর দেবার আগে বইখানা মুড়ে বললেন ঃ এখানা কাশ্মীরী ভাষারই বই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ এ তো উর্দু হরফ দেখছি।

ঠিকই দেখছেন। আমাদের ভাষার কোন নিজস্ব হরফ নেই বলে উর্দু হরফেই বই ছাপা হয়।

আমি বললুম ঃ আমার নাম গোপাল, আমরা বাঙলা থেকে বেড়াতে এসেছি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ আমার নাম আনন্দীলাল পণ্ডিত, আমি শ্রীনগরে থাকি।

তবে তো খুবই ভাল হল।

কেন ?

কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের জানবার ইচ্ছে ; কিন্তু তার উপায় খুঁজে পাচ্ছি নে। গাইড বই যা পেয়েছি, তাতে শুধু দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আর হোটেল হাউসবোটের ভাড়া লেখা আছে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ যাত্রীদের তো এই খবরেরই দরকার।

কিন্তু কাশ্মীরের পরিচয় তাতে কী আছে ! এ দেশের মানুষ-জন সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর আমরা কোথায় পাব !

ভদ্রলোক পরম কৌতূহলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন: কিছু মনে করবেন না, আপনি কী করেন?

করি কেরানীগিরি, কিন্তু একটা মাস্টারীর চেষ্টায় আছি।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: আমিও মাস্টার, কলেজে পড়াই।

এর পরে প্রফেসর পণ্ডিতের সঙ্গে ভাব হতে আমাদের সময় লাগে নি। স্বাতিও কাছে এসে বসেছিল। তারপর মনোযোগ দিয়ে আমরা কাশ্মীরের অনেক কথা শুনেছিলুম।

প্রথমেই তিনি বললেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের কথা। যে কারণেই হোক, এ দেশে প্রাচীন অধিবাসীরাই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। যদিও এই ব্রাহ্মণ-সমাজে শাখা ভেঁদ নেই, তবুও দেখা গেছে যে কাশ্মীরে এখন নানা দেশের ব্রাহ্মণ বাস করছেন। তাঁরা সবাই কাশ্মীরিক ও সারস্বত নামে পরিচিত। কবি কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী এ দেশের একটি প্রিয় গ্রন্থ। তাতে জানা যায় যে এ দেশে ব্রাহ্মণ এসেছেন গৌড় ও গান্ধার থেকে, কান্যকুব্জ ও তৈলঙ্গ দেশ থেকেও এসেছেন।

মোটামুটি ভাবে কাশ্মীরে এখন তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়—পণ্ডিত রাজধান ও বাজভট্ট। ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো কাশ্মীরেও এখন শ্রেণীভেদ উঠে গেছে, সকলে সকল কাজ করছেন। আগে পণ্ডিতরা শাস্ত্রচর্চা যাগযজ্ঞ ও রাজবৃত্তি ভোগ করতেন। ব্যবসা ও রাজদরবারে চাকুরি করতেন রাজধানেরা, সংস্কৃতের বদলে তাঁরা ফার্সি ভাষা শিখতেন। মন্দিরে পূজা ও তীর্থস্থানে পাণ্ডার কাজ করতেন বাজভট্টেরা। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা রাজধানদের নিকৃষ্ট মনে করতেন বলে কন্যা দানে রাজী হতেন না।

স্বাতি এতক্ষণ গভীর মনোযোগে সব কথা শুনছিল। এইবারে জিজ্ঞাসা করল: আপনি তো পণ্ডিত, আপনি কেন ফার্সি পড়ছেন?

প্রফেসর পণ্ডিত হেসে বললেন: আপনি আমার হাতের বই দেখে এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন তো!

স্বাতি বলল: হ্যাঁ।

তবে ভুল করেছেন। এ ফার্সি নয়, উর্দু তে লেখা কাশ্মীরী ভাষা।

এর পরে ভাষার সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কথা শোনালেন। কাশ্মীরের প্রাকৃত ভাষার নাম কাশুর, সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ। এ ভাষার লিপি নেই বলে কোন বইও নেই। সংস্কৃত বইএ শারদা-লিপি ব্যবহৃত হয়।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল: শারদালিপি কথাটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

বললুম: এক রকমের দেবনাগরী ভাঙা অক্ষর।

প্রফেসর পণ্ডিত বললেন: শারদা অক্ষরে কাশুর ভাষার সকল কথা লেখা যায় না। কাজেই কালক্রমে আমাদের উর্দু কে আশ্রয় করতে হয়েছে। এই ভাষার অর্ধেক শব্দ হল ফার্সি ও আরবী, বাকি অর্ধেক হল সংস্কৃত হিন্দুস্থানী ও পাহাড়ী।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বাঙলায় জিজ্ঞাসা করল: কী বুঝছ গোপালদা?

প্রফেসর পণ্ডিত যেন চমকে উঠে বললেন: কী প্রশ্ন করলেন?

আমি ইংরেজীতে বললুম: আমি বুঝতে পারছি কিনা জানতে চাইছে।

ভদ্রলোক অপরিসীম বিস্ময়ে বললেন: এই অর্থে আমরাও বুঝচ বলি, আর বুঝলে কিনা অর্থে বলি বুঝকিন্না।

এবারে আমরাও আশ্চর্য হলুম।

প্রফেসর পণ্ডিত বললেন: কাশ্মীরে ভাষা একটি নয়, কম করেও বারোটি ভাষা প্রচলিত আছে বলে শুনেছি। জম্মুতে হিন্দু ডোগ্‌রাদের ডোগ্‌রী ভাষা, বৌদ্ধ-প্রধান এলাকা লাদাখের ভাষা লাদাখী, আর এই কাশ্মীর উপত্যকায় এখন কাশ্মীরী ভাষা। ন্যাশনাল কনফারেন্স এ ছাড়াও দরদী পাঞ্জাবী হিন্দী ও উর্দু কেও জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। উপজাতিদের আরও

অনেক ভাষা আছে—সিরাজী রামবনী পোগুলী কষ্টবাড়ী। এই ভাষাভাষীদেরও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়েছে।

স্বাতি বলল: কাশ্মীরে যে এত রকমের ভাষা আছে, আমাদের তা জানা ছিল না।

জানবার কথা নয়। একটি রাজ্যে এতগুলি ভাষা নানা অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। একটি সাধারণ ভাষা না হলে কাজকর্মের বড়ই অসুবিধা হয়। কাশ্মীরী ভাষাই সব চেয়ে জনপ্রিয় ও সকলের চেয়ে বেশি লোকে ব্যবহার করে। এই ভাষাতেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে উর্দুকেই সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছে।

এর পরে প্রফেসর পণ্ডিত আমাদের কাশ্মীরী সাহিত্যের কথা বললেন। ছ শো বছর আগে কাশ্মীরী ভাষায় কী সাহিত্য রচিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কবি লল্লার রচনাই প্রাচীনতম সাহিত্য বলে মনে করা হয়। এবং তাঁরই আদর্শে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কাব্য রচনা হয়েছে। গুল বাগিচায় সাকীর হাতের সুরা নিয়ে যে গজল, তার দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। ধর্মের নামে যে কবিতা, তারও আবেদন ছিল ক্ষীণ।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ কাশ্মীরী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এ দেশের জনগণের জাগরণ উপলক্ষ্য করে এক বিপ্লবী চেতনাকে কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন মজহুর। তিনিই কাশ্মীরী ভাষায় আধুনিক কবিতার স্রষ্টা। তিনি গজল লিখেছিলেন। কিন্তু তাব বিষয়বস্তু সুরা ও সাকী নয়, তাঁর কবিতা ছিল জাতীয়তাবাদের। কড়া সুরের বলিষ্ঠ গণচেতনার সংগ্রামী রূপ।

মজহুরের সমসাময়িক কবি হলেন মাস্টারজী ও আজাদ। মাস্টারজী শোষিতের জন্য নতুন পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন, আর আজাদও চেষ্টা করেছিলেন অসাম্যের ব্যবধান দূর করবার। কিন্তু দুজনেই ছিলেন আশাবাদী।

এঁদের পরে এলেন ফনি আরিফ ও আসি। জনগণের বেদনা এঁরা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তুললেন। প্রেমি নাদিম ও রোশনের কবিতায় আমরা অন্য আস্বাদ পাই। শুধু প্রকৃতির রূপ নয়, পল্লীর মানুষের রূপও তাঁদের লেখায় ফুটে উঠেছে—তাদের নানা রকমের লোকনৃত্য ও উৎসব। এ কালের শ্রেষ্ঠ কবি নাদিম। তাঁর কবিতায় আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধ্বনিও শুনি, যেমন শুনি রোশন ও রাহীর কবিতায়।

প্রফেসর পণ্ডিতকে থামতে দেখে আমি কী প্রশ্ন করব ভাবছিলুম। এমন সময় একটা লোক আমাদের জন্য চা নিয়ে এল। আমি সবিস্ময়ে চারিধারে চাইতেই মামাকে হাসতে দেখলুম। তিনি বললেন: ব্যবস্থা আমরাও করতে পারি।

কেন পারবেন না!

বলে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি প্রফেসরকে দিলুম। অন্য পেয়ালা স্বাতি আমাকে এগিয়ে দিল। ওপাশ থেকে মামী আরও এক পেয়ালা চা পাঠালেন।

স্বাতি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল: এ দেশের সাহিত্য কি শুধু কবিতা নিয়ে?

ভদ্রলোক বললেন: কতকটা তাই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কী রকম?

উপন্যাস নেই, কিছু নাটক ও ছোট গল্প আছে। নাদিম ও রোশন লিখেছেন, লিখেছেন মজহুর ও হারুন। কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা সেগুলি খুব উচ্চাঙ্গের বলে মনে করেন না।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: গদ্য সাহিত্য?

ভদ্রলোক অসংশয়ে স্বীকার করলেন: উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ছে না।

একে একে যাত্রীরা এসে জড়ো হতে লাগলেন। জানা গেল যে

বাস ছাড়তে আরও কিছু দেরি আছে। যাত্রীরাও সবাই এখনও ফেরে নি।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন যে তিনিও আমাদের সঙ্গে আসবেন। কিন্তু এখনও এসে পৌঁছন নি। কিংবা অন্য কোনখানে অপেক্ষা করছেন। শম্পাদেরও দেখতে পাই নি। সময় মতো তারা এসে পৌঁছবে কিনা তাও জানি না।

স্বাতি বলে উঠল: তাহলে কাশ্মীরের নাচগানেব কথা কিছু বলুন।

ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন, বললেন: সর্বনাশ! অনধিকার-চর্চা আমাকে করতে বলবেন না!

স্বাতি হেসে বলল: আপনাকে তো নাচতে কিংবা গাইতে বলছি না যে ভয় পাচ্ছেন! নাচগান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বাঙলায় বলল: দেখ, তোমাকে কত সাহায্য করছি।

সত্যিই তাই। যে কথা বইএর পাতায় লেখা নেই, সে কথা জানবার আর উপায় কী আছে! ভুল হোক, অসম্পূর্ণ হোক, তবু তো কিছু জানা যাবে।

প্রফেসর পণ্ডিত ফাঁপরে পড়েছিলেন। বললেন: আপনারা যে আবার কাশ্মীরী নাচগানের কথা শুনতে চাইছেন কিনা, তাইতেই মুশকিল। কোন্‌টা জাতে কাশ্মীরী, আর কোন্‌টা নয়, তা তো জানি নে।

আমি বললুম: যা জানেন, তাই বলুন।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন: নৃত্যশিল্পের উপর ভাল বই আছে বলে শুনেছি। অনেকেই বই লিখেছেন। তার মধ্যে একজনের নাম আমার মনে পড়ছে।

কী নাম?

অভিনব গুপ্ত। ভারতীয় নৃত্যের উপর তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। শুনেছি সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এ দেশে নৃত্যের চরম

উৎকর্ষ হয়েছিল। সে সব ঐতিহাসিক কথা আপনাদের বলতে পারব না।

স্বাতি বলল : এ কালের কথাই বলুন।

গত কয়েক বছর থেকে গ্রামের লোকনৃত্যকে শহরে টেনে আনবার চেষ্টা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে নানা স্থানের লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তারই জন্যে মহড়া কিনা বুঝতে পারি না। তবে সম্প্রতি শহরে বসেই হিকৎ ও রাউফ নৃত্য দেখেছি।

এর পরে প্রফেসর পণ্ডিত এই দুই নাচের কথা সংক্ষেপে বললেন। হিকৎ নাচ খুবই সাধারণ। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে জোড়ায় জোড়ায় নাচে। কোন বাজনা নেই, নিজেরাই সুর করে গান গায়, আর নাচে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে ঘুরে। প্রথমে দু হাত ধরে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারপরে পিছনে কাত হয়ে হেলে পড়ে, আর ঘুরপাক খায় এই অবস্থাতেই। এক জোড়া দু জোড়া নয়, অনেক জোড়ায় নাচ। নৃত্যের তালে তালে তারা এমন জোরে ঘুরপাক খায় যে শেষে আর তাদের মুখ চেনা যায় না।

রাউফ নাচ শুধু মেয়েদের। আর একেবারে অন্য ধরনের। এই নাচে দশ পনরটি মেয়ে পাশাপাশি এক লাইনে দাঁড়াবে কাঁধে হাত দিয়ে। ঠিক তাদের মুখোমুখি আরও দশ পনরটি মেয়ে একই ভাবে দাঁড়াবে। তারা খুব ধীরে ধীরে দু তিন পা এগোবে, আবার পিছিয়ে আসবে। কোন বাজনা নেই, সুর করে নিজেরাই গান গাইবে। একবার এক দল, তারপরে আর এক দল। তাদের ধান কাটার উৎসব আছে, গান আছে ফসল কাটার, আরও অনেক পর্বের গান আছে। উন্মুক্ত ক্ষেতে কিংবা নদীর তীরে তারা দল বেঁধে নাচবে। মনে হবে যে কাশ্মীরের উপত্যকায় বইছে ধীর গতির ঝিলম নদী, জনগণের জীবনের মতোই শান্ত ও সুন্দর। রঙ্গমঞ্চে ভাল না লাগলেও ঝিলমের তীরে কিংবা মোগল উদ্যানে আপনাদের ভাল লাগবে।

স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপর জম্মুর ডোগ্‌রা নাচ। পুরুষেরা এই নাচ নাচে উন্মত্ত সৈন্যের মতো। পাঞ্জাবের ভাঙরা নাচ দেখেছেন ?

নমুনা দেখেছি।

সেই রকমই। উজ্জ্বল পোশাক পরে মেলায় ও উৎসবে ডোগ্‌রা পুরুষেরা এই নাচ নাচে প্রবল শব্দে ঢোলক বাজিয়ে। জম্মুর চারি পাশের পাহাড়ী অধিবাসীরা এক রকমের নাচ নাচে রাতে একটা আগুনকে ঘিরে। বাজনা শুধু ঢোল আর শাঁক। উজ্জ্বল পোশাক পরা পুরুষদের এই নাচ দেখতে দেখতে নিজেও নেমে পড়তে ইচ্ছা করে।

প্রফেসর পণ্ডিত একটু থেমে বললেন : ভাঙরা নাচের পোশাকের সঙ্গে ডোগরা নাচের পোশাকের অনেক তারতম্য আছে। ভাঙরা নাচের পোশাক অনেকটা মুসলমানী ঢঙের, আর ডোগ্‌রাদের পোশাক হিন্দু রাজাদের মতো। ভাঙরা নাচে পুরুষেরা রঙীন লুঙ্গি আর সাদা কামিজ পরে, তার উপরে একটা রঙীন ওয়েস্টকোট, মাথায় বাঁধে এক টুকরো রঙীন কাপড়। ডোগরা নাচে তারা আচকানের মতো পোশাক পরে পা পর্যন্ত লুটনো, কোমরে রঙীন কাপড়, আর মাথায় উষ্ণীষ দেওয়া পাগড়ি।

ভদ্রলোককে থামতে দেখে স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপরেও বলতে হবে ? তাহলে একবার লাদাখে যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে।

কেন ?

লাদাখীদেরও এক রকমের মুখোশ পরা নাচ আছে শুনেছি।

সত্যি নাকি !

লাদাখে তো যাই নি কখনও, সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না। লোকে বলে যে সেই নাচে পনর কুড়িজন লামা প্রথমে কালো টুপি পরে এসে কাঁখের কলসী থেকে জল ছিটিয়ে যায়। তারপরে এক দল

লোক আসে আধা মানুষ ও আধা দৈত্যের সাজে। তারা এসে মানুষের মুক্তির পথে বীভৎস ভাবে বাধা দেয়। কিন্তু পারে না। আর এক দল সুদর্শন লোক এসে যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

স্বাতি বলল : বেশ ভাব তো!

সত্যিই একটা সুন্দর ভাব আছে। মানুষের মধ্যে আছে ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব। অনেক সময় মন্দ প্রবল হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোর কাছে হেরে যায়। সাধারণ লোকনৃত্যের মধ্যে এই রকমের ভাব দেখা যায় না।

নাচের কথার পরে গানের কথা কিছু শোনা হল না। বাহিরে কলরব শুনে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের বাস ছাড়বার সময় হয়েছে। খবর পেয়ে যাত্রীরা একে একে উঠে পড়লেন।

অন্য বাস ছাড়বে আমাদের পরে। দূরে মিসেস চৌধুরীকে দেখতে পেলুম। ডাণ্ডি থেকে নেমে তিনি সতৃষ্ণ নয়নে গুলমার্গের পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলুম যে শম্পারা এখনও আসে নি।

যথাসময়ে আমাদের বাস ছেড়ে দিল।

২৪

সকাল বেলায় স্বাতি বলল : আজ আমাদের ছুটি, আজ আমরা কোথাও বেরব না।

আমি বললুম : কেন, পাহাড়ে উঠে পায়ে ব্যথা হয়েছে নাকি ?

রোজ বেড়াতে বেরলে কাশ্মীর যে খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে!

খাঁটি জিনিস ফুরোয় না, দাম তার চিরদিন সমান থাকে।

চা খেয়ে আমরা হাউসবোটের ছাদে উঠেছিলুম। আমি আর স্বাতি। মামী সালামাকে রান্না বোঝাচ্ছিলেন, আর মামা পাইপ ধরিয়ে মামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। স্বাতি একবার চারি দিকের দৃশ্য দেখে নিয়ে বলল : এই খাঁটি জিনিস কি বেশি দিন ভাল লাগবে!

চিরদিন ভাল লাগবে, এমন জিনিসও সঙ্গে আছে।

তাই তো, সে কথা যে ভুলেই গিয়েছিলুম। কাল সন্ধ্যায় শম্পা ফিরেছে তো!

নিজেদের প্রসঙ্গ স্বাতি এমনি করেই এড়িয়ে যায়। তার দোষ দিই না। অনুরাগে জীবন হয় রঙীন, ভোগে মলিন হয়ে যায়। প্রেম যত দিন হৃদয়ে গোপন করা যায় তত দিনই তা অনুরাগ, তার মাধুর্য থাকে অক্ষুণ্ণ। দিনের প্রখর আলোয় প্রেম ভোগের বাসনায় পরিণত হয়। প্রেমের সে রূপে নেই স্বর্গের সুষমা। স্বাতি ভয় পায় তাকে। সেই জন্যেই নিজের মনকে সে নিজের কাছেই সযতনে লুকিয়ে রাখে। আমি সহাস্যে তার কথার উত্তরে বললুম : শম্পা নয়, তার অন্য নাম।

সে নাম স্বাতি জানতে চাইল না, বলল : আমি শম্পার কথা ভাবছি। গুলমার্গ থেকে কি কাল তারা ফেরে নি!

মিসেস চৌধুরী ফিরেছেন।

তুমি দেখেছ তাঁকে!

বললুম ঃ টেঙ্গমার্গের বাস স্ট্যাণ্ডে দেখেছি, তিনি নিশ্চয়ই গুলমার্গে আবার ফিরে যান নি।

কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কী আছে! শম্পারা যদি গুলমার্গে রাত কাটায়, তাহলে আমাদের ক্ষতি কী!

এ কি অন্যায় নয়!

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমার মনে পড়ল। তার স্ত্রী বর্তমান। সেই মহিলা নিজের স্বামীকে না পেয়ে দেবতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন, আর স্বামী তাঁকে পাগল ভাবছেন। শুধ্ ভাবছেন নয়, সবার কাছে তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। তাও ক্ষমা করা চলে, কিন্তু আর একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করাব চেষ্টাকে সমর্থন করা চলে না।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ কথা বলছ না যে!

বললুম ঃ বলবার তো কিছু নেই!

শম্পাকে তুমি সমর্থন কর?

ওরা তো আমাদের প্রশ্রয়ের অপেক্ষা রাখে না!

ওরা বোলো না, আমি ঐ মেয়েটার কথা বলছি। কেন সে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমন প্রশ্রয় দিচ্ছে!

আমি হেসে বললুম ঃ লোকে যে তোমার সম্বন্ধেও এই অভিযোগ করে!

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল ঃ আর করবে না।

কেন?

তোমাকে ঐ ডাল লেকের জলে ডোবাব।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি এই হাসিতে যোগ দিতে পারলুম না। পিছনে আমি

পায়ের শব্দ শুনেছিলুম, মুখ ফিরিয়ে মামীকে দেখতে পেলুম। তিনি বোধহয় একটু পিছিয়ে গিয়েছিলেন, আমাকে তাকাতে দেখে বললেন: তোমাকে ডাকতে এসেছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: কে?

মামী বললেন: মিসেস চৌধুরী শম্পাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

স্বাতি বলল: ওরা ফিরেছে তাহলে!

ফিরেছে বৈকি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা হোটেলে চা খেতে ঢুকেছিল। তাইতেই দেরি হয়েছে।

তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: এস, তোমার জন্যে ওঁরা অপেক্ষা করছেন।

বলে আর দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে সরে এসে বলল: আমার একটা কথা রাখবে গোপালদা?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম: বল।

স্বাতির চোখের পাতায় বেদনার ছায়া নেমেছিল। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল কিনা দেখতে পাই নি, শুনলুম তার অসহায় কণ্ঠস্বর। বলল: শম্পাকে তুমি বিয়ে কর গোপালদা।

আমি তার অনুরোধ শুনে চমকে উঠলুম। এ আবার কোন্ স্বাতি! এ কোন্ ছলনা তার! গভীর ভাবে তার দিকে তাকিয়েও মনের হদিস পেলুম না। বললুম: এস।

নিচে বসবার ঘরে মা মেয়ে বসে ছিলেন। মেয়ের মুখ গম্ভীর, মা কথা কইছিলেন মামার সঙ্গে। আমরা এসে পৌঁছতেই মিসেস চৌধুরী বলে উঠলেন: কাল কী ভাবনাতেই পড়েছিলুম! হোটেলে চা খেতে ঢুকে কি কেউ সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলে!

বাধা দিয়ে শম্পা বলল: এ সব আবার কেন বলছ!

মিসেস চৌধুরী বললেন: আমার অবস্থাটা এঁরা কাল দেখেছেন কিনা, তাইতেই বলছি।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন : আজ বেরোবেন না কোথাও ?

বললুম : আজ আমাদের ছুটি, আজ আমরা কোথাও বেরব না।

মিসেস চৌধুরা বললেন : শম্পা আজ শিকারায় বেড়াবে বলে বেরিয়েছে, ওর সঙ্গে ঘুরে আসুন না খানিকটা। ততক্ষণ আমি মিস্টার গোস্বামীর সঙ্গে গল্প করি।

এ প্রস্তাব শুনে মামা খুশী হলেন না, কিন্তু স্বাতি বলে উঠল : যাও না গোপালদা, একটু বেড়িয়ে এস। ঘরে একা বসে কী করবে !

আর তুমি ?

আমি মাকে একটু সাহায্য করব।

শম্পা একবার স্বাতির মুখের দিকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপরে বলল : আসুন।

বলে বাহিরে বেরিয়ে শিকারায় গিয়ে উঠল। আমি একবার স্বাতির দিকে আর একবার মামার দিকে তাকিয়ে তার অনুসরণ করলুম।

হাউসবোটের সিঁড়িতে বসে শিকারাওয়ালা বিড়ি টানছিল। আমরা বসতেই সে শিকারা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর দাঁড় বেয়ে চলল ডাল লেকের দিকে।

শম্পা অনেকক্ষণ কোন কথা কইল না। আমিও নিঃশব্দে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। শম্পা বোধহয় ভেবেছিল, আমি কিছু বলব। কিন্তু আমার সাড়া না পেয়ে নিজেই বলল : মা আপনাকে কিছু বলেছেন ?

কী সম্বন্ধে বলুন তো !

আমার বিয়ের সম্বন্ধে ?

সে কথা আমাকে বলবেন কেন !

তবে আমার সঙ্গে আপনি একা এলেন কেন ?

আপনি ডাকলেন বলে চলে এলুম।

কী ভাবলেন আপনি ?

ভাবলুম, আপনার একজন সঙ্গীর দরকার।

শম্পা বলল: সঙ্গী তো শিকারাওয়ালাই ছিল। আপনি কি তার চেয়ে ভাল সঙ্গী?

শম্পা যে আমাকে আঘাত করবে আমি জানতুম। তাই দৃঢ় ভাবে উত্তর দিলুম: শুধু শিকারাওয়ালার চেয়ে নয়, মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়েও ভাল সঙ্গী।

কী বললেন?

বললুম: সঙ্গী সেই ভাল যে সঙ্গ দেয় বিনা মতলবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কোন মতলব নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে বার হই নি।

বন্দ্যো কি কোন মতলব নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়েছেন?

যে কথা আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন, সে কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন। তার চেয়ে অন্য কোন কথা বলুন, কিংবা গান করুন। অনেক দিন ভাল গান শুনি নি।

আপনি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন?

গান কি তামাসার জিনিস! না, তামাসা গানের বিষয়!

শম্পা এ কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইল। আমি কী বলব তাই ভাবতে লাগলুম।

আমরা একটি সুন্দর বাগানের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন শিকারাওয়ালা বলল: এরই নাম নেহরু পার্ক।

সত্যি একটি সুন্দর বাগান। দ্বীপের মতো একটি ছোট জায়গায় ফুলের বাগান। অনেকগুলি বসবার জায়গা। সামনের রাস্তায় এসে টাঙ্গা দাঁড়াচ্ছে। সেইখানেই ঘাট। শিকারা অপেক্ষা করছে যাত্রীর জন্য। তু আনায় পার করে দেবে। অনেকে এই পার্কের বেঞ্চিতে বসে শ্রীনগরের সকালটি উপভোগ করছেন। বাগানের পিছনে একটি লম্বা বাড়ি, বোধহয় কোন রেস্টরেণ্ট। বাহির থেকে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আমরা এগিয়ে গেলুম।

এর পরেই দৃশ্য সহসা পরিবর্তিত হয়ে গেল। চোখের সামনের জলধারা আর অপ্রশস্ত নয়, বিস্তীর্ণ জলরাশি দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে আছে এবং নীল পাহাড় আছে তাকে সস্নেহে বেষ্টন করে। এরই নাম ডাল লেক, এরই জন্যে শ্রীনগর রমণীয়। আমরা যেখানে আছি, তা একটা খাল, তা দেখে এই লেকের সম্বন্ধে কোন ধারণা আমাদের হয় নি। এত বড় জলাশয় আমি এর আগে কখনও দেখি নি। এক দিকে দু মাইল, অন্য দিকে পাঁচ মাইল বিস্তৃত। জল কত গভীর তা এই ছোট শিকারায় বসে অনুমান করা যায় না।

দূরে দূরে আরও অনেক শিকারা দেখতে পাচ্ছি। কেউ বেড়াতে বেরিয়েছে, কেউ আসছে পণ্য দ্রব্য নিয়ে—শাক সব্জী ফুল। জেলেরা মাছ ধরছে কোনখানে। হাউসবোটের পাড়া যেন সহসা শেষ হয়ে গেছে। এখন দূরে দূরে হাউসবোট দেখতে পাচ্ছি। যে ধারে পাকা সড়ক, সে ধারে দু একটা বাড়িও দেখছি গাছের আড়ালে। অপর দিকে জলের পরে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের শিকারাওয়ালা কোন ধারে গেল না, চলল মাঝখান দিয়ে। ডাল লেকের ধার দিয়েই আমরা মোগল উদ্যানে বেড়াতে গিয়েছিলুম, কিন্তু বাসে বসে এই জলরাশির সমগ্র রূপ লক্ষ্য করি নি।

এই অবারিত উদার পরিবেশে এসে শম্পা আর নীরব থাকতে পারল না। বলল: কাল গুলমার্গে আমরা কোথাও যাই নি। দুপুরে বিশ্রামের জন্য একটা হোটেলে ঢুকেছিলুম।

আমি হেসে বললুম: ভাল করেছিলেন।

শম্পা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: কেন?

ঘরের ভিতরে নরম বিছানায় শুয়ে যেমন বিশ্রাম হয়, বাইরে গাছের তলায় গড়িয়ে কি তা হয়!

শম্পা এবারে আশ্চর্য হয়ে বলল: বন্দ্যো যে আমার সঙ্গে ছিল আপনি জানেন না?

আমাকে ক্ষমা করবেন, এ ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই।

কেন ?

এ আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্যের তাতে কৌতূহল থাকা অসঙ্গত।

শম্পা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল : মা আপনাকে কী বলেছেন জানি নে, তবে আমারও কর্তব্য আপনাকে কিছু জানিয়ে রাখা। বন্দ্যোকে আমি ভালবাসি এবং তার সঙ্গে—

কথাটা শম্পা শেষ করতে পারল না।

আমি বললুম : ভালবাসলে আর কোন দোষ নেই। ভালবাসার স্পর্শে পঙ্কিল জীবনও পবিত্র হয়ে যায়। জীবনের পরশমণি হল ভালবাসা।

শম্পা আমার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। তাকে অভিভূত দেখে বললুম : রবীন্দ্রনাথ খুব প্র্যাক্‌টিকাল ছিলেন না, তাই লাবণ্যর সঙ্গে অমিত রায়ের বিয়ে দেন নি। আর বঙ্কিমচন্দ্র—

বাধা দিয়ে শম্পা বলল : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে বন্দ্যো বিবাহিত, আর তার স্ত্রী এখনও জীবিত।

বললুম : আপনি শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে পড়েন নি ? মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায় তো কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁর এতে বিচলিত হবার কী আছে !

তাঁর স্ত্রী কী বলেছে জানেন ?

আমার জানবার কথা নয়।

বলেছেন, তার আগে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে মরবেন।

ছি ছি, এ তাঁর এ কালের মেয়ের মতো কথা হয় নি। তাঁর ভাল না লাগলে তিনিও তাঁর পছন্দ মতো কিছু করবেন, এইটাই স্বাভাবিক। কলকাতায় ফিরে আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

পাগল হয়েছেন ! আমাকে সামনে পেলে তিনি আমাকে খুন করে ফেলবেন।

না না, তা করবেন না। শুনেছি তিনি সারাক্ষণ পূজো আর্চা নিয়ে থাকেন। হয়তো একটা ফুলের মালা আপনার গলায় পরিয়ে দেবেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে শম্পা বলে উঠল : আপনি আমার সঙ্গে এতক্ষণ তামাসা করছেন !

আমি বললুম : এই দেখুন বিপদ ! সরল ভাবে কোন কথা বলবার উপায় নেই।

এর পরে শম্পা আর কোন কথা কইল না, দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার চোখের সামনে একটি ছোট দ্বীপ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। তার চার কোনায় চারটি চিনার গাছ, মাঝে কয়েকটি ছোট ছোট চালাঘর। গাইড বইএ আমি এই চার চিনার দ্বীপের ছবি দেখেছি। ডাল লেকের এটি উত্তর দিক, এরই উল্টো দিকে আকবর বাদশাহর নাসিম বাগ।

এক সময় আমাদের শিকারা এসে চার চিনারের ঘাটে লাগল। আমরা নিঃশব্দে নেমে পড়লুম। ভারি স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। সূর্যের তাপে কোন স্থান উত্তপ্ত হয় নি, শুধু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে খানিকটা এগিয়েই আমি চমকে উঠলুম। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললুম : আপনি !

ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করে বললেন : চমকে উঠলেন কেন ?

কেন চমকে উঠেছি তা তাঁকে বোঝাতে পারব না। পাশে তাঁর স্ত্রী জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। তিনি হয়তো কিছু বুঝে থাকবেন। তবু তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলুম সহজ ভাবে, বললুম : না না, চমকাব কেন ! এমন সকালে এসে এখানে বসেছেন, তাই আশ্চর্য লাগছে।

বললুম না যে তাঁর গায়ে গরদের পাঞ্জাবি দেখেই চমকেছি। তাঁর স্ত্রীও সিল্কের শাড়ি পরেছেন। কারও গায়ে গরম জামা নেই, হাতেও নেই কোন গরম কাপড়।

শম্পা বলল : এঁরা আপনার পরিচিত বুঝি ?

বললুম : খুব পরিচিত।

এঁরা আমাদের সঙ্গে পাঠানকোট থেকে এসেছেন একই বাসে।

বাসে উঠবার আগেই এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক পুরো হাতা সোয়েটারের উপরে গলাবন্ধ কোট পরেছিলেন, হাতে দস্তানা আর মাথায় বালাক্লাভা টুপি পরেছিলেন বানিহালে। পরনে ছিল ভারি ফ্লানেলের প্যান্ট। তাঁর তরুণী স্ত্রীর গায়েও একটা ওভারকোট ছিল। জম্মুতে দুপুরের গরমে তাঁদের কষ্ট হয় নি। অথচ এই সকালে যখন শিরশিরে হাওয়া বইছে, তখন তাঁরা একখানা হাল্কা চাদর নিয়েও বের হন নি।

ভদ্রলোক বললেন: আপনি আবার খদ্দরের জামা পরে বেরিয়েছেন, গরম লাগছে না আপনার?

এবারে সাহস পেয়ে আমি হেসে বললুম: আপনি সব খুলে ফেললেন কেন?

না খুলে আর উপায় কী! ডাক্তার সব খুলিয়ে ছাড়ল।

বলে তাঁর স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপরে বললেন: ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার বললেন, গরম জামা কাপড় খুলে ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে বেড়ান, ওষুধের দরকার নেই এখন দেখছি বেশ ভালই আছেন।

তাইতো দেখছি।

বলে আমরা এগিয়ে গেলুম।

ভদ্রলোকের মন্তব্য শুনলুম পিছনে: বেশ জুটিয়ে নিয়েছেন।

শম্পাও শুনতে পেয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল একটা মুহূর্তের জন্য। তারপরে আবার চলতে লাগল। অপমানে তার কানের দু পাশ যে লাল হয়ে উঠেছিল, আমার দৃষ্টি তা এড়াল না।

চার চিনার থেকে আমরা নাগিন লেকের দিকে যাত্রা করলুম।

শম্পা আমার সঙ্গে এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি। এবারে আমি তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলুম। বললুম: ওদের কথা শুনে আপনি রেগে গেলেন, কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না।

শম্পা বলল: বেশ বলছেন। গায়ে পড়ে তার অপমান করবার

দরকার ছিল, আর সেই অভদ্র মন্তব্য শুনে আমার রাগবার দরকার নেই !

রাগলেই তো আমরা হেরে গেলুম। ওরা বলবে, কথাটা সত্যি কিনা, তাই অমন গায়ে লেগেছে।

মিথ্যে বলে চুপ করে থাকব, বেশ যুক্তি আপনার !

তবে চলুন, ফিরে গিয়ে ওদের আক্রমণ করি। ঐ মহিলা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, না উনিও দেশ থেকে জুটিয়ে এনেছেন !

শম্পা আশ্চর্য হয়ে বলল : ওঁরা তো আপনার পরিচিত বললেন !

যেমন আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জলের উপর শিকারায় আপনাকে প্রথম দেখেছি, আর ওঁদের দেখেছি শ্রীনগরে আসবার সময় বাসে। ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা আজই প্রথম হল।

এই আপনার ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা !

পথের পরিচয় তো এই রকমই হয়। এই যে আপনার সঙ্গে আজ বেড়াতে বেরিয়েছি, এ কথা চির দিন মনে থাকবে। কাজের সময় হয়তো মনে পড়বে না, কিন্তু অলস অবসরের সময় ঠিক মনে পড়বে।

কোন কথা না বলে শম্পা আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম : আপনারই মতো আর একটি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ছে। সে দিল্লীর মেয়ে। সামান্য পরিচয় হবার পর সে একদিন আমাকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওখলায়। সেখানে সারা দিন তার সঙ্গে নানা কথা হয়েছিল। আপনার মতো সেও আমাকে বলেছিল যে সে আর একজনকে ভালবাসে, কিন্তু তাকে বিয়ে করবে না।

কেন ?

তাদের মতের মিল নেই।

তার পর ?

কাশ্মীরে আসবার আগে জেনে এলুম, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

তাহলে এখন মতের মিল হয়েছে বলুন।

হেসে বললুম: স্বাতি অঙ্ক কষে তাদের মতের মিল দেখিয়ে দিয়েছে।

সহসা শম্পা একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বলল: স্বাতির বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

কাউকে ওর পছন্দ হচ্ছে না। ওকে যারা ভালবাসে, তাদের ও পছন্দ করে না। আর ও ভালবাসে যাকে, তাকে সকলে অপদার্থ ভাবে। স্বাতি এ কথা মেনে নিয়ে বলেছে, বিয়েটা তাহলে থাক।

সে কি!

তার আইডিয়া মন্দ নয়। বিয়ের দরকার তো শুধু সংসার করবার জন্যে, ভালবাসবার জন্যে নয়। দূর থেকেই যদি ভালবাসা যায় তো ঝামেলা করে সংসার পাতবার কী দরকার! তারা সুখেই আছে।

শম্পা গম্ভীর হয়ে ভাবল অনেকক্ষণ, তারপর বলল: জীবনটা যে নষ্ট হয়ে যাবে!

বললুম: তাহলে আবার সেই রবীন্দ্রনাথের কথা। লাবণ্য অমিত রায়কে বিয়ে করে নি, করেছিল আর একজনকে। অমিতও তাই করেছিল। তাদের জীবনও নাকি ব্যর্থ হয় নি। এ তো তার চেয়ে ঢের ভাল। দুজনে দুজনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু আপনি তো ওদের সব কথা জানেন, আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না?

পারি কি পারি নে, তা ভেবে দেখি নি। তবে স্বাতির মতের সঙ্গে আমার একটুও অমিল নেই। দেহকে বাদ দিয়ে যে প্রেম তা খাঁটি, লালসা প্রেম নয়। মনে মনে যে মিলন তার মৃত্যু নেই, দেহের মিলন হয় ক্ষণস্থায়ী।

শম্পা বাধা দিয়ে বলল: আপনি সেকেলে পণ্ডিতের মতো কথা কইছেন।

বললুম: কথাটা পুরনো, কিন্তু সত্য কথা। কিছু দিন পরে এ

কথা আপনি স্বীকার করবেন। সে দিন আসতে বেশি দেরী নেই।

আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

আপনাকে ভয় দেখিয়ে তো আমার কোন লাভ নেই, ভয় না পেলেও নেই ক্ষতি। তার চেয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমরা এই এক সঙ্গে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

ডাল লেকের মাঝখান থেকে আমরা পারের দিকে চলে এসেছিলুম। এ একটা নতুন দিক। জলা জায়গার মতো মনে হচ্ছে। চারি দিকে পদ্মের ডাঁটা আর পাতা, ফুল নেই একটাও। ঝরাফুলের বীজ কেটে বিক্রি হচ্ছে। ছাড়িয়ে ভিতরের চাল খেতে হয়।

এক জায়গায় আমরা ফ্লোটিং গার্ডেন দেখলুম। ডাল লেকের মাঝখানের গভীরতা দশ ফুটের কিছু বেশি। এ সব জায়গায় অনেক কম। পারের কাছে পুরু শ্যাওলা জড়ো করে তার উপরে মাটি ফেলে সব্জীর চাষ হয়েছে। একটা দুটো নয়, এ অঞ্চলে এ রকমের অনেক ভাসমান বাগান আছে। অনেক শাকসব্জী হচ্ছে এই সব বাগানে।

ফ্লোটিং গার্ডেন দেখানো শিকারাওয়ালাদের একটা কর্তব্য কর্ম। তাই পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে নৌকো থেকে লাফিয়ে সেই বাগানে উঠল। তার পায়ের চাপে বাগান দুলল, আর জল উঠল অল্প। এক জায়গা থেকে গোটা কয়েক মটরশুঁটি সংগ্রহ করে আবার নৌকোয় ফিরে এসে বলল: খেয়ে দেখুন।

আর এক জায়গায় আমরা হাট বসেছে দেখলুম। জলের উপরে হাট। অসংখ্য ডিঙ্গিনৌকোর উপর নানা রকমের শাকসব্জী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কেউ বেচতে এসেছে, কেউ এসেছে কিনতে। সবাই নিজেদের নৌকোয় চেপে এসেছে। কলরব করে কেনা বেচা হচ্ছে। আমরা তাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলুম।

এক সময় আমি শিকারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম: আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

সংক্ষেপে সে বলল: নাগিন লেক।

এই নাগিন লেক ডাল লেকেরই একটা অংশ, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত। সেখানে পৌঁছে মনে হল যে এ জায়গা আরও নিরিবিলি, আরও সুন্দর। হ্রদের জল আরও স্বচ্ছ, আরও গভীর। দূরে দূরে অনেকগুলি শৌখিন হাউসবোট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিকারাওয়ালার কাছে শুনলুম যে বিদেশী সাহেব মেমরা নাগিন লেকে থাকতেই বেশি ভালবাসেন। তাঁরা এখানে স্নান করেন, মাছ ধরেন, আর সার্ফ রাইডিং নামে একটি মজার খেলা খেলেন। ডাল লেকেও এক দিন আমি সার্ফ রাইডিং দেখেছিলুম।

পথে আমরা হরিপর্বত দুর্গ আর হজরতবাল মসজিদ দেখেছিলুম। শিকারা থেকে নামি নি। দূর থেকেই দেখেছিলুম। হরিপর্বত খুব উঁচু পাহাড় নয়, শ চারেক ফুট হবে। তার উপরে দুর্গ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আট্রা মুহম্মদ খান নামে একজন পাঠান শাসন-কর্তা এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুর্গের চারিধারে আটাশ ফুট উঁচু একটা প্রাচীর আছে, লম্বায় মাইল তিনেক হবে। কয়েকটি প্রাচীন দুর্গদ্বার আছে। আকবর বাদশাহর তৈরি বলেও অনেকে মনে করেন। এই দুর্গ দেখার অনুমতি পত্র পাওয়া যায় টুরিস্ট অফিসে।

হজরতবাল মসজিদ নাসিম বাগ থেকে কয়েক শো গজ দূরে। ডাল লেকের এটি পশ্চিম তীর। এতবড় মসজিদ কাশ্মীর রাজ্যে আর নেই। হজরত মুহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষিত আছে বলে এটি মুসলমানদের একটি তীর্থ স্থান।

শিকারাওয়ালাকে প্রশ্ন করলে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। শিকারাওয়ালা নিজে থেকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেছে। শম্পা এ সব পছন্দ করে না। এমন ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল যে সে আর কথা বলতে চেষ্টা করে নি। আজকের জগতে ওরা ছোটলোক, ওদের সঙ্গে কথা কইলে শম্পাদের জাত যায়। আমি তাই তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

ফেরার পথে শম্পা জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছেন?

বললুম : একটা দুঃস্বপ্নের কথা ভাবছি।

স্বপ্নের কথা আপনার মনে থাকে?

স্বপ্ন নয়, কাল জেগে জেগেই ব্যাপারটা দেখেছিলুম। রাত তখন অনেক হয়েছে, ঘুম আসছিল না। পাশের হাউসবোট থেকে এক ফালি আলো জানালা দিয়ে ঘরে এসেছিল। সেই আলোয় একটা মাকড়শার জাল দেখলুম, আর একটা মাকড়শা।

এ আবার এমন কি ঘটনা!

গল্প এইখানেই শেষ হলে আপনাকে বলতুম না। গল্পের শুরু এইখান থেকে।

তবে তাড়াতাড়ি বলুন।

বললুম : সেই মাকড়শার জালে একটা ছোট প্রজাপতি পড়েছিল, আর মাকড়শাটা তাকে ধরবার জন্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। রুদ্ধ শ্বাসে আমি তাদের দেখছিলুম। নিরীহ প্রজাপতিটা যে উড়ে পালিয়ে যাবে, সে ক্ষমতা নেই। করুণ চোখে মাকড়শার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর?

তারপর আমি দেখলুম, সেই মাকড়শার মুখটা বড় হচ্ছে। বীভৎস মুখ। কিন্তু সেই মুখখানা যেন আমার চেনা চেনা, কবে কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পারলুম না। আচ্ছা, আপনার বাঁ দিকের গালে কি একটা তিল আছে?

আছে। আপনি কি সেই মাকড়শার গালে—

না না, তা নয়।

তবে হঠাৎ—

এমনিই জিজ্ঞেস করলুম।

এর পরে শম্পা আর কোন কথা কইল না।

২৫

সকাল নটায় আমরা উলার লেক দেখতে যাত্রা করলুম। বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে চলেছেন। স্বাতি তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

নাগিন লেক থেকে ফিরে এসে কাল আমি স্বাতিকে দেখতে পাই নি। মামী ব্যস্ত ভাবে তার অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে ফিরতে দেখে বললেন : স্বাতির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

স্বাতি একা বেরিয়েছে নাকি?

না, একা নয়। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে।

শম্পা আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মামীর মুখে বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনে জিজ্ঞাসা করল : কী বললেন?

মামী বললেন : ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছিলেন তোমাকে না পেয়ে স্বাতির সঙ্গে বেরিয়েছেন।

কোথায়?

তা তো জানি নে।

শম্পা ফিরে গিয়েছিল। স্বাতি ফিরেছিল তারও কিছু পরে বলেছিল যে বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে উলার লেক দেখতে যাবে।

বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামীর ভাল লাগে নি। ভদ্রলোকের বয়স একটু বেশি, কিন্তু চঞ্চল। তাঁর অতিরিক্ত সাহেবিআনাও একটু দৃষ্টিকটু। তাই এই ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হবেন শুনে মামী খুশী হন নি। বলেছিলেন : ও আবার আমাদের সঙ্গে কেন?

স্বাতি বলেছিল : কেন, বেশ তো ভদ্রলোক।

মামী এ কথার আর উত্তর দেন নি।

সকালবেলার চা খেয়ে আমরা টুরিস্ট অফিসে এসেছিলুম

দুপুরের খাবার ছিল সঙ্গে। এ যাত্রায় খাবার নিতেই হবে। পথে কোন হোটেল নেই, ডাকবাংলো নেই, এমন কি খাবার দোকানও বোধহয় নেই। তাই বাসের সকলেই খাবার নিয়ে উঠেছিলেন।

এ পথেও অনেক কিছু দেখবার আছে। শুনলুম, সে সব যাবার পথে নয়, ফেরার পথে। মানসবল লেক ক্ষীরভবানী ও গান্ধারবল কিছু দিন আগে এই বাস সোজা বারামূলা যেত। শহিদ শেরওয়ানীর স্মৃতিস্তম্ভের সামনে থামত পনর মিনিট। এখন আর সেখানে যাবার উপায় নেই। পথ আছে, কিন্তু যাবার অনুমতি নেই। পরশু যে পথে আমরা গুলমার্গে গিয়েছি, সেই পথেই যাত্রা। ঝিলম নদীর পুল পেরিয়ে পরিচিত পথে আমরা অগ্রসর হলুম।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মামী আমাকে আড়ালে বলেছিলেন: ওর বয়স নিশ্চয়ই অনেক হয়েছে, ছোটখাটো চেহারা বলে বোঝা যাচ্ছে না। বয়স কম হলে কি শম্পার মা ওকে পছন্দ করতেন না!

আমি এ কথার উত্তর দিই নি। মামীই আবার বলেছিলেন: ওকে, না এনে শম্পাকে আনা উচিত ছিল। বেশ মেয়েটি। ওকে আমার ভারি ভাল লেগেছে।

আমি বলেছিলুম: ভাল বলেই ভাল লেগেছে।

খুশী হয়ে মামী বলেছিলেন: তোমারও ভাল লেগেছে, তাই না! ওর মাকে তাহলে জানিয়ে দিই। ভদ্রমহিলা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ব্যস্ত হবার কারণ আমি জানি, কিন্তু সে কথা আলোচনা করবার রুচি আমার ছিল না। কুলীনের বহু বিবাহের যুগ অনেক কাল গত হয়েছে, সে যুগ আর কোন দিন ফিরে আসবে না। দেশের সরকার বহু বিবাহের বিরোধী, সরকারী কর্মচারীর একাধিক বিবাহ অচল হয়ে গেছে। অথচ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে অজ্ঞান। ওরা কি মনে করছে যে মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই গলায় দড়ি দেবেন! বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ আমি পাই নি, পেয়েছে স্বাতি।

কিন্তু তাদের কী কথা হয়েছে তা আমাকে বলে নি। কী উদ্দেশ্যেই বা তাকে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে এনেছে, তাও সবার কাছে গোপন রেখেছে। শম্পার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম, তা গ্রহণ করি নি। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করলে ফল উল্টো হত বলে আমার ধারণা।

মামীর কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। শম্পার মা যে খুবই ব্যস্ত হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার যথার্থ পরিচয় পেলে এই ব্যস্ততা আর থাকবে না। তখন তিনি মামীর কাছে আর আসবেন না, যাবেন আর কারও কাছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে মামী এ কথা যেন বুঝতে পারছেন না, কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝছেন না। আমরা যেমন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় তাঁর কাছে লুকিয়েছিলুম, তেমনি আমার পরিচয়ও তিনি লুকোতে চাইছেন।

সকাল বেলায় হাউসবোট থেকে বেরিয়ে মামী বলেছিলেন: মিসেস চৌধুরীকে খবরটা দিয়ে যাই।

মামা বললেন: কোন্ খবর?

গোপালের যে আপত্তি নেই, সেই কথা তাকে জানিয়ে যাব।

কেন, গোপাল কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে!

তা কেন দেবে!

তবে ওকে নিয়ে কেন টানাটানি করছ! একা মানুষ, নির্ঝঞ্ঝাটে আছে, জীবনে আগে উন্নতি করুক, তারপরে ও সব কথা।

কাজেই মামী আর চেরিরাইপে যেতে পারেন নি, সোজা এসেছিলেন টুরিস্ট রিসেপ্‌সন সেণ্টারে। তারপর যথাসময়ে বাসে উঠে বসেছেন।

ন মাইলে আমরা গুলমার্গে যাবার মোড় দেখতে পেলুম, সতের মাইলে এলুম পাটন নামে একটা জায়গায়। বাস দাঁড়াল, এখানে আমাদের নামতে হবে।

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে কাশ্মীরের রাজা হয়েছিলেন অবন্তী-

বর্মার পুত্র শঙ্করবর্মা। তিনি তাঁর নিজের নামে নগর পত্তন করেন শঙ্করপুর। এই নগরের কোন নিদর্শন আজ নেই, শুধু দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। বাস থেকে নেমে আমরা সেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে পাশে আসছিল। জিজ্ঞাসা করল : এ কোন্ দেবতার মন্দির গোপালদা ?

সংক্ষেপে বললুম : মহাদেবের।

স্বাতি বলল : ইতিহাসে কি এ কথাও আছে !

ইতিহাসে নেই, আছে রাজতরঙ্গিণীতে। শিবের নাম শঙ্কর গৌরিশ ও সুগন্ধেশ। রাজার নাম শঙ্কর ও সুগন্ধা তাঁর রাণীর নাম।

বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : এমন অদ্ভুত নাম আপনি মনে রাখলেন কী করে !

মনকে শুধু মনে রাখতে বলি।

তাই কি রাখা যায় ! সব কথা মনে থাকলে একটা এন্‌সাইক্লো-পিডিয়া হয়ে যাবে।

আমি বললুম : মানুষের মন এন্‌সাইক্লোডিপিয়ার চেয়ে কম নয়। যত কথা মনে আছে, সব লিখে ফেললে ঐ রকমই বিরাট কিছু তৈরি হবে।

স্বাতি বলল : শঙ্করবর্মার সম্বন্ধে কিছু বল।

আমি বললুম : ইতিহাসের কথা কি ভাল লাগবে ?

বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাতির দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই লাগবে।

অবন্তীবর্মার মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র শঙ্করবর্মাকে রাজা করেছিলেন তাঁর সেনাপতি। মন্ত্রী যুবরাজ করলেন অন্যজনকে। তারপর রাজায় ও যুবরাজে বিবাদ হল। শেষ পর্যন্ত রাজারই হল জয়। শঙ্করবর্মা নানা দেশ জয় করবার পর এই নগর স্থাপন করেন, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরে বড় অত্যাচারী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু

হয়েছিল এক ব্যাধের বাণে। তিনি তখন নূতন রাজ্য জয় করে দেশে ফিরছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম: শঙ্করবর্মার চিতায় কারা সহমরণে গিয়েছিল সেকথা শুনে আশ্চর্য হবেন।

স্বাতি বলল: বোধহয় তাঁর রাণী সুগন্ধা।

তিনি সহমরণে যান নি। অন্য তিনজন রাণী, দুজন অনুচর ও দুজন ভৃত্য, এই সাতজন রাজার চিতায় উঠেছিলেন।

চোখ বড় বড় করে বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন: চারজন পুরুষ!

আমি হেসে বললুম: এরই নাম প্রভুভক্তি।

আমরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরের কারুকার্য দেখলুম। নিকটে একটি সরস্বতীর মন্দিরও ছিল। সে সব দেখে ফেরার পথে স্বাতি বলল: রাণী সুগন্ধা কী করেছিলেন?

তাঁর পুত্রকে রাজা করে রাজ্য শাসন করেছিলেন। আর যা করেছিলেন তা জানতে চেয়ো না, সে বড় নোংরা গল্প।

যাত্রীরা সবাই ফিরে এসে বাসে উঠতেই বাস ছাড়ল।

এর পরে বাস দাঁড়াল সোপুর নামে একটি গ্রামে। অল্পক্ষণ দাঁড়াবে, কিন্তু পথের ধারে সস্তায় আপেল বিক্রি হচ্ছে দেখে যাত্রীদের অনেকেই নেমে পড়লেন। আমাকে নামতে দেখে বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে স্বাতিও নামল।

গ্রামবাসীরা দলে দলে আপেল নিয়ে এসেছে। চক্ষের নিমেষে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। সকলের দাঁড়ি পাল্লাতেই এক এক সের আপেল। ফল তেমন ভাল নয়, কিন্তু দাম সস্তা। এক টাকা থেকে আট আনা সের পর্যন্ত নামল। অনেকেই কিনলেন, তাই দেখে আমরাও কিনলুম।

বাসে উঠে বসে স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: এ জায়গার কোন ঐতিহাসিক গল্প নেই?

বললুম: কাশ্মীরে আসবে জানলে রাজতরঙ্গিণী পড়ে আসতুম।

মামা বললেন : ও তো তোমার মুখস্থই আছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য হয়ে বললেন : সত্যি নাকি !

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : সোপুরের প্রাচীন নাম কী ?

বললুম : শূরপুর। রাজা অবন্তীবর্মার মন্ত্রীর নাম শূর, তিনিই এই নগর পত্তন করেছিলেন নবম শতাব্দীতে। বেহেৎ নদীর উভয় তীরে এই নগর। বেহেৎ বিতস্তারই নাম, এখন ঝিলম নামে পরিচিত। শ্রীনগরের ঝিলম নদী উত্তরমুখো গিয়ে উলার হ্রদে পড়েছে, তারপর হ্রদের দক্ষিণ থেকে আবার বেরিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছে। আমরা এখন উলার হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

স্বাতি বলল : আমাদের বইএ শূর নাম নেই, আছে সুয্য নাম।

বললুম : অবন্তীবর্মার সভায় সুয্য নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। সুয্যা নামে এক চণ্ডালী তাঁকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল। তিনি কোন নগর পত্তন না করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর— বিস্তুতার খাল কেটে বাঁধ বেঁধে সেতু তৈরি করে দেশের প্রভূত উপকার করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন : কী সাংঘাতিক ! এ সব কথা কি কোন ইতিহাসে আছে ?

এ সবই রাজতরঙ্গিণীর কথা।

বাস তখন উলার লেকের দিকে ছুটেছে। এই বিশাল জলরাশিকে প্রদক্ষিণ করবে পশ্চিম থেকে পূর্বে। উত্তর দক্ষিণে বারো মাইল, আর ছ মাইল পূর্ব পশ্চিমে। গভীরতা কোনখানে ত্রিশ ফুটের বেশি নয়। যে বছর বন্যা হয়, সে বছর আরও দু মাইল প্রস্থে বাড়ে।

ধীরে ধীরে আমরা পাহাড়ের উপর উঠে গেলুম। বাস থামল কয়েক জায়গায়। পাহাড়ের উপর থেকে উলার হ্রদের বিশাল বিস্তার দেখলুম। সুস্বাদু জলের এত বড় হ্রদ পৃথিবীতে আর নেই। এর এক দিকে পাহাড় নেই। সেই দিকে যখন বাস থামল, তখন আমরা জলের কাছে গিয়ে উলারের সৌন্দর্য দেখলুম। পাহাড়ের কোলে সে

এক অপরূপ দৃশ্য। আশ মিটিয়ে দেখবার জন্য আমরা ওয়াটলাবে নেমেছিলুম, আর নেমেছিলুম বান্দীপুরে। একটা সুন্দর বাগানের ভিতর গাছতলায় বসে আমরা দুপুরের আহার সেরে নিয়েছিলুম। খেতে খেতে বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন: কাশ্মীরে দেখছি শুধু পাহাড় আর লেক।

স্বাতি বলল: নৈনিতালের পাহাড় এর চেয়েও উঁচু, আর আশেপাশে আরও বেশি লেক আছে।

মামা বললেন: গোপাল কী বল?

আমি বললুম: এ কাজের ভার তো এবারে স্বাতির ওপরে. আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন!

স্বাতি বলল: ফেরার পথে আমি আর একটা লেক তোমাদের দেখিয়ে দেব, তার চেয়ে বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না।

মামা আমাকে বললেন: তাহলেই দেখ, তুমি ছাড়া আমাদের আর গতি নেই।

বললুম: কাশ্মীরের এই বিস্তৃত উপত্যকায় আরও অনেক লেক আছে। উলার দেখলুম, ফেরার পথে আমরা মানসবল দেখব। শ্রীনগর ডাল দেখেছি, তারই একটা অংশের নাম নাগিন। কিন্তু নিকটে আর একটি সুন্দর লেক আছে, তার নাম আন্চার। ডাল লেক ও ঝিলমের সঙ্গে যোগ আছে, যোগ আছে সিন্ধু নালার সঙ্গেও। যে পথে আমরা এলুম, সেই পথের পাশে আরও একটি লেক আছে শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে, তার নাম হোকারসার লেক। লেকটি গোল, ব্যাস মাইল খানেক, গভীরতা সাত ফুট। পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী থেকে শোকনাগ নালা এসে এই লেকে পড়েছে।

স্বাতি বলল: গুলমার্গের কাছে শুনেছি আফারওয়াট লেক।

বললুম: শুনি নি বানিহালের পশ্চিমে কৌঁসরনাগ লেকের কথা। দুর্গম স্থান, তিন দিন ধরে পায়ে হেঁটে যেতে হয় বলেই আমরা শুনি নি। তবে যারা হাঁটতে ভালবাসে, তারা এই সুন্দর

লেকটি একবার দেখতে যাবেই। পীর পাঞ্জাল শ্রেণীর পাশাপাশি তিনটি চূড়া প্রায় পনর হাজার ফুট উঁচু। সব চেয়ে পশ্চিমেরটির নাম নৌবন্ধন, উঁচু সাড়ে পনের হাজার ফুট। তারই উত্তরে কৌঁসরনাগ, বার হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ছোট লেক, বরফের পাহাড় ভাসে জুন মাস পর্যন্ত। এই লেকেরই অন্য নাম বিষ্ণুপাদ।

বন্দ্যোপাধ্যায় খাওয়া বন্ধ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি থামতেই বললেন: এত লেক আছে এ দেশে?

হেসে বললুম: মাত্র কয়েকটির নাম করেছি। নাম জানি এমন আরও অনেক লেক আছে।

মামা বললেন: থেমো না, বলে যাও।

বললুম: মানচিত্রখানা সামনে থাকলে সুবিধা হত।

মামা বললেন: এমনিতেও হবে।

উত্তর কাশ্মীরে গঙ্গাবল বিষ্ণুসর ও কৃষ্ণসর তিনটে লেক কাছাকাছি, পরের দুটো তো একেবারেই পাশাপাশি। হিমালয়ের হরমুখ শৃঙ্গ প্রায় সতর হাজার ফুট উঁচু। তারই নিচে গঙ্গাবল লেক, সমুদ্র সমতল থেকে বারো হাজার ফুট উপরে। হিন্দুদের একটি তীর্থ বলে শ্রাবণ মাসে যাত্রীরা যায় বারো মাইল পথ পায়ে হেঁটে। বিষ্ণুসর ও কৃষ্ণসর সোনমার্গ থেকে তেরো মাইল দূরে সাড়ে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে। পথ দুর্গম বলে কচিৎ কোন যাত্রী সেখানে যায়।

খাবার জন্যে আমি একটু থেমেছিলুম। কিন্তু স্বাতি বলল: আরও কিছু নাম নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে।

মামী বললেন: খেতে দাও ছেলেটাকে।

খেতে খেতেই আমি বললুম: এবারে তাহলে পহলগামের দিকে যেতে হয়।

মামা বললেন: তাই চল।

বললুম: মারসর ও তারসর দুটি লেক কাছাকাছি, প্রায় সাড়ে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে। এই দুটি লেক থেকেই দুটি নালা

বেরিয়েছে। মারসর থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে একটি নালা ডাল লেকে এসে পড়েছে, আর একটি নালা তারসর থেকে বেরিয়ে এসেছে পহলগামের লীডার নদীর দিকে। শেষনাগের কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। অমরনাথের সকল যাত্রীই এই লেকটি দেখে মুগ্ধ হয়।

অমরনাথের নামে মামী কৌতূহলী হয়ে বললেন: অমরনাথ কি খুব কাছে নাকি?

স্বাতি বলল: পহলগামের কাছে।

মামা বললেন: কাছে মানে?

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কত মাইল পথ গোপালদা?

বললুম: আটাশ মাইল।

মামী হতাশ ভাবে বললেন: আটাশ মাইল কি কাছে হল!

স্বাতি বলল: হালদার মশাইকে আমি ধরে আনব, তাঁর কাছেই অমরনাথের গল্প শোনা যাবে।

উলার লেক দেখে ফেরার পথে সাফাপুর নামে একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে সদর রাস্তা মানসবলের পশ্চিম পার দিয়ে শ্রীনগর এসেছে। সাফাপুর থেকেই আর একটা ফেয়ার ওয়েদার রোড মানসবলের পূর্ব পার দিয়ে ক্ষীরভবানী এসেছে। শ্রীনগর থেকে যে পথ সোনমার্গ গেছে, ক্ষীরভবানী সেই পথের উপর। আমরা ক্ষীরভবানী দেখব বলে মানসবল লেকের পূর্ব প্রান্তে এসে নামলুম।

একটি ছোট পাহাড়, তারই কোলে এই হ্রদ। বাস যেখানে দাঁড়ায়, তারই কাছে একটি টুরিস্ট হাটে যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম দিকে ঝিলমের প্রবাহ বয়ে গেছে উলারের দিকে। একটি সরু নালায় আছে মানসবলের সঙ্গে সংযোগ। হাউসবোটি আসতে পারে স্বচ্ছন্দে। শৌখিন যাত্রীরা এক জায়গায় থাকতে ভালবাসেন না। হাউসবোট নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান— ডাল থেকে নাগিনে, ঝিলম থেকে মানসবলে। আমরা দূর থেকেই মানসবলের শোভা দেখলুম। খানিকটা হেঁটে গেলেই জলের ধারে

পৌঁছনো যায়। লম্বায় দু মাইল ও দেড় মাইল প্রশস্ত এই হ্রদে নাকি পদ্ম ফুটে থাকে। এখন পদ্ম নেই, অন্য কোন ফুলও নেই। তবু জায়গাটি ভাল লাগল।

স্বাতির কাছে ক্যামেরা ছিল। সে ছবি নিল একখানা। তার-পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলল: আপনি একটুখানি দাঁড়ান না এইখানে।

বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য হয়ে বলল: আমি!

আপনি। এমন ভাবে দাঁড়ান যেন মানসবলের শোভা দেখছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করতে পারল না, ভাল ছেলের মতো স্বাতির আদেশ পালন করল। স্বাতি আরও একখানা ছবি নিল।

এই হ্রদের উত্তর দিকে নাকি দারোগাবাগ নামে একটি প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহর বেগম নূরজাহান এটি নির্মাণ করেছিলেন। এত দূর থেকে আমরা তা দেখতে পেলুম না।

শ্রীনগর থেকে মানসবলের দূরত্ব মাত্র আঠারো মাইল, ক্ষীর-ভবানী এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। ক্ষীরভবানী নাম শুনে মামী আশ্চর্য হলেন, বললেন: এ তো খাঁটি বাঙলা নাম।

স্বাতি বলল: সংস্কৃত বল।

আমি বললুম: তোমার গাইড বইএ আরও একটা নাম দেখেছি। তুলামুল্লা।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় তুমি এ সব পড়লে?

আমার কোন উত্তর দেবার ইচ্ছা ছিল না। স্বাতি বলল: চুপি-চুপি তো এই কাজই করে। হয় কোন যাত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র, নয়—

নয় কী?

চুরি। কখন এ সব পড়েছে, আমরা তা দেখতেই পাই নি।

আমি যত দূর জানি, ও সব কাগজপত্র তো পড়বার জন্যেই সংগ্রহ করেছ। পড়ে কী দোষ করেছি, তা তো বুঝতে পারছি না।

মামা বললেন: সেই দোষে তোমাকে ক্ষীরভবানীর গল্পটা বলতে হবে।

আমাদের বাস একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে নেমে পায়ে হেঁটে খানিকটা এগোতে হল। মন্দির এলাকার বাহিরে একটা সাইনবোর্ডে জুতো খোলার নির্দেশ আছে। আমরা তা পালন করলুম।

এই গ্রামটির নাম তুলমুল বা তুলামুল্লা। আর মন্দিরের নাম ক্ষীরভবানী। কয়েকটি চিনার ও আমলকী গাছে স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন। কোনখানে রৌদ্র এসে ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যত্র শুধু ছায়া। এই মন্দির এলাকার তিন দিকে নাকি খাল আছে। তার নাম ক্ষীর সাগর। এই খাল কিছু দূরে সিন্ধুর স্রোতের সঙ্গে যুক্ত।

ক্ষীরভবানীর মন্দিরের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্তি। এরই সামনে একটি জলের কুণ্ড। তার চারি দিক পাথর দিয়ে বাঁধানো ও রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। কতগুলি নিশান বাঁধা আছে কুণ্ডের চারি ধারে। লোকে বলে যে এই কুণ্ডের জলেই মন্দিরের বিগ্রহ পাওয়া গিয়েছিল। ধার্মিক রাজা প্রতাপ সিং এই শ্বেত পাথরের মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মামা বললেন: গোপাল একেবারে চুপ করে রইলে, কিছু পৌরাণিক কথা শোনাও।

স্বাতি বলল: নিজের দাম বাড়াচ্ছে বাবা।

আমি বললুম: তুমি তো রিহার্সাল দিয়ে এসেছিলে, এখন চুপ করে থাকলে চলবে কেন!

বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন: কিসের রিহার্সাল?

আমি বললুম: পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গল্প শোনাবার।

বন্দ্যোপাধ্যায় ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আমরা বেড়াতে আসি বেড়াবার জন্যে, তার বেশি আর কোন উদ্দেশ্য আমাদের থাকে না।

স্বাতি বোধহয় একটা কঠিন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। আমি বললুম: আমার তা উপায় নেই, আমাকে গাইডের কাজ করতেই হবে।

স্বাতি বলল: বুঝেছি, পৌরাণিক কথা গোপালদার কিছু জানা নেই।

বললুম: যা জানা আছে, তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। লঙ্কার রাজা রাবণ পার্বতীর উপাসনা করতেন। তারপর যখন সীতা হরণ করলেন, আর রামচন্দ্র এসে লঙ্কা আক্রমণ করলেন, তখন বিরক্ত হয়ে পার্বতী লঙ্কা ত্যাগ করে তাঁর তিনশো ষাট নাগ অনুচর নিয়ে আকাশ পথে এই সতীসরে এসে উপস্থিত হলেন, আর অধিষ্ঠান করলেন এই ক্ষীরভবানী কুণ্ডের ধারে। এখানে তাঁরই নাম হল ক্ষীরভবানী।

মামা বললেন: বিপদের কথা। তুমি পার্বতীর গল্প বললে, মন্দিরে বিগ্রহ লক্ষ্মী-নারায়ণের, আর দেবীর নাম ক্ষীরভবানী।

এই স্থানের আর একটি অলৌকিক কথা আছে। কুণ্ডের জলের রঙ ঘন ঘন পরিবর্তন হয়—গোলাপী থেকে সবুজ হলদে ও সাদা। স্বামী অভেদানন্দ এর একটা কারণ বলেছিলেন। যাত্রীরা এই কুণ্ডে দুধ বা ক্ষীর ঢালেন। কোন কোন ধনী যাত্রী এক মণ দেড় মণ দুধও ঢালেন। সেই দুধ পচে বুদবুদ ওঠে। তার উপরে যখন সূর্যের কিরণ পড়ে, তখনই দেখা যায় রঙের খেলা। কিন্তু আমরা কোন রঙের খেলা দেখতে পেলুম না।

ঘুরে ঘুরে আমরা আর কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির দেখলুম। দুর্গা বুদ্ধ ও মহাবীরের মন্দির। ধর্মশালা ও মুদির দোকানও দেখলুম।

মামী বললেন: এই মন্দিরের কথা আগে জানলে ভাল হত।

মামী তাহলে আজ দুপুরে খেতেন না, একটা পূজো দিয়ে জল গ্রহণ করতেন।

মামা বললেন: না জেনে কোন ক্ষতি হয় নি তো!

ক্ষীরভবানীতে মেলা বসে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে। তখন

যাত্রী আসে নানা জায়গা থেকে। এই ছোট তীর্থস্থানটি তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

আমরা শ্রীনগরে ফিরলুম গন্ধরবল দেখে। সিন্ধুনালার উপরে গন্ধরবল একটি গ্রামের নাম। সিন্ধু উপত্যকার এই গ্রামটিতে লোকে মাছ ধরতে আসে। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব হবে সাড়ে তেরো মাইল।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষীরভবানী দর্শনে এসেছিলেন বলে স্বামী অভেদানন্দও এই অঞ্চলে ভ্রমণে এসেছিলেন। শ্রীনগর থেকে তিনি তাঁর হাউসবোট এনেছিলেন সাদ্বীপুর। বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গম বলে নাম সাদীপুর, সাদীপুর থেকে মানসবলে যাবার নালা আছে, আবার মানসবল থেকে সিন্ধু যাবার নালা। বিতস্তার জল অত্যন্ত নোংরা বলে তাঁরা পান করেন নি, সিন্ধুর জল পরিষ্কার বলেছেন। ক্ষীর-ভবানী গন্ধরবল দেখে তাঁরা উলার দেখতে গিয়েছিলেন হাউসবোটে করে। উলার লেকের জলও তাঁরা অত্যন্ত নোংরা বলেছেন। উলার লেকের সোনা লঙ্কা দ্বীপের বর্ণনা আছে তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে।

সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য আছে, তা পড়লে আঁতকে উঠতে হয়। এই তুলমুল গ্রামখানি দেখে নাকি বাংলা দেশের গ্রাম বলে ভ্রম হয়। পথের দুধারে পচা জলপূর্ণ নর্দমা, ভাঙা বেড়া, বনজঙ্গলপূর্ণ বাগান ও ভাঙা বাড়ি। বাড়িগুলি কাঠের, পাতার ছাদের উপর মাটি দিয়ে ঘাস ও ফুলের গাছ রোপিত। এই সব বাড়ির প্রায় চারিদিকই খোলা। শীতকালে বরফের ভিতর তারা কী ভাবে বাস করে ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। গরম কাপড়ের মধ্যে একটি মাত্র ফেরাঙ্গ বা আলখাল্লা তাদের সম্বল, পায়ে খড়ম। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পোশাক প্রায় একই রকম। পুরুষদের মাথায় সাদা চাদরের পাগড়ি, আর স্ত্রীলোকেরা মাথায় সাদা রুমাল বাঁধে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই কপালে জাফ্‌রাণের টিপ পরে। এই হল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পণ্ডিতানীর পোশাক। মুসলমানেরা এই টিপ পরে না ও তাদের পাগড়ি বাঁধার কায়দাটি আলাদা।

স্বাতি বলল : এতে আঁতকে ওঠার কী আছে ?

বললুম : সেই কথাটিই এখনও বলি নি।

মামা বললেন : দেরি করছ কেন, বলে ফেল।

গ্রীষ্মকালের দুটি মাস ছাড়া বছরের অন্য সময় তারা স্নান করে না। ঘাটে ফেরাঙ্গ খুলে বিবস্ত্র হয়ে নদীতে স্নান করে, কিন্তু মাথা ভেজায় না। পুরুষদের একটা কৌপিন থাকে, মেয়েদের তাও নেই। তেল সাবান গামছার ব্যবহার তাদের নেই। তাই তাদের মাথা ও ফেরাঙ্গ দুইই যুঁয়ায় ভর্তি।

যুঁয়া কী ?

এক রকমের সাদা উকুন। মুসলমানেরা সারাক্ষণ টুপী পরে বলে তাদের কামানো মাথায় আবার ঘা।

স্বাতি বলে উঠল : সর্বনাশ ! এ কি তোমার কথা, না স্বামীজীর ?

আমি এ সব জানব কোথা থেকে ? স্বামীজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই পড়েছি। এই সব দেখে তিনি বলেছিলেন, এই জন্যেই হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে স্নানের এমন মহিমা বর্ণিত হয়েছে। শীতকালের কয়েকটি পর্বে স্নান করলে শত জন্মের পাপক্ষয়, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ, স্বর্গলাভ প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে স্নান করাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

নাক সিঁটকে বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : হরিবল্।

আমি বললুম : ভয় পাবেন না। স্বামীজী নিজেই বলেছেন যে এ হল আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শহীন মানুষের কথা। শ্রীনগরে আমরা যাদের দেখছি, এ তাদের কথা নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার আগেই আমরা শ্রীনগরে ফিরে এলুম।

২৬

পরদিন সকালে মামা আমাকে হাউসবোটের ছাদে উঠতে দিলেন না। বললেন : নিচেই বোসো।

মামী রান্নার তদ্বিরে গিয়েছিলেন, স্বাতি গিয়েছিল তাঁকে সাহায্য করতে। এই অবসরে আমরা বসবার ঘরে গল্প করতে বসলুম।

মামা বললেন : ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটিকে কেমন দেখছ?

বললুম : মন্দ নয়।

মামা চটে উঠে বললেন : এ কোন উত্তর হল না। ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে না চাইলে, বল বলব না।

বললুম : এখনও তো খারাপ কিছু দেখি নি, ভালও দেখি নি কিছু। তবে শুনেছি বড় চাকরি করে।

আর কিছু শোন নি?

আর যা শুনেছিলুম তা বলা উচিত হবে কিনা যখন ভাবছিলুম, ঠিক এই সময়েই বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। কড়া ইস্ত্রি করা স্যুট। বাঁ হাতে গলার বো-টা সোজা করে ডান হাত বাড়িয়ে মামার সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমি তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। ভদ্রলোক একখানা সোফায় বসে বললেন : আজকের প্রোগ্রাম কী?

মামা আমার দিকে তাকালেন দেখে আমি বললুম : এখনও কিছু ঠিক হয় নি।

বন্দ্যোপাধ্যায় ভিতরের দিকে তাকালেন। আমি তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে স্বাতি আসছে পর্দা সরিয়ে। বন্দ্যোপাধ্যায়কে নমস্কার করে বলল : আজ আমরা শঙ্করাচার্য পাহাড়ে উঠব।

বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : সে আবার কোন্ পাহাড়?

আমি বললুম : ঐ তো সামনেই শঙ্করাচার্য পাহাড়। কিন্তু হেঁটে উঠতে হবে।

বন্দ্যোপাধ্যায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন : মাই গড্! ওপরে উঠবার আর কোন উপায় নেই?

ঘোড়ায় চেপে উঠতে পারেন।

কিন্তু স্বাতি বলল : আমরা হেঁটেই উঠব।

তোমরা যাও তাহলে, আমরা বিশ্রাম করি।

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যাচ্ছেন, তখন আর ভাবনা কী! আমিও আপনার সঙ্গে আজ একটু বিশ্রাম করি।

স্বাতি আমাকে বেরবার জন্য একবারও অনুরোধ করল না। মামীর কাছে অনুমতি নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রান্নার ব্যবস্থা করে মামী বসবার ঘরে এসে চমকে উঠলেন, বললেন : স্বাতি একা বেরিয়েছে।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : একা নয়, তোমার ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে!

গোপাল কেন সঙ্গে গেলে না?

মামা বললেন : যাবে কি, কেউ ওকে ডাকলে তো যাবে!

মামার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলুম। এতটা যে তিনি লক্ষ্য করেছেন তা আমি ভাবতে পারি নি। ভাবতে পারলে এমন ভাবে ধরা দিতুম না। আমার অভিমান আমি কৌশলে গোপন করতুম।

মামী কী বুঝলেন তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আর কোন কথা কইলেন না।

খোলা দরজা দিয়ে আমি বাহিরের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। সামনেই শঙ্করাচার্য পাহাড়, ছ হাজার দুশো ফুট উঁচু। সামনের পথ থেকে এক হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে। সিঁড়ি আছে পাথর

বাঁধানো। যাত্রীরা উপরে উঠে শুধু শিবের মন্দির দেখে না, নিচের দিকে তাকিয়ে শ্রীনগরের সৌন্দর্যও দেখে।

স্বাতির সঙ্গে আমি অনেক পাহাড়ে উঠেছি। তিরুচিরপল্লীতে রক টেম্পলে উঠেছি, শ্রবণবেলগোলায় উঠেছি গোমতেশ্বর দর্শনে. পুনায় পার্বতী মন্দিরে উঠেছি, আর সিমলায় উঠেছি জাখু পাহাড়ে। শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য পাহাড়ে উঠবার জন্য স্বাতি আমাকে সঙ্গী হতে ডাকল না।

মামী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : শম্পা আজ আসবে নাকি ?

বললুম : জানি নে।

কাল তোমরা কত দূর গিয়েছিলে ?

নাগিন লেক পর্যন্ত। আমাদের পিছন দিকটাই বোধহয় নাগিন লেক। ·যাবার সময় ডাল লেক হয়ে গেলুম, ফিরলুম অন্য পথে। খানিকটা দূরে দুখানা হাউসবোটের ফাঁক দিয়ে আমাদেব শিকারা বেরিয়ে এসেছিল।

মামা গম্ভীর ভাবে বললেন : হুঁ।

মামী বললেন : আজ বিকেলে আমরা একটু বেরব।

মামা বললেন : কোথায় ?

মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে একবাব দেখা করা দরকার।

মামা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

মামী বললেন : কেন, আমার কথা বুঝি পছন্দ হল না ?

অপছন্দের কী আছে ! গোপালকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

তুমি যাবে না বুঝি ?

আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন !

মামার অসন্তোষ মামী লক্ষ্য করলেন না, বললেন : বেশ, আমি একাই যাব।

গম্ভীর মুখে মামা পাইপ টানছিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন : এই পাহাড়ের নাম শঙ্করাচার্য পাহাড় কেন হল বলতে পার ?

পারি নে। শঙ্করাচার্য কাশ্মীরে এসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ কথা কেউ বলে নি। বরং এ যে অতি প্রাচীন মন্দির, খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে নির্মিত হয়েছে, সে কথা অনেকে বলেছেন। কাশ্মীরীরা মনে করেন যে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার ছ শো বছর আগে সন্দিমান এই মন্দির নির্মাণ করেন। অবশ্য রাজতরঙ্গিণীতে আমরা প্রথম গোনর্দকে পরবর্তী কালের রাজা দেখি। রাজা গোপাদিত্য এই মন্দিরে সংস্কার করেছিলেন বলে সকলের বিশ্বাস। তাঁর রাজত্বকালও খ্রীষ্টের জন্মের চারশো বছর আগে। লোকের ধারণা যে সে সময় একটি পাথরের সিঁড়ি ছিল ঝিলমের তীর থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত। তিন শো বছর আগে কাশ্মীরের মুসলমান রাজারা সিঁড়ির পাথরে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

মামা বললেন : এ সব কি তোমার সত্য বলে মনে হয়?

তা মনে হয় না। বরং ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় যে শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক কালে কাশ্মীরে অনেক শিবমন্দির নির্মিত হয়েছে। রাজপরিবারের অনেকেই, এমন কি মন্ত্রী সেনাপতিরাও, অনেক শিবমন্দির নিজেদের নামে নির্মাণ করেছেন। তার থেকেই মনে হয় যে শঙ্করাচার্যের প্রভাব ছিল তাঁদের ওপরে। শঙ্করাচার্য বদ্রীনাথে গিয়েছিলেন, হয় তো কাশ্মীরেও এসেছিলেন। সামনের পাহাড়ের ওপর তিনিই শিবের প্রতিষ্ঠা করেছেন শুনলে আমি আশ্চর্য হব না।

সেই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের কথা আমি পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। এক হাজার বছর আগে এক নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ কুলে শঙ্করের জন্ম ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মালাবার অঞ্চলে। জন্মান্তরে অর্জিত সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন এই জাতিস্মর পুরুষ। আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও নর্মদাতীরে শ্রীমৎ গোবিন্দ-পাদাচার্যের কাছে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল কাশীধামে বাস করে বদরিকাশ্রমে চলে যান। ষোল বছর বয়সে

তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। সারা ভারত পরিক্রমা করে সকল দেশের সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের অদ্বৈত্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈশেষিক ন্যায় ও সাংখ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের চাপে হিন্দুধর্ম তখন মরণাপন্ন। সেই সঙ্কটের দিনে আচার্য শঙ্কর তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে সর্বশূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করে হিন্দু ধর্মকে তার আপন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শাক্ত শৈব গাণপত্য ও তান্ত্রিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের অনাচার দূর করেছিলেন। কিন্তু কোন দেবতা বিশেষের উপাসনা প্রচার করেন নি, * কোন দেবতার উপাসনায় তিনি হস্তক্ষেপও করেন নি। শুধু সম্প্রদায় নির্বিশেষে আপন অদ্বৈতবাদের আদর্শ প্রচার করে গেছেন। দ্বৈত ভাবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করে জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মস্বরূপের জীবন্ত উপলব্ধি এবং চরমে সাযুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একান্ত অভিন্নত্ব-লাভই শঙ্করমতে সাধকের আদর্শ। শঙ্করাচার্য হিমালয়ে যোশীমঠ স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তাঁর নামে কোন পাহাড় নেই। কাশ্মীরে তিনি কোন মঠ স্থাপন করেন নি। কিন্তু শ্রীনগরের এই পাহাড়ের নাম হয়েছে শঙ্করাচার্য পাহাড়। এ দেশে তিনি নিশ্চয়ই এসেছিলেন।

শুনেছি, আর একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন এ দেশে। এ দেশ মানে কাশ্মীরে হয়তো নয়, কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই দেশের লাদাখ অঞ্চলে। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর প্রথম জীবনে চোদ্দ বছরের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন। নিকোলাস নটোভিচ নামে একজন রুশ পর্যটকের একখানি গ্রন্থ পড়ে আমরা এই হারানো জীবনের অনেক কথা জানতে পারি। বইখানির নাম **The Unknown Life of Jesus Christ.** নটোভিচ মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। লাদাখের রাজধানী লে শহরে যখন তিনি ছিলেন,

তখন এক দিন হিমিস গুম্ফার লামাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনলেন। তারপর দোভাষীদের সাহায্যে কয়েকখানি গ্রন্থ পড়ে দেখলেন। তাতেই তিনি জানলেন যে যীশু ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনে। পঞ্চনদ ও রাজপুতানার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন জগন্নাথ ক্ষেত্রে। রাজগৃহ ও বারাণসীতেও বাস করেছিলেন। ছ বছর তিনি বেদ পড়েছিলেন. হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্য দেখে আপত্তি করেছিলেন, তারপর নেপাল ও হিমালয়ে আরও ছ বছর বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও লে শহরের উপকণ্ঠে হিমিস গুম্ফায় গিয়ে এই সব গ্রন্থ অন্বেষণ করেছিলেন ও কিছু কিছু অনুবাদ করে এনেছেন। 'কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ' গ্রন্থে এই ঘটনার বিশদ উল্লেখ আছে।

মামাকে আমি সংক্ষেপে এই গল্প বলেছিলুম। সব শুনে মামা বলেছিলেন: খ্রীষ্টানরা কি এ কথা মানেন?

বললুম: জানি নে। তবে আমি একবার এক পাদ্রী সাহেবের কাছে এই কথার উল্লেখ করেছিলুম। তিনি খুবই বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন।

কেন?

এই প্রসঙ্গ তাঁর পছন্দ হয় নি।

মামা আমাকে সমর্থন করে বললেন: পছন্দ হবার মতো কথা নয় যে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি যদি অক্সফোর্ডের দার্শনিক বল, তাহলে কি বৈষ্ণবরা তোমাকে ছেড়ে দেবেন!

বললুম: ধর্মান্ধতার যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে এখন গবেষণা করা দরকার। যীশু তো ঐতিহাসিক মানুষ, তাঁকে পুরোপুরি জানবার চেষ্টা অসম্মানের কেন হবে!

মামা খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললেন: এবারে লাদাখের কথা কিছু বল।

বললুম: লাদাখের কথা তো বিশেষ কিছু জানি নে।

মামা বিরক্ত ভাবে বললেন : আমি তোমার ভূমিকা শুনতে চাই নে। তুমি যা জান, তাই বল।

আর দেরি না করে বললুম : লাদাখ যেতে হয় সোনমার্গের পথে। আমরা গন্ধরবল পর্যন্ত গিয়েছিলুম। সেই পথই ঘুরে পূর্ব দিকে চলে গেছে। প্রথমে সোনমার্গ, তারপর জোজিলা পাস পেরিয়ে লাদাখ।

মামা বললেন : সোনমার্গ নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে !

টুরিস্ট রিসেপ্‌শন সেন্টারে আমরা শুনে এসেছি। যুসমার্গ আর সোনমার্গে টুরিস্ট বাস নিয়মিত যাতায়াত করে।

মামা বললেন : যুসমার্গ আবার কোথায় ?

শ্রীনগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি গরু চরাবার মাঠ, এখান থেকে মাইল তিরিশেক দূরে। যাত্রীদের থাকবার জন্যে একটা রেস্টহাউস তৈরি হয়েছে।

দেখবার কী আছে ?

পাহাড়ে ঘেরা একটি মাঠ।

মাঠ কি আমাদের দেশে নেই যে তা দেখবার জন্যে কষ্ট করতে হবে !

দেশের মাঠ যে আমাদের দেখা, দেখে দেখে পুরনো হয়ে গেছে। এখন আর তার কি আকর্ষণ আছে বলুন !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন : হুঁ। অদেখার পিছনেই আমরা সারা জীবন ছুটে মরি। হাতের মুঠোয় স্পর্শমণি পেলেও তার দাম যায় ফুরিয়ে।

বললুম : সোনমার্গের অবশ্য একটা অন্য রকমের আকর্ষণ আছে। শুধু গরু চরানোর মাঠ নয়, আড়াই মাইল দূরে আছে থাজোয়াস গ্লেসিয়ার। যাত্রীরা বরফ দেখতে সেখানে যায়। সোনমার্গে ডাক-বাংলো আছে, গোটা তিনেক টুরিস্ট হাট আছে। সিন্ধু উপত্যকা দিয়ে সুন্দর পথ প্রায় পঞ্চাশ মাইল। কেউ গ্লেসিয়ার দেখে ফিরে আসে, কেউ থাকে সেখানে। সেখান থেকে গঙ্গাবল লেকে যাওয়া

যায়। সে অনেক দূর। কিন্তু অমরনাথ কাছে। ন মাইল দূরে বালতাল গ্রাম জোজিলা পাসের নিচে। সেখান থেকে অমরনাথের পথ শুরু হয়েছে। পথ দুর্গম বলে সে পথে যাত্রী কম।

মামা বললেন: পহলগাম থেকে অমরনাথের পথও তো দুর্গম।

বললুম: সে পথে শুনেছি বরফের নদী পেরতে হয়। যত দিন ববফ কঠিন থাকে, তত দিনই পথ, তারপরে নদী। নাম অমর গঙ্গা। অমরনাথ থেকে বেরিয়ে জোজিলার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধুর একটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শাখা নদীটিই সোনমার্গের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এরই জন্যে এই অঞ্চলকে সিন্ধুর উপত্যকা বলে। আসল সিন্ধু নদ অনেক উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। লাদাখের রাজধানী লে শহর সিন্ধুর তীরে, কার্গিল কিন্তু শাখা নদীর উপরে। কার্গিল থেকে লে পর্যন্ত সম্প্রতি সড়ক তৈরি হয়েছে দেড় শো মাইল। সোনমার্গ থেকে কার্গিল পর্যন্ত পাকা সড়ক আগেই তৈরি হয়েছে।

লাদাখ বৌদ্ধপ্রধান স্থান। কিন্তু ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি নেই। শুনেছি, একই পরিবারে তিন ভাই তিন ধর্ম অবলম্বন করে নির্বিবাদে বাস করে। বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমান। স্বামী অভেদানন্দ বিয়াল্লিশ বছর আগে লে শহরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে চল্লিশ হাজার লোকের বাস দেখেছিলেন। তার মধ্যে দেড় হাজার লামা ও আশীজন সন্ন্যাসিনী। শহরের সব চেয়ে বড় বাড়িগুলিই হল গোম্পা। এই রকম অসংখ্য গোম্পা আছে লাদাখে।

এ আলোচনা মামীর ভাল লাগে নি, তিনি উঠে গিয়েছিলেন। আমার মনটাও আজ ভাল ছিল না বলে লাদাখের গল্পে আমিও কোন উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। মামা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বললেন: বই পড়ে এ সব জায়গার অভিজ্ঞতা হয় না।

বললুম: কোন জায়গারই হয় না।

বাহিরের ফেরিওয়ালাদের হাঁক শোনা যাচ্ছিল। নানা রকমের

পণ্য নিয়ে তারা শিকারা বেয়ে যাচ্ছে। বাহিরে কাউকে দেখতে পেলেই জিজ্ঞাসা করছে, কিছু চাই কিনা। অল্প প্রশ্রয় পেলেই জিনিসপত্র নিয়ে হাউসবোটের উপরে উঠে আসবে।

সহসা মনে হল, আমাদের হাউসবোটে কেউ উঠছে। আমি মুখ বাড়িয়েই বিস্মিত হলুম। শম্পা এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল : বন্দ্যো এসেছে এখানে?

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই চারিদিকে চেয়ে বলল : কই, তাকে দেখছি না তো!

মামা বললেন : স্বাতির সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

শিকারায় বেরিয়েছে?

আমি বললুম : শঙ্করাচার্যের মন্দির দর্শনে গেছে।

শম্পা বলল : বুঝেছি।

বলে আর অপেক্ষা করল না। যেমন ব্যস্ত ভাবে এসেছিল, তেমনি ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

মামা তাকে বসতে বললেন না।

২৭

শঙ্করাচার্য পাহাড় থেকে স্বাতি যখন ফিরে এল, তখন আনন্দে উচ্ছল দেখাচ্ছিল তাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে পৌঁছে দিতে আসে নি, সে একাই ফিরেছে। ওপারের ঘাট থেকে প্রেসিডেন্ট তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

মামা বললেন: কেমন দেখলে?

ভারি সুন্দর বাবা। ওপর থেকে শ্রীনগর শহরটা দেখাচ্ছিল ছবির মতো।

আমি বললুম: নিচে থেকেও তো ওপরের মন্দির ছবির মতো দেখায়!

স্বাতি বলল: ছাই দেখায়!

মামা হেসে বললেন: ছবির মতো বললে কী আর সুন্দর বোঝায়! একালের ছবি দেখে তো আমি আঁতকে উঠি।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: ঠিক গোপালদার গল্পের মতো। আমার তো রীতিমতো ভয় করে।

স্বাতির কণ্ঠস্বর শুনে মামী বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন: কী মেয়ে বাবা! চেনা নেই শুনো নেই, একটা বাইরের লোকের সঙ্গে হুট্ করে বেরিয়ে পড়া হল!

মায়ের মন্তব্য শুনে স্বাতি হাসল। কোন প্রতিবাদ না করে বলল: খুউব ক্ষিধে পেয়েছে।

বলে টেবিলের উপর থেকে কয়েকটা আখরোট সংগ্রহ করে খেতে বসল।

আমি জানি, ক্ষিধের জন্যে সে এই আখরোট খাচ্ছে না। দু হাতের তেলোয় ঐ শক্ত ফলগুলো ভাঙবার আনন্দের জন্যই

আখরোট নিয়ে বসেছে। ক্ষিধের জন্য আপেল খেত, কিংবা বাবুগোসা। মামীও সেই কথাই বললেন: ক্ষিদে পেয়েছে তো ওগুলো নিয়ে বসলি কেন! খাবার তো তৈরি আছে!

আমি স্বাতির কথা ভাবছিলুম, ভাবছিলুম তার এই আনন্দের কথা। আজ এমন কোন্ ঘটনা ঘটল যে স্বাতির আনন্দ আর ধরছে না! স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

খাবার ব্যবস্থা করতে মামী উঠে যাচ্ছিলেন, স্বাতি তাঁকে ডেকে বলল: পাহাড়ের ওপরে শিবের মন্দির দেখে এলাম মা, ভারি সুন্দর শিব।

মামা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: আমরাও একদিন দর্শন করে আসব।

তারপরেই স্বাতি বলল: ভারি চমৎকার লোক মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন নিরহঙ্কার, তেমনি ভদ্র ব্যবহার।

বললুম: বিলেত ফেরত মানুষ, আদব কায়দা একটু বেশি জানবেনই তো!

মামা চটে উঠে বললেন: কেন, আমরা আদব কায়দা জানি নে!

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম: না, সে কথা নয়।

তবে কী কথা?

স্বাতি মুখ লুকিয়ে হাসল, আর মামী গেলেন খাবারের তদ্বিরে।

মামাকে আমি বললুম: এ যুগে আমরা পুরনো আদব কায়দাও ভুলেছি, বিদেশী রীতিনীতিও শিখি নি। তাইতেই আমাদের বদনাম।

মামা এবারে প্রসন্ন হয়ে বললেন: তোমাদের বিদেশী আদব কায়দা আমার কাছে ন্যাকামি বলে মনে হয়।

অনেকেরই তা মনে হয়। কিন্তু আসলে তারা ভারি ভদ্র। পরশু আমি যখন শম্পার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, তখন আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তার এমন মধুর ব্যবহার যে কিছুতেই আমি তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলুম না।

বলে গম্ভীর ভাবে তাকালুম স্বাতির দিকে। স্বাতি বুঝল যে এ উত্তর আমি তাকেই দিয়েছি। তাই আর কোন কথা কইল না।

মধ্যাহ্নের আহারের পর মামা মামী শোবার ঘরে গেলেন বিশ্রাম করতে। স্বাতি আমার সামনে কাশ্মীরের মানচিত্র খুলে বসল। বলল: কাল কী দেখা হয়েছে, আর কী বাকি আছে দেখতে, তারই হিসেব করব।

বললুম: কী পেয়েছি, আর কী বাকি আছে পেতে, তার হিসেব করবে না?

সে হিসেব তো হয়ে গেছে।

হয়েছে নাকি!

কেন, কিছুক্ষণ আগেই তো বললাম তোমাকে। মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় না হলে কী পাই নি তার হিসাব মেলাতেই পারতাম না।

গম্ভীর ভাবে বললুম: হালদার মশায়ের কাছে আমি অন্য কথা শুনেছিলুম।

কী কথা?

এ কাজ তুমি জো রায়ের কাছে শিখেছিলে। এত তাড়াতাড়ি সে কথা ভুলে গেলে?

এখনও তার কথা তুমি ভুলতে পার নি!

ভদ্রলোক আমার উপকার করেছেন কিনা, তাই তাঁর কথা ভুলতে পারি নি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কী উপকার?

আমি যে বোকা, সেই কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মাথা দুলিয়ে স্বাতি বলল: সত্যিই, এ মস্ত উপকার।

বাহিরে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝকঝক করছে। জলের উপরে শিকারার আনাগোনা গেছে কমে। ফেরিওয়ালারা আর ডাকাডাকি করছে না। হাউসবোটের বাসিন্দারা এখন বিশ্রাম করছে। আমরাও

বিশ্রাম করতে পারতুম, কিন্তু সে ইচ্ছা আমাদের ছিল না। কাছে বসেও আমরা যেন দূরে থাকতে চাই, তাইতেই বাক্‌যুদ্ধ করি। দুজনের মাঝখানে বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা যেন প্রহরী রেখেছি।

আমাকে নীরব দেখে স্বাতি হঠাৎ হেসে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললুম: হাসলে যে?

স্বাতি বলল: তোমার দিকে তাকালেই হাসি পাচ্ছে। শম্পার সঙ্গে তোমার বিয়ে তো মা ঠিক করেই ফেলেছেন, কিন্তু অমন বউ তুমি সামলাবে কী করে তাই ভাবছি।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা আমার চেয়েও করুণ। ও বেচারাকে ছুটো বউ সামলাতে হবে।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললুম: অত হাসি কেন?

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল: উনি এখন মেমসাহেব সামলান, তারপর বউ সামলাবার কথা ভাববেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: সে আবার কী?

স্বাতি বলল: পাহাড়ের ওপর গণেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সঙ্গে সেই মেমসাহেব।

তারপর?

তারপর গণেশবাবুর যে অবস্থা হয়েছে, বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাই হবে। মেমসাহেবকে নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

অনেক প্রশ্ন করে স্বাতির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করলুম। স্বাতিকে চিনতে পেরে গণেশবাবুই গল্প শুরু করেছিলেন। তারপর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও তাঁর বাসস্থান ঠিক করতে পারেন নি জেনে গণেশবাবুই তাঁকে নিজেদের হাউসবোটে থাকবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মেম-সাহেবেরও আগ্রহ দেখে বন্দ্যোপাধ্যায় সানন্দে রাজী হয়েছেন।

গণেশবাবুরা মালপত্র সমেত বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন।

পরম কৌতুকে স্বাতি বলল: মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলবার সময় বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে টেনে তাঁর গলার বো-টা বেঁকিয়ে ফেলেছেন।

আমি বললুম: এতে তোমার এত আনন্দ কেন?

আনন্দ হবে না!

এ কথা বলতে গিয়েই স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল, বিষণ্ণ হল তার দৃষ্টি। আমি পরম বিস্ময়ে দেখলুম যে স্বাতির আনন্দ এক মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং অপরিসীম বেদনায় তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। আমি তার এই ভাবান্তর দেখে অভিভূত হয়ে গেলুম।

একটুখানি দ্বিধা করে স্বাতি বলল: মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বোধহয় তুমি ভাব নি!

বললুম: না।

সেই জন্যেই তুমি কিছু বুঝতে পার নি। সে মহিলা তো পাগল নয় গোপালদা, পাগল হয়ে যাচ্ছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে পাগল করছেন।

তাইতেই কি তুমি তাঁকে মেমসাহেবের হাতে তুলে দিয়ে এলে?

আমি তুলে দিই নি, তিনি নিজেই তার কাছে গেছেন।

একটু থেমে বলল: শম্পাও তো শুনলাম এখানে এসেছিল, কিন্তু তুমি তো তার সঙ্গে বেরলে না!

বললুম: আমি যে আর একজনের পথ চেয়ে ছিলুম।

স্বাতি হাসল না, প্রতিবাদও করল না আমার কথায়। তার মন যে এখন অন্য জগতে আছে, তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। একটি অজ্ঞাত অপরিচিত মহিলা তাঁর ঠাকুরঘরে বসে পূজা করছেন, স্বামীর মন পাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা ঠুকছেন—এই চিন্তাই পীড়া দিয়েছে স্বাতিকে। তাইতেই বোধহয় আমাকে অনুরোধ করেছে,

শম্পাকে বিয়ে কর। নিজে বেরিয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শম্পার কাছ থেকে তাকে টেনে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আজ যে সফল হয়েছে অনেক পরিমাণে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বন্দ্যোপাধ্যায় এবারে আকৃষ্ট হয়েছেন এক বিদেশিনী নারীর প্রতি। স্বাতির তাতে আপত্তি নেই। স্বাতি জানে যে এই আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী, পরিণাম কখনও মর্মান্তিক হবে না।

আমার কথার উত্তর না পেয়ে আমি তাই ক্ষুব্ধ হলুম না।

সহসা যেন বাঘের গর্জন শুনলুম। স্বাতি চমকে উঠল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকালুম বাহিরের দিকে। মনে হল, আমাদের হাউসবোটটা প্রবল ভাবে দুলে উঠল। তারপরেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম। বাঘ নয়, হালদার মশাই এসেছেন। শিকারা থেকে আওয়াজ দিয়ে উপরে উঠেছেন।

বসবার ঘরে আমাদের দেখতে পেয়ে হালদার মশাইও নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন: এ খুব ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। যায় শত্রু পরে পরে।

আমি বললুম: কোন্ ব্যবস্থার কথা বলছেন?

হালদার মশাই এসে আমার পাশে বসলেন। আমাকেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললেন: আমি ঐ হতভাগা বাঁদরটার কথা বলছি। চৌধুরীদের মেয়েটার পেছু পেছু যে মুখপোড়া এত দূর এসেছে, তার কথা। এখন ঐ মেম নিয়ে কামড়া-কামড়ি করুক খ্যাংরাপটির চমনলালের ব্যাটার সঙ্গে।

হালদার মশায়ের কথায় আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বললুম: আপনি কি গণেশবাবুর কথা বলছেন নাকি?

গণেশবাবু আবার কে?

মেমসাহেবের সঙ্গে যে দুজন বাঙালী ভদ্রলোক—

বাঙালী ভদ্রলোক আবার কোথায়! একটা মেড়ো আর একটা বাঁদর। ভদ্রলোক কাকে দেখলেন?

হালদার মশায়ের কথায় স্বাতি আজকাল আর রাগ করে না,

মুখ লুকিয়ে শুধু হাসে। অশালীন মন্তব্যও শোনে অবলীলায়। বলল : চমনলালের ছেলের নাম কি গণেশীলাল ?

হালদার মশাই মাথা নেড়ে বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ রকম একটা নামই শুনেছিলুম বটে।

তারপরেই তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে হাসলেন। বুঝতে পারলুম যে এবারে তিনি আরও কিছু মজার কথা বলবেন। আমরা সেই কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

হালদার মশাই তাঁর জামার পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে বললেন : গোঁসাইজীর দেশলাইটা কোথায় ?

স্বাতি উঠে গিয়ে একটা দেশলাই সংগ্রহ করে আনল।

ভদ্রলোক বিড়ির একটা কোণা দাঁতে কেটে মনোযোগ দিয়ে ধরিয়ে কয়েকটা টান দিলেন। তারপরে বললেন : ভাগ্যিস দেখা হয়েছিল ঐ মেড়োটার সঙ্গে, তাই এখানে কয়েকটা দিন থাকতে পেলুম।

সে আবার কী কথা !

হালদার মশাই হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন : বুঝুন তাহলে। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে শুধু বাঙালীরাই ভয় পায় না, ভয় পায় মেড়োতেও। ঐ মেমটার সঙ্গে দেখতে পেয়ে ক্যাঁক করে ওর গলা টিপে ধরলুম। তবে রে হতভাগা, বাপের পয়সা তুই এমনি করে ওড়াচ্ছিস ! আর কথাটি নেই মুখে, দু হাতে পা জড়িয়ে ধরল। বলে বিড়িতে আরও দু-তিনটে টান দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে হাসতে লাগলেন।

এর পরের ঘটনা আমার জানা। ভয় দেখিয়ে তার কাছে কিছু আদায় করেছেন। বললুম : বুঝেছি।

বুঝবেন না কেন, বুদ্ধিতে তো খাটো নন কারও চেয়ে। শুধু কাজের বুদ্ধিটুকুই নেই।

স্বাতি তাঁর মন্তব্য শুনে হাসল।

হালদার মশাই এই হাসি দেখে খুশী হয়ে বললেন : কাজের বুদ্ধি যার থাকে, তাকেই বলে বুদ্ধিমান। আর তা না থাকলে পণ্ডিতদেরও আমরা গাধা বলি।

আপনার জন্যে একটু চা করতে বলি।

বলে হাসতে হাসতে স্বাতি বেরিয়ে গেল।

হালদার মশাই বেলার দিকে তাকিয়ে বললেন : হ্যাঁ, তা চায়ের সময় হয়েছে বৈকি। গোঁসাইজীরা বুঝি এখনও ঘুমোচ্ছেন?

বলে জোরে জোরে বিড়িটা টেনে শেষ টান দিলেন চোখ বন্ধ করে, তারপর সেটা বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে বললেন : খসিয়েছি ভাল। বাড়ির জন্যে কিছু জিনিসপত্র কিনে স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরতে পারব।

সালামাকে চা করতে বলে স্বাতি ফিরে এল। বলল : কী কিনলেন এখানে?

হালদার মশাই আবার হেঁ হেঁ করে হাসলেন, বললেন : রেলের ধাঙড়দের সঙ্গে তো আজই ফিরে যাচ্ছিলুম, রসদ পেয়েই রুখে গেলুম দুদিন। আজ বাজারে বেরব।

সহসা মনে হল যেন ওপারের রাস্তা থেকে কেউ চেঁচিয়ে ডাকল। কারও নাম ধরে নয়, মনে হল যেন একটা নম্বর সুর করে বলল। পরক্ষণেই সালামার উত্তর শুনতে পেলুম, হাউসবোটের পাশ থেকে তেমনি সুর করে উত্তর দিল।

আমি বাহিরে বেরিয়ে এলুম, আর সালামা তার ছোট পান্সি নিয়ে দুখানা হাউসবোটের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওপারে খাকি পোশাকে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁধে ঝোলা, হাতে চিঠিপত্র বলেই মনে হল। সালামা ফিরে এলে দেখলুম, চিঠিই বটে। পিওন এমনি করে হাউসবোটের নাম বা নম্বর বলে ডেকে ডেকে চিঠি বিলি করে যায়।

চিঠি আমার নয়, স্বাতির চিঠি। এখানে তাকে চিঠি কে লিখল,

কোথায় ঠিকানা পেল, তাই ভাবছিলুম। স্বাতি বলল: নিশ্চয়ই মিত্রাদি লিখেছেন, নয় মিস্টার চাওলা কোন খবর দিয়েছেন।

তোমার ঠিকানা পেল কী করে?

স্বাতি স্বীকার করল না যে এখানে পৌঁছেই সে তাদের চিঠি লিখেছিল। বলল: বাজে লোক তো নই!

চিঠিখানা পড়েই স্বাতির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল: মিস্টার চাওলা তোমাকে দু এক দিনের মধ্যেই চিঠি লিখবেন।

চাওলার চিঠির অপেক্ষা বোধহয় মনে মনে আমিও করছিলুম। কিন্তু তাকে আমার ঠিকানা জানাই নি বলেই সে আশা করতে সাহস পাই নি। দিল্লীতে এই অনাত্মীয় বন্ধুটি আমার জন্য যা করেছে, তা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। আমার কেরানীর চাকরিকে সে ঘৃণা করে নি, কিন্তু চেষ্টা করেছে ভাল কোন কাজ জুটিয়ে দেবার। তার পরিচিত কয়েক জায়গায় আমাকে টেনে নিয়ে গেছে, এখনও বোধহয় চেষ্টায় বিরত হয় নি। সে আমার কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধু, কিন্তু কোন আত্মীয়ের চেয়ে কম নয়। তার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।

হালদার মশাই চেনেন না, এমন মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। বললেন: কোন্ চা-ওলা?

স্বাতি খিল খিল করে হেসে উঠে বলল: চাওয়ালা নয় হালদার মশাই, মিস্টার চাওলা, আমাদের বন্ধু তিনি।

স্বাতির হাসিতে ভদ্রলোক লজ্জা পেয়ে বললেন: ঐ চা-ওলা থেকেই চাওলা নাম। ওর বাপ-পিতামহ চায়ের দোকান করত কিনা খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলুম না।

২৮

পরদিন সকালে আমরা পহলগাম যাত্রা করলুম। সকাল আটটায় এই বাস ছাড়ে। আচ্ছাবল ও কোকরনাগ হয়ে এই বাস পহলগামে যাবে। সপ্তাহে দুদিন এই বাস পাওয়া যায়। সোজা পহলগামে যাবার বাস প্রতিদিন সাড়ে আটটায় ছাড়ে। তাতে পথের ধারের অন্য সব দর্শনীয় স্থান দেখা যায়। দেখা যায় না শুধু আচ্ছাবলের মোগল উদ্যান আর কোকরনাগের ঝরণা। আমরা সঙ্গে খাবার নিই নি। শুনেছি আচ্ছাবলের ডাকবাংলোয় খাবার পাওয়া যাবে।

আজ আমাদের সঙ্গে দু রকমের যাত্রী চলেছেন। কেউ পহলগামে থাকবেন বলে চলেছেন, কেউ আমাদের মতো আজই ফিরবেন। এ সম্বন্ধে মতের অনৈক্য আছে। কেউ মনে করেন যে কোন নূতন জায়গায় কয়েক দিন না থাকলে তার শোভা সৌন্দর্য সম্যক জানা যায় না। আবার কেউ এ কথা মানেন না, বলেন যে সৌন্দর্য এমন জিনিস যে এক নজরেই হৃদয় অভিভূত করে। উপভোগের কথা আলাদা। কেউ রয়ে রয়ে উপভোগ করতে ভালবাসে, কেউ সেই আনন্দের অনুভূতিটুকু সঞ্চয় করেই ফিরে আসতে চায়। অমরনাথ কেদারনাথে আমরা রাত্রিবাস করি না, রাত কাটাই না গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীতে। কিন্তু সেই একবার দেখার আনন্দ সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকে।

পহলগাম জায়গাটি সুন্দর শুনেছি। ভেবেছিলুম, কয়েক দিন থাকলে মন্দ হত না। কিন্তু কোন পরামর্শ না করেই স্বাতি বাসের রিটার্ন টিকিট কেটেছিল। আমি তার সঙ্গে ছিলুম, আমি তখন আপত্তি করি নি। স্বাতি বলেছিল, এক জায়গায় গুছিয়ে বসেছি, টানাটানি মার ভাল লাগবে না। আমি তার এই যুক্তিকেই সত্য

বলে মনে করেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে তার অন্য যুক্তি ছিল মনে মনে। সে কথা সে আজও আমায় বলে নি। আজ টুরিস্ট অফিস থেকে বাস ছাড়বার আগে চিঠির বাক্সগুলো সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। রোজই সে এমনি করে, কোথাও বেরবার আগে ও ফিরে আসার পরে। আমি বলেছিলুম, কে তোমায় চিঠি লিখবে?

সে হেসে বলেছিল: বন্ধুর কি অভাব আছে!

কেয়ার অফ টুরিস্ট অফিসার ঠিকানায় অনেকের চিঠি আসে। অনেকে টুরিস্ট অফিসারের কাছে নিজের হোটেল বা হাউসবোটের ঠিকানাও দিয়ে যায় চিঠি রিডাইরেক্ট করে দেবার জন্য। স্বাতি যে তাও করেছিল আমি জানতে পারি নি। পরে তাদের গলদ সে ধরে ফেলেছিল। প্রতি দিনের চিঠি বাছাই করে কাচের বাক্সে সাজানো হয় না। সব জড়ো হতে থাকে। পহলগাম থেকে ফিরে এসে এমনি এক তাড়া চিঠির সন্ধান আমরা পেয়েছিলুম। তাতে চাওলার চিঠি ছিল। দিন কয়েক আগে এসে পড়ে ছিল। চাওলা আমাকে লিখেছে কেয়ার অফ টুরিস্ট অফিসার। চিঠি পড়ে আমার বুঝতে কষ্ট হয় নি যে স্বাতি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। কাশ্মীরে আমরা কবে পৌঁছতে পারব, তার একটা আনুমানিক তারিখ সে সিমলা ছাড়বার সময়েই জানিয়েছিল। আমার মনে হল যে এই চিঠির লোভেই সে শ্রীনগরের বাহিরে গিয়ে থাকতে চায় না।

আজ আমাদের সঙ্গে যাঁরা চলেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই শৌখিন লোক। এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিবার আছে। স্ত্রীর বয়সও অনেক হয়েছে। মাথার চুল সাদা, একটু মোটা সোটা ভারি চেহারা। একেবারে প্রথম সারিতে তাঁরা বসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দুটি মেয়ে আছে আর একটি ছেলে। বয়সে নাবালক কেউ নয়। ছেলেটি জামাইও হতে পারে। যে জন্য তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছেন, সে তাঁদের পোশাক। মেয়েরা মেমসাহেবদের মতো পোশাক পরেছে। স্কার্টের বদলে স্ল্যাক্‌স, পায়ের দিকটা চুড়িদার পাজামার মতো। ভারি চটুল তাদের আচরণ। পিছনের দিকে আর একটি অল্প বয়সের দম্পতি দেখতে পাচ্ছি। সাহেব মেমের মতো পোশাক, কিন্তু রং কালো, আচরণ সংযত। একজন যাত্রীকেও বাঙালী বলে মনে হল না।

গুলমার্গ ও উলার লেক যাবার সময় ঝিলম নদী পার হতে হয়। এবারে তা হল না। জম্মু থেকে যে পথে আমরা শ্রীনগরে এসেছি, সেই পথেই আমরা যাচ্ছি। রাত্রে যে দৃশ্য দেখতে পাই নি, তাই দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলুম।

পামপুর নামে একটি জায়গায় আমরা প্রথম থামব। শ্রীনগর থেকে ন মাইল দূরের এই গ্রামটি এখন জাফরাণের ক্ষেতের জন্য বিখ্যাত।

মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন ঐতিহাসিক কথা?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: ইতিহাসের কথা বলবার দায়িত্ব আমি নিই নি।

বললুম: পামপুরের প্রাচীন নাম পদ্মপুর। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা অজিতাপীড়ের রাজত্বকালে পদ্ম নামে এক ব্যক্তি এই নগর প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু আমাদের বাস এই পামপুরে দাঁড়াল না। আমরা যে পামপুর ছাড়িয়ে যাচ্ছি সেই কথা শুধু জানিয়ে দিল।

দু ধারে জাফরাণের ক্ষেত আমরা দেখলুম। ফল ফুল নেই, বৃক্ষ-লতাও নেই। তৃণগুল্মের মতো কিছু আছে কিনা দেখতে পেলুম না। শুনলুম যে জাফরাণের গাছ মাটির উপর ঘাসের মতো নুয়ে থাকে। তারই মাথায় মাথায় ফুল। মাটিতে বসে হেঁট হয়ে সেই ফুল তুলতে হয়। থোকা থোকা ফুল শুকিয়ে বিক্রি হয় বাজারে। তখন তার রঙ আর জাফরাণের মতো নয়, জলে ভিজলে তার রঙ আবার ফিরে

আসে। আমরা পোলাওএ ব্যবহার করি, মাংসের কোর্মাতেও দিই। শুধু রঙের জন্য নয়, সুগন্ধের জন্যও তার দাম।

মামা বললেন: জাফরাণের চল দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে।

মামী বললেন: সে দামের জন্যে। যে দেশে জন্মায়, সে দেশেই দশ বারো টাকা তোলা।

মামা বললেন: ও তো মুঠো মুঠো খাবার জিনিস নয়, মসলার মতো পরিমিত ওর ব্যবহার।

মামী বললেন: পোলোওএ জাফরাণের বদলে কিসমিস পেলে তোমরা বেশি খুশী হও।

পামপুর থেকে অবন্তীপুর আরও ন মাইল পথ। সোজা সরল রাস্তায় আমরা অল্প সময়েই অবন্তীপুর এসে পৌঁছলুম। রাস্তার বাম পাশে বাস থামল। এই দিকেই অবন্তীপুরের ধ্বংসস্তূপ। স্তূপ বলা ঠিক হবে না, অতীতের স্থাপত্য কলার অপরূপ নিদর্শন আজও সগৌরবে ঘোষিত হচ্ছে। চোখের সামনে যেন কোণারকের নাট-মন্দির দেখছি। ভিত আছে, থাম আছে, নেই শুধু উপরের ছাদ। মন্দিরের দেউল কালক্রমে ভেঙে পড়েছে।

পথের উপর থেকে প্রথমে আমরা মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখলুম। তারপরে নেমে গেলুম নিকটে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম দেওয়ালের শিল্প কর্ম। অদ্ভুত সুন্দর। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু মন্দিরে এই শিল্পকলার নমুনা নেই, আছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথের মন্দিরে নেই, নেই দ্বারকার মন্দিরে। উড়িষ্যায় আছে, খাজুরাহে আছে, আর আছে দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দিরে। পশ্চিম ঘাট পর্বতের সমস্ত গুহামন্দিরেও আছে।

স্বাতি তার ক্যামেরা বার করে দূর থেকে এই দৃশ্যের ছবি নিল, তারপর কাছে এসে নিল সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের ছবি। এমনি করে মন্দির-গাত্রের চিত্র সে বেলুড় ও হালেবিদে নিয়েছে, নিয়েছে ইলোরার কৈলাস-মন্দিরে। সে হয়তো আরও সূক্ষ্ম ও আরও সুন্দর কাজ,

কিন্তু সে তুলনা আমরা করলুম না। আমরা শুধু চোখ ভরে দেখলুম, তারপর পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলুম।

আবার আমাদের বাস ছাড়ল।

কিছু দূর অগ্রসর হবার পর মামা বললেন: গোপাল একেবারে চুপ করে রইলে?

স্বাতি বোধহয় এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল, বলল: অবন্তী কার নাম ছিল, সেই কথা ভাবছে।

বললুম: অবন্তী নয়, অবন্তীবর্মা কাশ্মীরে উৎপল বংশের প্রথম রাজা। তাঁর রাজত্বকাল নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। তিনিই এই স্থানে রাজা হবার আগে অবন্তীস্বামী ও পরে অবন্তীশ্বর নামে দেবতার মন্দির নির্মাণ করেন।

মামী প্রশ্ন করলেন: শিবের মন্দির, না বিষ্ণুর?

বললুম: আমার মনে হয় অবন্তীস্বামী বিষ্ণু ও অবন্তীশ্বর শিব।

মামা বললেন: এ কথা মনে করবার কোন কারণ আছে?

সে আমার মনগড়া কারণ। রাজা নিজে বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় মন্ত্রী শূর ছিলেন শৈব। তাইতেই আমার মনে হয় যে রাজা হবার আগে বিষ্ণুর মন্দির ও পরে শিবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দেবতার নামেও এই সন্দেহের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইতিহাসে অবন্তীবর্মা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর রাজ্য শাসনের গুণে। তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদরাও নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও দান তাঁর রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য। আনন্দবর্ধন রত্নাকর মুক্তাকণ ও শিবস্বামী প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকার ও পণ্ডিতগণ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। কোন দিগ্বিজয় বা বিরাট কোন কীর্তি স্থাপন না করেও অবন্তীবর্মার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

এর পরে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এলুম। সরল সমতল পথ। পথের পশ্চিমে ঝিলম নদী বইছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

বানিহাল পাহাড়ের কাছে ভেরিনাগে তার উৎস, শ্রীনগরে আসবার সময় কোথায় এই নদী অতিক্রম করেছি জানতে পারি নি। পথের পূর্ব থেকে সেই যে পশ্চিমে এসেছে, শ্রীনগরেও নদী পশ্চিমে। এই কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলম খরস্রোতা নয়, নানা ধরনের নৌকো চলাচল করে স্বচ্ছন্দে।

অবন্তীপুর থেকে চোদ্দ মাইল পথ পেরিয়ে খানাবল বড় রাস্তার উপরে একটি শহর। এই খানাবল থেকেই পহলগামের পথ বেরিয়েছে। খানাবলে বাস থামল না, বড় রাস্তা ছেড়ে দু মাইল পূর্বে গিয়ে অনন্তনাগে দাঁড়াল অল্পক্ষণের জন্য। অনন্তনাগেও এখন আমরা নামব না, আমরা সোজা কোকরনাগ যাচ্ছি। সেখান থেকে ফেরার পথে অনন্তনাগ দর্শন।

অনন্তনাগ থেকে অনেকগুলি পথ বেরিয়েছে। একটি ফেয়ার ওয়েদার রোড দক্ষিণে ঝিলমের উৎস ভেরিনাগ পর্যন্ত গেছে, সেখান থেকে বানিহাল টানেলের দূরত্ব সামান্য। আমরা দ্বিতীয় পথে আচ্ছাবলের উপর দিয়ে কোকরনাগে যাচ্ছি। অনন্তনাগ থেকে আচ্ছাবল ছ মাইল দূরে, আরও দশ মাইল এগিয়ে কোকরনাগ। কোকরনাগ থেকে ভেরিনাগের দূরত্ব মাত্র আট মাইল, কিন্তু মোটর চলার পথ নেই।

কোকরনাগে পৌঁছবার আগেই বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়ে ফেয়ার ওয়েদার রোড আরম্ভ হয়েছে। এই পথ আরও দক্ষিণে গেছে। তারপর পায়ে হাঁটা পথ গেছে কিশ্‌তোয়ার।

আচ্ছাবলেও আমরা নামলুম না, সোজা গিয়ে কোকরনাগে উপস্থিত হলুম। কে একজন যাত্রী হিন্দীতে বললেন: এখানেও কি আমরা নামব না নাকি?

আর একজন হেসে উত্তর দিলেন: সংযমের আর প্রয়োজন নেই।

বাস থেকে নেমে হেঁটে খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হয়। ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে সেই পথ। চা-চাতকেরা প্রথমেই গিয়ে চা

খেতে বসলেন। মামা তাকালেন স্বাতির দিকে। স্বাতি তাঁর প্রশ্নটা বুঝতে পেরে বলল : ফেরার পথে আমরা চা খাব।

অতএব আমাদের এগোতে হল।

সুন্দর বাগান, নানা রকমের মরসুমী ফুল ফুটে আছে। টুরিস্টদের মনোহরণের জন্য কাশ্মীর সরকার এই ডাকবাংলো ও উদ্যান রচনা করেছেন। তারপরে কোকরনাগের ঝরণা। পাহাড়ের গা থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে নদীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। ওপারে অরণ্যময় পার্বত্য পরিবেশ।

সেই তরুণ দম্পতিটি তৎপর ভাবে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঝরণার উপরে একটা বাঁধানো পুল আছে। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে বউটি সেই পুলের উপরে পা ঝুলিয়ে বসল, আর ভদ্রলোক তার ক্যামেরা খুলল ছবি নেবার জন্য। তারা দুজনেই ছোটখাটো মানুষ। কালো রঙের উপর বিলাতি পোশাক দেখে তাদের গোত্র অনুমান করা যাচ্ছে না। স্বাতিও তাদের দেখতে পেয়েছিল, বলল : দেখেছ গোপালদা ?

আমি মামা মামীর দূরত্বটা দেখে নিয়ে বললুম : চল না আমরাও অমনি করে ছবি তুলি। তুমি আমার ছবি নেবে, আমি তোমার ছবি।

স্বাতি বলল : তার চেয়ে ওদেরই বলি আমাদের দুজনের এক সঙ্গে একটা ছবি তুলে দেবার জন্যে। তোমার উত্তরপাড়ার ঘরে বাঁধিয়ে রেখো।

গম্ভীর হয়ে বললুম : শম্পা তাহলে ভীষণ রাগ করবে।

স্বাতি হেসে বলল : সে গুড়ে বালি। শম্পা তোমার উত্তরপাড়ার ঘরে কিছুতেই ঢুকবে না।

সে ভয় সত্যিই আছে। ওই এঁদো ঘরে কোন দিনই কেউ হয়তো ঢুকবে না।

সে কথা যদি বুঝেই থাক তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসছ না কেন ?

মামা এগিয়ে এসেছিলেন মামীর সঙ্গে। স্বচ্ছ জলের স্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : এরই নাম কোকরনাগ !

মামী বললেন : বেশ সুন্দর তো জায়গাটি !

মামা বললেন : এমন সুন্দর জায়গা কি আমাদের দেশে নেই যে এ দেখবার জন্যে এত দূরে আসতে হবে !

আমি পুলের উপরে সেই দম্পতির দিকে নজর রেখেছিলুম। ছবি তোলা শেষ করে তারা ওপারের বনপথ ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেল। ওই পথে ভেরিনাগ পৌঁছানো যায় কিনা জানি নে। মানচিত্রে কোন পায়ে চলার পথের নিশানা নেই।

ঝরণার ধার থেকে আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে এলুম। অনেকেই সেখানে চা খাচ্ছেন। আমরাও বসে গেলুম।

এই সব ঝরণায় নাকি ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। কতকটা মিরগেলের মতো দেখতে, মিষ্টি মাছ। বিদেশীরা অনেক সময়ে এই মাছ ধরবার শখে ডাকবাংলোয় এসে থাকেন। বিদেশীদের শখ অদ্ভুত রকমের। দুর্গম নির্জন স্থানেও বিদেশী দম্পতি বিশ্রাম করতে যান। তাঁদের বিশ্রাম মানেই লোকালয় থেকে দূরে বন্য প্রকৃতির বুকে— পর্বতে অরণ্যে কিংবা সমুদ্রসৈকতে। যত দুর্গম যত নির্জন, তার আকর্ষণ তত বেশি। তিব্বতে যাবার কঠিন পথে জোজিলা পাসের নিচে একটা ডাকবাংলোয় স্বামী অভেদানন্দ রেলওয়ের এক বিদেশী অফিসার দম্পতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এ দেশের পার্বত্য শহরগুলি একদা বিদেশীরাই এমনি করে আবিষ্কার করেছেন।

২৯

কোকরনাগ থেকে ফি'রে আমরা আচ্ছাবলের প্রমোদ উদ্যানে এলুম। শ্রীনগর থেকে আচ্ছাবলের দূরত্ব চল্লিশ মাইল, কেউ বলেন আটত্রিশ মাইল। এই দূরত্ব নিয়ে কোন বিবাদ নেই। তার কারণ, মোটর বাসে দু মাইল কম এলুম কি বেশি, সেটা কোন কৌতূহলের বিষয় নয়। বিবাদ বাধল অন্য কথা নিয়ে। স্বাতি বলেছিল: এই উদ্যান জাহাঙ্গীর বাদশাহর তৈরি, নূরজাহানের খুব প্রিয় উদ্যান ছিল।

আমি বললুম: এ তোমার সরকারী বইএর কথা। কিন্তু বেসরকারী গাইড বই কী বলে জান?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: শাহজাহান বাদশাহর কন্যা জাহানআরা এই উদ্যান রচনা করেছিলেন।

স্বাতি প্রতিবাদ করে বলল: অসম্ভব। আমি শুধু টুরিস্ট লিটারেচারে নয়, একজন কাশ্মীরী লোকের প্রবন্ধেও এই কথা পড়েছি।

আমি হেসে বললুম: আমিও তো নিজের কথা বলি নি। তা হলে রাজা অক্ষের কথা বলতুম। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে তিনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। তিনি এই শহর পত্তন করেন। তাঁর নামেই শহরের নাম হয়েছিল অক্ষবল। আচ্ছাবল সেই অক্ষবলেরই অপভ্রংশ।

আমরা সুসজ্জিত উদ্যানের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে তিন ধাপ উপরে উঠে গেলুম। উপর থেকে ঝরণার জল নেমেছে জলপ্রপাতের মতো, তারপর বাগানের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তিনটি ধারায়। বিশ্রামের জন্য একখানি ঘরও আছে।

পাহাড়ের ধারে এই উদ্যান। সমুদ্র সমতল থেকে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। চিনার গাছের ছায়ায় চারি দিক শীতল হয়ে আছে। পিছনে পাহাড়ের গায়ে ঝাউগাছগুলি মন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে।

মোগল উদ্যানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সকল উদ্যানই কতকটা একই ধরনের। পাহাড়ের গায়ে যে ঝরণা, তারই জল নানা ভাবে বাগানের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। পথ হয় বাঁধানো, ফোয়ারা থাকে, আর বিশ্রামের জন্য একটি গৃহ। যতগুলি মোগল উদ্যান দেখলুম, সকলেরই এই একটি ধরন। কোনটি বড়, কোনটি ছোট। কোনটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাল, কোনটির পরিকল্পনা ভাল। কিন্তু কোনটিতে বৈচিত্র্য বেশি নেই, একের সঙ্গে অন্যের তফাৎ তেমন প্রকট নয়।

এই বাগান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ডাকবাংলোয় খেতে ঢুকলুম। যাত্রীরা অনেকেই এসে পৌঁছন নি, অথচ বাগানেও তাঁদের ফেলে আসি নি। খাবার অনেকে সঙ্গে এনেছিলেন। তাঁরা গাছের ছায়ায় খেতে বসলেন। আমরা বসলুম ডাকবাংলোর বারান্দায়।

কিছুক্ষণ পরে আর দুজন যাত্রী খেতে এলেন। তাঁদের কাছে শুনলুম যে তাঁরা এখানকার ট্রাউট হ্যাচারি দেখে এলেন। ট্রাউট মাছকে বোধহয় মহাশের বলে, আর হ্যাচারিকে বলে মীনক্ষেত্র। চাষের জন্য নানা আকারের মাছ রাখা হয়। এ সমস্তই কাছাকাছি, দেখতে মোটেই সময় লাগে না। তবু আমরা খাবার পরে সেখানে গেলুম না। মামা বললেন: দরকার নেই। বাসে গিয়ে ওঠাই নিরাপদ।

কথাটা মিথ্যা নয়। আমরা পহলগাম যাচ্ছি, সেখান থেকে আজই শ্রীনগরে ফিরব। পথে আরও দর্শনীয় স্থান আছে—অনন্তনাগ ও মার্তণ্ড মন্দির। কাজেই আমাদের সময়ের মূল্য আছে।

আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসে উঠলুম।

আমাদের বাস অনন্তনাগ পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। যাত্রীদের মধ্যে একজন বললেন যে এখানেও মন্দির আছে অনন্তনাগের, ঝরণা আছে, অনন্ত চতুর্দশীতে বিরাট মেলা হয় এইখানে। চারি দিক থেকে অমনি কলরব উঠল, থামাও থামাও। বাস থামল একটা ময়দানের কাছে। আমরা নামব কিনা ভেবে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলুম, অনেকেই নেমে পড়ে মাঠের পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন একে একে আমরা সবাই নেমে পড়লুম। কিন্তু মামা মামী বসে রইলেন। মামী বললেন : খেয়ে দেয়ে আর মন্দিরে ঢুকব না।

মামা বললেন : মন্দির আছে জানলে যাবার পথেই নামতুম।

স্বাতি ও আমি এগিয়ে গেলুম অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে।

খানিকটা হাঁটতে হল। অন্য কোনখানে দাঁড়ালে হয়তো কম হাঁটতে হত। কিন্তু এ দেশে হাঁটতে কষ্ট হয় না। রৌদ্র আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই। মন্দির প্রাঙ্গণ তো একেবারে ছায়ায় ঘেরা। চারি দিকে বড় বড় গাছ, শান্ত ও নির্জন। দু একটি পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। একটা কুণ্ডের উপর আমরা অনন্তনাগের মন্দির দেখলুম। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখলুম একটা গন্ধকের প্রস্রবণ। আর ফেরার পথে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণকে দেখলুম। তিনি এই মন্দিরেই বসবাস করছেন। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করবার সময় পেলে হয়তো এই স্থানের অনেক কথা জানা যেত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। যাত্রীরা সবাই ফিরে যাচ্ছেন। সামনে এখনও অনেক পথ বাকি। আমরাও তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

বাসে ফিরে আসতেই মামী জিজ্ঞাসা করলেন : কী দেখলে ?

স্বাতি বলল : একটা মন্দির।

কোন্ দেবতার মন্দির ?

দরজা বন্ধ ছিল বলে ঠাকুর দেখতে পাই নি।

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : স্বামী অভেদানন্দের গ্রন্থে মসজিদের কথা পড়েছি।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে এসেছিলেন। জায়গার নাম অনন্তনাগ লেখেন নি, লিখেছেন ইসলামাবাদ।

তাঁর গ্রন্থে ইসলামাবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তিনি লিখেছেন যে কাশ্মীরে যে কয়েকটি বড় বড় শহর আছে, তাদের মধ্যে শ্রীনগরের পরেই ইসলামাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। লোকসংখ্যা বিশ হাজার। এই শহরে তিনি অনেক বস্ত্র-শিল্পীর বাস দেখেছেন, তাদের হাতের কাজ বলেছেন শিল্প জগতে অতুলনীয়। চতুর্দিকে পর্বত-বেষ্টিত, নানাবিধ ফল এবং ফুলে বৃক্ষলতা পূর্ণ ও নদীবহুল এই শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। এক স্থানে একটি পাহাড় থেকে দুটি সুন্দর ঝরণা প্রবাহিত হয়ে দুটি জলাশয়ে পড়েছে। তার নিকটে মহারাজা কাশ্মীরের একটি বাগানবাড়ি ও একটি দেবালয় আছে। শহরের মধ্যে আরও কতকগুলি ঝরণা আছে, তাদের একটির জল গন্ধক মিশ্রিত ও আর একটির উপর একটি সুন্দর মসজিদ কৌশলে জম্মান হয়েছে।

আমার কথায় মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: ইসলামাবাদ কেন?

বললুম: সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ এই নাম রেখে-ছিলেন। তাঁর অধীনে এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ইসলাম খান। বাদশাহ তাঁর নামেই এই স্থানের নাম রেখেছিলেন ইসলামাবাদ।

তারপর?

তারপরে কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামাবাদ নাম তুলে দিয়ে অনন্তনাগ নামের পুনঃ প্রচলন করেন।

স্বাতি বলল: গোলমালে ফেললে।

কেন?

অভেদানন্দ স্বামী এ দেশে এসেছিলেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এ জায়গার নাম ছিল ইসলামাবাদ।

বললুম: এ কথাও সত্য। আমার মনে হয়, দীর্ঘ দুশো বছরে এ

জায়গার অনন্তনাগ নাম সবাই ভুলে গিয়েছিল। পুরনো নাম পুনরায় চালু হতে সময় লেগেছিল অনেক দিন।

মামা বললেন : বাহাত্তর বছর একটু বেশি সময় বলে মনে হচ্ছে।

আমি এ কথাব প্রতিবাদ করতে পারলুম না।

অনন্তনাগ থেকে আমরা নূতন পথে যাচ্ছিলুম। সাড়ে চার মাইল দূরে ভাবন নামে একটা জায়গায় এসে বাস আবার থামল। আমরা সবাই নেমে পড়লুম।

একটি বড় জলাশয়ের ধারে মন্দির। বিজয় সপ্তমীর দিন নানা স্থান থেকে এখানে লোক আসে। কুণ্ডের জলে স্নান করে তারা পিতৃপুরুষেব শ্রাদ্ধ করে।

মার্তণ্ড মন্দির আমরা এখানেই ভেবেছিলুম, পরে শুনলুম যে তা নয়। কাশ্মীবের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিব তু মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে সূর্যেব মন্দির দেখে আসতে অনেক সময়ের দরকার।

আচ্ছাবল থেকে মার্তণ্ড মন্দিরে যাবাব একটি পায়ে চলার পথ আছে। সে পথ অনন্তনাগ ঘুরে আসে নি। পাহাড়েব উপর দিয়ে চাব মাইল হাঁটলেই মন্দিবে পৌঁছনো যায়।

এই মন্দিরের কথা আমি অনেক জায়গায় পড়েছি। একদা ভারতবর্ষে যে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন আজ বেশি জায়গায় নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় সূর্য পূজার প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কোণারকে, আমেদাবাদের নিকট মধেরায় আর কাশ্মীরের এই মার্তণ্ড মন্দিরে। পাহাড়ের উপরে একটি সমতল স্থানে এই মন্দির। দূরে কাশ্মীরের উপত্যকা, তার পিছনে পীর পাঞ্জালের তুষারধবল শৃঙ্গগুলি আকাশের নীলিমায় মিশে আছে। স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেণ্ড বলেছিলেন, It is one of the most heavenly spots on earth, not too grand to be overpowering, nor too

petty to be lacking strength, and it is easy to understand the impulse which led to a people to raise here a temple to heaven.

বাসে ফিরে এসে মামা বললেন: আমি ভেবেছিলুম, পথের ধারেই এই মন্দির দেখতে পাব।

স্বাতি বলল: আমিও তাই ভেবেছিলাম।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন: ভাঙা মন্দির, না গোটা?

মার্তণ্ড মন্দিরেব ছবি আমি বইএ দেখেছিলুম। বললুম: ভাঙা মন্দির।

আশ্বস্ত হয়ে মামী বললেন: তবে আর তার জন্যে এত আফসোস কেন!

এই আফসোসের কারণ কটা লোকে বোঝে! টাকা আনা পাই দিয়ে যদি এই ক্ষতির পরিমাণ মাপা যেত, তাহলে সবাই বুঝত। মামীকে এ কথা বোঝাবার আমি কোন চেষ্টা করলুম না।

মার্তণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল নিয়ে কিছু আজগুবি কথাও প্রচলিত আছে। একটা বেসরকারী গাইড বইএ দেখেছি যে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে রামদেব নামে একজন রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজা ললিতাদিত্য এই মন্দির সংস্কার করে নূতন প্রাচীর যোগ করে দেন।

রাজতরঙ্গিণীতে এই রামদেবের কোন পরিচয় নেই। রাজতরঙ্গিণীর রামদেব রাজত্ব করেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। মোটামুটি ভাবে ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন যে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল দেড় হাজার থেকে দু হাজার বছর আগে। তারপরে মহারাজা ললিতাদিত্য এর উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

কাশ্মীরের ইতিহাসে ললিতাদিত্য একটি অবিস্মরণীয় নাম। নিঃসন্দেহে তিনি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ রাজা। কিন্তু তিনি এক নর্তকীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। ললিতাদিত্যের পিতা ছিলেন মহারাজা

প্রতাপাদিত্য। ইনি কাশ্মীরের চীনা পরিব্রাজক হিউ এন চাঙকে দেখেছিলেন।

ওপাশ থেকে স্বাতি বলল : গোপালদা নিশ্চয়ই ললিতাদিত্যের কথা ভাবছে। ·

আমি চমকে উঠে বললুম : কেন বল তো ?

স্বাতি বলল : মার্তণ্ড মন্দিরের সঙ্গে তো ললিতাদিত্যের নাম জড়িয়ে আছে !

বললুম : আমি তার আগের কথা ভাবছি। কাশ্মীরের রাজা বালাদিত্য বঙ্কালা নামে এক দেশ জয় করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে বঙ্কালাই বাঙ্গলা। কিন্তু বঙ্কালা দেশে তিনি কালম্ব্য নামে নগর স্থাপন করেন। শ্রীলঙ্কার রাজধানী হল কলম্বো। সে যাক। এই বালাদিত্য তাঁর কন্যা অনঙ্গলেখার বিয়ে দিয়েছিলেন দুর্লভ বর্ধন নামে একজন কায়স্থ সুপুরুষের সঙ্গে। যথাসময়ে এই দুর্লভ বর্ধন রাজ্যের মন্ত্রীর চেষ্টায় রাজা হয়েছিলেন।

স্বাতি বলল : হঠাৎ এই দুর্লভ বর্ধনের কথা কেন ?

কথা এই জন্যই যে এঁরই আমলে হিউ এন চাঙ কাশ্মীরে এসেছিলেন। আর তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য বিয়ে করেছিলেন একজন নর্তকীকে। ললিতাদিত্য এই নর্তকীর কনিষ্ঠ পুত্র।

মামা এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন : গল্পটা তাহলে পুরোপুরি বল।

বললুম : প্রতাপাদিত্য নিজের নামে প্রতাপপুর স্থাপন করেন। এই নতুন শহরে অনেক বণিক বাস করতে আসে। তাদের মধ্যে একজন মঠ স্থাপন করলে রাজা খুশী হয়ে তাঁকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। রাজা তাঁকে আদর যত্ন করে খাওয়ালেন এবং রাত্রে থাকবার ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন। সকাল বেলায় রাজা বণিককে জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে সুনিদ্রা হয়েছে তো ? বণিক বললেন, ঘরে যে আলো জ্বলছিল, তার ধোঁয়ায় একটু মাথা ধরেছে।

পরে সেই বণিক এক দিন রাজাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। রাজা দেখলেন যে তাঁর বাড়িতে কোন বাতি নেই, একটা মণির আলোয় সমস্ত বাড়ি আলোকিত হয়ে আছে। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হলেন নরেন্দ্রপ্রভা নামে একটি নর্তকীকে দেখে। দুজনেই দুজনকে দেখে মুগ্ধ হলেন। পরে বণিক এই কথা জানতে পেরে নর্তকীকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। চন্দ্রাপীড় তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় এঁদের তিন পুত্র। এঁরা বজ্রাদিত্য উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে একজনের পর আর একজন রাজা হয়েছিলেন। প্রথম দুই ভাই বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি, ব্রাহ্মণের অভিচার ক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল।

মামা বললেন: কী রকম?

তারাপীড় এক ব্রাহ্মণকে এই কাজে নিয়োগ করেছিলেন। বড় ভাইকে বধ করে তিনি রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য অন্য এক ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিচার ক্রিয়ায় বধ করে।

স্বাতি প্রশ্ন করল: অভিচার কী?

বললুম: নিজের ইষ্ট বা অন্যের অনিষ্টের জন্যে তান্ত্রিক ক্রিয়া, কতকটা তুকতাকের মতো। তারাপীড়ের মৃত্যুর পরে অবিমুক্তাপীড় ললিতাদিত্য নাম নিয়ে কাশ্মীরের রাজা হলেন। এই মহাপরাক্রান্ত রাজা সমস্ত ভারত জয়ের চেষ্টায় সারা জীবন কাটিয়েছিলেন। কনৌজরাজ যশোবর্মাকে পরাজিত করেন, গৌড় কলিঙ্গ কর্ণাট জয় করেন। ভারতের প্রধান দেশগুলি জয় করবার পরে কাম্বোজ ভুখার ভোট ও দরদ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। নিজের দেশেও তিনি নানা সৎকার্য করে বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু ললিতাদিত্যের গৌরবের কথা থাক, আমি এবারে বাঙালীর গৌরবের কথা বলব।

মামা বললেন: কাশ্মীরে আবার বাঙালীর গৌরব কী?

রাজতরঙ্গিণীর কবি কহলন মিশ্র আমাদের এই গৌরবের অধিকারী করে গেছেন। গৌড়ের রাজা যখন ললিতাদিত্যের নিকট

ছিলেন, তখন তিনি এক ঘাতককে দিয়ে তাঁর প্রাণ নাশ করেন। এই কথা জানতে পেরে গৌড় থেকে কয়েকজন বীর প্রতিশোধ নেবার জন্য কাশ্মীরে ছুটে এসেছিলেন। প্রথমে তারা ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত পরিহাসকেশবের মন্দির লুঠ করবে ভেবেছিল, কিন্তু ভুল করে রামস্বামীর মন্দির ধ্বংস করে। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না, পরে তাঁর অগণিত সৈন্য এসে গৌড়ের সেই বীরদের বধ করে। বাঙালীর বীরত্ব ও রাজভক্তি দেখে কহ্লন লিখেছেন—

অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামী পুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড় বীরানাং সনাথং যশসা পুনঃ॥

পরে এই রাজবংশের জয়াপীড়ের সঙ্গে গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণ দেবীর পরিণয় হয়েছিল। সেই সঙ্গেই বুঝি কাশ্মীরের সঙ্গে বাঙলার আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

লীডার নদীর ধারে ধারে পহলগামের পথ। সেই পথে আমাদের বাস এখন প্রবল বেগে ছুটেছে। আর একটু পরেই আমরা পহলগামে পৌঁছব।

পহলগাম নামটি যে পয়লা গাঁও কথা থেকে এসেছে, তা কাউকে বলে দিতে হয় না। কিন্তু কারা এই গ্রামকে পহলা গাঁও বলত, সেইটিই ভাববার কথা। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে যারা আসত, তাদের কাছে এ স্থান প্রথম গ্রাম নয়। যারা উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে হিমালয় পেরিয়ে আসত, তারাই এখানে মানুষের প্রথম বসতি দেখতে পেত। খ্রীষ্টের জন্মের ছ হাজার বছর আগে সভ্য মানুষের বসতি ছিল ভারতের সিন্ধু উপত্যকায়, ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় ও মিশরের নীল নদের ধারে। বিদেশীরা তখন মিশরের মেম্ফিস নগর থেকে ব্যাবিলনের দক্ষিণে উর শহর হয়ে মহেঞ্জোদারোর দক্ষিণে পওল শহরে আসত। তারপর মধ্য এশিয়ার বণিকেরা কাশগড় থেকে অক্সাস নদীর তীরে বাল্‌খ্ বামিয়ান হয়ে সিন্ধু নদেব তীরে তীরে এই পওল শহরে এসে মিলত। হরাপ্পা ছিল শতদ্রু নদীর উত্তরে। এই অবস্থা চলেছিল চার হাজার বছর। কাশ্মীর উপত্যকায় তখনও বিদেশীদের আনাগোনার কথা শোনা যায় না।

তারপর আর্যদের প্রথম উপনিবেশ হল এই অঞ্চল। গান্ধার সপ্তসিন্ধব ও ব্রহ্মাবর্ত। হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালার নানা গিরিদ্বার দিয়ে তারা ভারতে এল। খ্রীষ্টের জন্মের তিন চার শো বছর আগে পর্যন্ত বিদেশীরা এই পথেই আসত ভারতবর্ষে। গ্রীকরাও এসেছিল। ধীরে ধীরে পথের কিছু পরিবর্তন হল। রেশমের ব্যবসায়ের জন্য নূতন পথ হল আবিষ্কৃত। চীন থেকে কাশগড় তশকুরগান হয়ে ভারতে আসবার পথ। প্রথমে তক্ষশীলায় এল বাল্‌খ্ ও বামিয়ান হয়ে, তারপরে হিমালয় অতিক্রম করল নানা পথে। এমনি কোন দল লাদাখ থেকে জোজিলা পাস হয়ে কাশ্মীরে এসেছিল, বরফের নদী পার হয়ে অমরনাথের পথে পহলগাম। তখন এই স্থানের কী নাম ছিল জানা নেই, মানুষের বস্তি দেখে সেই

বণিকের দল এ জায়গার নাম রেখেছিল পয়লা গাঁও। এখন আমরা বলি পহলগাম।

লীডার নদীর তীরে তীরে আমরা পহলগামে এসে পৌঁছলুম। বাজারের সদর রাস্তা ধরে খানিক দূর এসে আমরা ডান দিকে ফিরে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামলুম। ফেরার বাস বিকালে ছাড়বে। মধ্যাহ্নের সূর্য এখন মাথার উপরে। এইটুকু সময় আমাদের বেড়াবার সময়।

মামা মাটিতে পা দিয়েই বললেন: অথ কিম্?

মামী জিজ্ঞাসা করলেন: পহলগামে দেখবার কী আছে?

স্বাতি বলল: তাই তো! যাত্রীরা এখান থেকে অমরনাথে যায়, যায় কোলাহাই গ্লেসিয়ার দেখতে। চন্দনবাড়ির আইস ব্রীজ দেখতে হলেও গোটা একটা দিন সময় লাগে।

পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে এক একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে হোটেল আছে। একটা ডাকবাংলো আর কয়েকটা টুরিস্ট হাট আছে এখানে। অসংখ্য তাঁবুও ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখানে রাত্রিবাস করতে আসি নি। যেমন করে আচ্ছাবল ও অনন্তনাগ দেখেছি, তেমনি করে পহলগাম দেখে আমরা একটু পরেই ফিরে যাব। স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি বললুম: লীডার নদীর ধারে একটু বেড়ানো যাক, তারপরে অমরনাথের পথটা দেখে ফেরা যাবে।

স্বাতি বলল: বিকেলে আমাদের বাস তো চারটের পর ছাড়বে, বাসে উঠবার আগে একটা ভাল হোটেলে চা খেয়ে নিতে হবে।

মামীর দিকে চেয়ে মামা বললেন: তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো!

মামী বললেন: কী করব তাহলে?

এখনি একটা হোটেলে গিয়ে উঠব।

মামী কোন হোটেলে বিশ্রাম করতে চাইলেই মামা বোধহয় খুশী হতেন, কিন্তু তিনি অন্য কথা বললেন: অমরনাথ দর্শনে তো নিয়ে যাবে না, রাস্তাতেই একবার মাথা ঠেকিয়ে আসি।

হতাশ ভাবে মামা বললেন : তাই কর।

উপর থেকে নিচে নেমে বাজারের পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে নদীর ধারে যাবার পথ পেলুম। পহলগামের বুকের মাঝখান দিয়ে নেমেছে লীডার নদী। লীডার এই উপত্যকারও নাম। এই নদীর জন্ম কোলাহাই পাহাড়ে, লীড়ারওয়াট ও আরুর পাশ দিয়ে পহলগামে এসেছে। তারপর পথের ধারে ধারে বয়ে গিয়ে খানাবলের কাছে অনেক নদীর জটলার সঙ্গে মিলেছে। কোকরনাগ ব্রীঙ্গ উপত্যকায়, ব্রীঙ্গ নামে একটি নদীও আছে। এই উপত্যকার আরও অনেক নদী পরস্পর মিলিত হয়ে লীডার নদীকেও সঙ্গে নিয়ে ঝিলমে পড়েছে।

পথের ধারে দোকান মাত্র এক সারি। তারপরই খানিকটা মাঠ পেরিয়ে লীডার নদী। ঝিলমের মতো প্রশস্ত নয়, কিন্তু খরস্রোতা। দুধারের উপলখণ্ডে সবেগে আঘাত করে বয়ে যাচ্ছে। ওপারের প্রান্তর মিশেছে পাহাড়ের গায়ে। এপারেও মাটি স্তরে স্তরে উপরে উঠেছে। পিছনে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি তার রঙ নীল। ঐ নীল পাহাড়ে কোন সবুজ গাছপালা নেই, বরফও নেই। আর কিছু দিন পরে যে বরফে সাদা হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তারই নিচে দিয়ে লীডার নদী নেমে আসছে। তখন আরও অপরূপ দেখাবে এই দৃশ্য।

নদীর দুদিকে দুটো পুল দেখতে পাচ্ছি। তার উপর দিয়ে ওপারে যাবার পথ. ওপারে দূরে দু একটা ঘর বাড়িও আছে। একটি নাকি রেলের রেস্টহাউস, রেলের কর্মচারীদের অল্প ভাড়ায় থাকবার ব্যবস্থা। হালদার মশাই তো এখানেই রেলের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা কোথায় ছিলেন জানি না।

শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরের এই শহরটি সমুদ্র সমতল থেকে সাত হাজার দুশো ফুট উঁচুতে। এমন উঁচু উপত্যকায় নদী প্রবাহিত হতে আমরা দেখি নি। যাঁরা কেদারবদরী গেছেন, কিংবা গঙ্গোত্রী

যমুনোত্রী, তাঁরা দেখেছেন। শ্রীনগরে ঝিলম নদী বইছে দু হাজার ফুট নিচু দিয়ে।

পহলগাম থেকে পায়ে হাঁটা পথ বেরিয়েছে ছুটো। একটি পথ পূর্ব মুখে অমরনাথের দিকে গেছে, অন্যটি গেছে উত্তর মুখে কোলাহাই গ্লেসিয়ারের দিকে লীডার নদীর তীরে তীরে। কোলাহাই যাতায়াতে পাঁচ দিন সময় লাগে। প্রথম দিন পহলগাম থেকে আরু, দ্বিতীয় দিন আরু থেকে লীডারওয়াট, আর তৃতীয় দিন কোলাহাই গ্লেসিয়ার দেখে লীডারওয়াটে ফিরে আসা। ইচ্ছা করলে তার পরের দিন তারসর হ্রদ দেখে আসা যায়। ফেরার জন্য আরও দু দিন।

পহলগাম থেকে সাত মাইল*দূরে আরু একটি সুন্দর জায়গা। লীডার নদী যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ষাট হাত দূরে আবার চোখের সামনে ফিরে আসে। সেখান থেকে লীডারওয়াটের দূরত্ব সাত মাইল। সমুদ্র সমতল থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে এই স্থানটি লীডার উপত্যকায় সব চেয়ে সুন্দর।

কোলাহাই পাহাড় আঠারো হাজার ফুট উঁচু। চার হাজার ফুট নিচে পাহাড়ের পাদদেশে বইছে বরফের নদী। এত উঁচুতে রাত্রিবাস করা একেবারেই অসম্ভব। যাত্রীরা তাই প্রত্যূষে লীডারওয়াট থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। নীল আকাশের নিচে রৌদ্রকরোজ্জ্বল শুভ্র গিরিশৃঙ্গ, সেখান থেকেই নেমে আসছে তুষার নদী। লীডার নদীর পারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই রূপ আমরা কল্পনা করতেও পারি নে।

লীডারওয়াট থেকে যাত্রীরা পহলগামে ফেরে না। তিন মাইল দূরে তারসর হ্রদ দেখতে যায় তারসর নদীর তীরে তীরে। এই জলস্রোত লীডার নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পাহাড়ে ঘেরা এই সুন্দর হ্রদটি প্রায় সাড়ে বারো হাজার ফুট উঁচুতে। উপর থেকে অদূরে নাকি আরও একটি হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়। তার নাম মারসর। কিন্তু আমরা এ সব দেখতে আসি নি, আমরা পহলগামের

এই নদীর ধার থেকেই শ্রীনগর ফিরে যাব।

মামা স্বাতিকে প্রশ্ন করলেন: তারপর?

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: রাতে এখানে থাকবার জন্য তৈরি হয়ে এলে শেষনাগ নদীর দিকে যেতে বলতুম।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে আবার কোন্ নদী?

বললুম: শেষনাগ হ্রদ থেকে এই নদী বেরিয়ে এসে লীডারের সঙ্গে এই পহলগামেই মিলেছে, সেই দৃশ্য নিশ্চয়ই সুন্দর।

মামা বললেন: তাহলে আমরা এখানে দুদিন থাকবার জন্যে তৈরি হয়ে এলুম না কেন!

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি, বলল: কী হবে এখানে থেকে! এই নদী, এই পাহাড় আর ওপারের ঐ পাইন বন, এই তো পহলগাম।

নদীর ধার থেকে আমরা বাজারের পথে ফিরে এলুম। শহরে অনেকগুলো হোটেল আছে, কিন্তু আমরা কোন হোটেলে গেলুম না চা খেতে। রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে স্বাতি বলল: চমৎকার ব্যবস্থা এইখানে।

স্বাতির পছন্দ দেখে মামা আশ্চর্য হলেন। আর মামী বললেন: ছি ছি, এখানে কেন!

বড় তাওয়ায় দোকানী আলুর টিকিয়া ভাজছে, আরা ধোয়া উঠছে গরম চাটু থেকে। বললুম: দেখছেন না কী সুন্দর খাবার।

বলে আমিও দোকানে ঢুকে পড়লুম।

স্বাতির পছন্দ বুঝতে পেরে মামা বললেন: তাইতো দেখছি।

মামীও আর ইতস্তত করলেন না।

অমরনাথ যাত্রার কথা আমরা কিছু শুনেছিলুম দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের কাছে, আর বাকিটুকু শুনলুম হালদার মশায়ের মুখে। দেবপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল জ্বালামুখীর পথে। বাসে অনেক গল্প হয়েছিল, অনেক জায়গার কথা। আর পহলগাম থেকে ফিরে এসে দেখলুম, হালদার মশাই আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। পথে মামা অমরনাথের কথা শুনতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম: শ্রীনগরে পৌঁছে হালদার মশাইকে ধরে আনব। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই তীর্থস্থানের কথা শুনব।

স্বাতি বলেছিল: তিনি এখন কোথায় আছেন তা জান?

সত্যিই, রেলের দল চলে যাবার পরে তিনি কোথায় গিয়ে উঠেছেন তা জানি নে। তাই বলেছিলুম: উইল পাওয়ারে টেনে আনতে হবে।

হাউসবোটে ফিরে আমরা যখন হালদার মশাইকে সামনে দেখলুম, মামা বললেন: তোমার উইল পাওয়ারের জোর আছে গোপাল!

হালদার মশাই কথাটা বুঝতে পারেন নি দেখে মামা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন: মনের জোরে গোপাল আপনাকে টেনে আনবে বলেছিল, এখন দেখছি সত্যিই টেনে এনেছে।

হালদার মশাই আকর্ণ দাঁত বার করে হাসলেন, বললেন: গোপালবাবু সত্যিই আমাকে ভালবাসেন।

মামাও সহাস্যে বললেন: তাই তো দেখছি।

হালদার মশাই হেঁ হেঁ করে বললেন: কিন্তু কালীকেষ্ট হালদারকে দরকার হয়েছে কেন!

বললুম: আপনার মুখে অমরনাথের গল্প শুনব।

মামী ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। স্বাতি হালদার মশাইকে

বলল্প : আপনি বসুন, আমরা মুখ হাত ধুয়ে এখুনি আসছি। আর কী খাবেন, চা না কফি?

না না, কফি নয়। ও হুঁকোর জল আমি খেতে পারি নে।

স্বাতি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

মামা প্রশ্ন করলেন: হালদার মশায়ের আজ আহার হবে কোথায়?

হালদার মশাই গদগদ ভাবে বললেন: তাব জন্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই। পাঞ্জাবীদেব হোটেল আছে, মাংসটা ওরাই বাঁধতে জানে।

মামী এসে বললেন: আপনি আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন।

মামা বিহ্বল ভাবে তাকালেন মামীর দিকে। হালদাব মশাইও অভিভূত হয়ে বললেন: না না, হাঙ্গামা করবার দরকাব কী!

মামী বললেন: হাঙ্গামা আবাব কিসেব! ঘরে যা আছে—

তাই যথেষ্ট।

বলে হালদার মশাই আবার তাঁব দাঁত বার কবে হাসলেন।

তারপব অমরনাথ যাত্রাব কথা।

সত্য যুগে এই স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিলেন হিমালয় ভ্রমণরত মহর্ষি ভৃগু। কাশ্মীবে তখন তক্ষক নাগের রাজত্ব। মহর্ষি কশ্যপ তার আগে জলদৈত্য ধ্বংস করে এই উপত্যকাকে বাসোপযোগী করে গিয়েছিলেন। ভৃগু একটি দণ্ড তক্ষকের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, অমরনাথের দুর্গম পথে যাত্রাব জন্য এই অভয় দণ্ড রাখো, এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে পথে কোন বিপদ হবে না।

এই কাহিনী সত্য না কাল্পত সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমানে কাশ্মীরের ধর্মার্থ সঙ্ঘেব মোহান্ত একটি রৌপ্য দণ্ডের অধিকারী, তার প্রচলিত নাম ছড়ি। প্রতি বছর শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ছড়ি সামনে নিয়ে অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়। শারদা পীঠের শঙ্করাচার্য থাকেন সকলের আগে। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রীরা এসে অমরনাথ কদলের নিকট দশনামী আখড়ায় সমবেত হয়। তৎপর ছড়ি ওঠেন

কাশ্মীর রাজসরকার। পথঘাট ও পুল মেরামত, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, ধর্মার্থ বিভাগের কর্মীরা এই দশ হাজার যাত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করেন।

হালদার মশাইকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি শ্রীনগর থেকেই পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন?

হালদার মশাই বললেন: পাগল নাকি! সে সব দিন আর নেই যে লোকে ছড়ি বলতে অজ্ঞান। ছড়ির প্রতিষ্ঠা হবে, লোক জমবে, সাধু সন্তের ভাণ্ডারা, বড়লোকের দান খয়রাতি, সরকারী সাহায্য— টাকা পয়সা গরম কাপড়, যার যা দরকার। ছড়ি সাহেব বেরবেন রাত তিনটেয়, যাত্রীরা তার পিছনে পিছনে যার যখন খুশি। গ্রামের লোকেরা কোমর বেঁধে যাত্রীদের সেবার জন্য তৈরি হয়। ছড়ি আর যাত্রীর একটা সন্ধ্যা সেবা করেই তাদের জন্ম সার্থক।

সত্যিই তাই। কিছু দিন আগেও লোকের এই ধারণা ছিল। এখন আমরা এই ধারণাকে কুসংস্কার বলে মনে করি।

হালদার মশাই বললেন: শ্রীনগর থেকে এখন শুধু সাধুসন্তরাই ছড়ি নিয়ে যাত্রা করেন, আর সামান্য কিছু যাত্রী। অন্য সবাই মোটর বাসে পহলগামে গিয়ে ছড়ির অপেক্ষা করেন। পহলগাম থেকে এক সঙ্গে যাত্রা দ্বাদশীর দিন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ যখন অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন, তখনও পহলগাম পর্যন্ত মোটরের পথ সম্পূর্ণ হয় নি। রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। বেশির ভাগ যাত্রীই শ্রীনগর থেকে ছড়ির সঙ্গে যাত্রা করেছিল, আর তিনি রাজ-অতিথি রূপে সরকারী মোটরে আইসমোকাম পর্যন্ত এসে দলে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীনগর থেকে হেঁটে এলে আইসমোকাম আসতে পাঁচ দিন সময় লাগে। দিনে আট দশ মাইল হাঁটতে হয়। রাত্রিবাসের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ভোর বেলায় যাত্রা করে সেইখানে পৌঁছেই বিশ্রাম। প্রতি দিনের এই খণ্ড যাত্রার নাম পড়াও। শ্রীনগর থেকে পহলগাম পৌঁছতে ছটি পড়াও অতিক্রম

করতে হয়। শ্রীনগর থেকে পামপুর, অবন্তীপুর, তারপর বিজবিহার। পুরাকালে বৌদ্ধ কীর্তির জন্য এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখন এটি বড় রাস্তার ধারে একটি গ্রাম, আর অমরনাথ যাত্রার পথে তৃতীয় দিনের পড়াও।

বিজবিহার থেকে আইসমোকাম পর্যন্ত একটি পায়ে হাঁটা সংক্ষিপ্ত পথ আছে। কিন্তু যাত্রীরা সে পথে যায় না। চতুর্থ দিনের পড়াও হল অনন্তনাগ হয়ে মাটন বা মার্তণ্ড। অমরনাথের পাণ্ডারা থাকেন মাটনে, পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা আছে সেখানে। তারপর পাহাড়ের উপরে সূর্যের পূজা করে পঞ্চম দিনের পড়াও আইস-মোকাম। লীডার নদীর তীরে এই আইসমোকামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে স্বামী অভেদানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কাশ্মীর বা শ্রীনগরকে ভূস্বর্গ বললে এই স্থানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। কাশ্মীব প্রকৃতপক্ষে ভূস্বর্গের সমষ্টি।' চারিদিকে উঁচু পর্বতমালা, নিচে নদী, সবুজ সমতলভূমিতে অসংখ্য চিনার ও আখরোট গাছ দেখেই স্বামীজী এই কথা বলেছিলেন। এখন আমরা আইসমোকামে থামি না, সোজা পহলগামে চলে যাই। তাই আমরা একটি গ্রামের নাম শুনি না।

অমরনাথে যাত্রীদের কাছে যে প্রণামী পাওয়া যায়, তার এক তৃতীয়াংশ পায় বাটকুট গ্রামের মুসলমান অধিবাসীরা। এই গ্রাম আইসমোকাম থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে। অমরনাথের প্রণামী তিন ভাগ হয়। এক ভাগ ছড়ি সাহেবের অধিকারী মোহান্তের প্রাপ্য, অন্য ভাগ মাটনের পাণ্ডারা নেন এবং তৃতীয় ভাগ পায় বাটকুটের মুসলমান অধিবাসীরা। কেন পায় তার কারণ শোনা গেছে। এক সময় তারা অমরনাথের যাত্রাপথ রক্ষা করত, বরফ কেটে পাথর সরিয়ে অগম্য পথ যাত্রী চলাচলের উপযোগী করত। সেই কঠিন কাজের পুরস্কার তারা আজও পাচ্ছে।

একাদশীর দিন যাত্রীরা পহলগামে এসে পেঁছিয়।

হালদার মশাই বললেনঃ ভেবেছিলুম, সরকারী ছড়ি যাত্রার সঙ্গে আমিও যাব। কাপড় গামছা গেরুয়ায় ছুপিয়ে কোন সাধু সন্তের দলে ভিড়ে পড়তে পারলে খরচ পত্রের সুবাহা হবে। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তো চালাকি চলে না, সময় মতো পৌঁছতেই পারলুম না।

কেন ?

কেন আবার! গাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল বার কয়েক। পুণ্য সঞ্চয় করে ফেরার পথে তো আর বিনে টিকিটে ফেরা যাবে না, তাই আসার পথেই একখানা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেছিলুম।

হালদার মশাইএর কথা শুনে মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন।

ভদ্রলোক এই হাসিতে চটে উঠে বললেনঃ গরিবের দুঃখ তো বোঝেন না, তাই হাসছেন। এই ভূস্বর্গে এসে সবাই মুঠোমুঠো টাকা ওড়াচ্ছেন, কিন্তু কালীঘাটে মানৎ করে পূজো দিচ্ছেন পাঁচ সিকের আর সোয়া পাঁচ আনার। কালীকেষ্ট তীর্থ করতে বেরবে কি হাওয়াই জাহাজে চড়ে!

আমি বললুমঃ বুঝেছি বুঝেছি, বলুন তার পরে।

তা আপনি বুঝবেনে বৈকি! মামা না থাকলে বইএর পাতায় ভূস্বর্গ দেখতে হত!

স্বাতি হাসছিল তাঁর কথার ধরনে। এবারে বললঃ অধর্ম করে এলে কি পুণ্য হয়!

অধর্ম কিসের! পয়সা নেই বলে কি দেবতার দর্শন হবে না, না দেবতা ধনীদেরই নিজস্ব সম্পত্তি!

প্রায় সেই রকমই। দেবতা যখন সকলের ছিলেন, তখন এই সব পাহাড়ে দুর্গম স্থানে স্বয়ম্ভু হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। হৃদয়ে যাদের ভক্তি ছিল, তারাই দেবতার দর্শনে আসত প্রাণের মায়া ত্যাগ করে।

হালদার মশাই একটা ভেংচি কেটে বললেনঃ মানুষের কাঁধে

চড়েও আসত, যেমন এখনও আসছে।

মামী এ সব আলোচনা পছন্দ করেন না। বললেন: আপনি কি দ্বাদশীতে যাত্রা করলেন?

মামীর প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক নরম হয়ে গেলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কই আর পারলুম! অমরনাথের আসল দর্শন হল শ্রাবণের রাখী পূর্ণিমায়। লোকে আষাঢ় ও ভাদ্র পূর্ণিমাতেও যায়। তখন তুষার লিঙ্গের পূর্ণ অবয়ব। কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে ক্ষয় হতে হতে অমাবস্যার দিন অদৃশ্য হয়ে যান, আবার শুক্লপক্ষে দিনে দিনে বৃদ্ধি।

মামা বললেন: ভারি আশ্চর্য তো!

আমি বললুম: আশ্চর্যের বৈকি। প্রায় তের হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গুহার ভিতরে চন্দ্রকলার সঙ্গে ক্ষয় বৃদ্ধি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

মামা বললেন: গুহার ছাদ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে বরফের লিঙ্গ তৈরি হচ্ছে। দিনে দিনে তা বাড়াই উচিত, ক্ষইবে কেন!

মামা চোখ বুজে বললেন: সবই দেবতার মাহাত্ম্য।

হালদার মশাই এ কথা সমর্থন করে বললেন: মাহাত্ম্যই বটে। নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাই মূর্খতা। তা না হলে ভগবানের ইচ্ছায় কালাকেষ্ট হালদারেরও কিছু কম বুদ্ধি নেই। কিন্তু দেবতার কাছে সব বুদ্ধিমানের গলায় দড়ি, সার্থক শুধু ভক্তি। পহলগামে পৌঁছে যখন শুনলুম যে সরকারী ব্যবস্থায় ছড়ি যাত্রা অমরনাথ দর্শন করে ফিরে গেছে, তখন সেখানকার রামজীর মন্দিরেই হত্যা দিয়ে পড়লুম। বাবা যদি নিজে থেকে ডেকে না নেন তো দেহটা ফেলে রেখেই তাঁর কাছে যাব। বুঝলেন গোঁসাইজী, ভক্তিই হল জীবনের শেষ কথা। আত্মসমর্পণ। বুকের ভেতর খাঁটি জিনিস থাকলে কোনও চাওয়াই অপূর্ণ থাকে না।

ঠিক এই মুহূর্তে হালদার মশায়ের একটা নূতন রূপ আমি দেখলুম। স্থির গম্ভীর আবেগময়, দু চোখের দৃষ্টি ছলছল করছে।

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে বললেন : সঙ্গী জুটে গেল, জুটিয়ে দিলেন অমরনাথ। দেশে যাদের ঘেন্না করি তাদেরই একজন বললে, চলুন হালদার মশাই, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি ইতস্তত করে বললুম, কিন্তু ধর্ম! কী উত্তর দিলে জানেন? বললে, তীর্থ যাত্রায় জাত ধর্ম সঙ্গে নেবেন না হালদার মশাই, ও পুঁটুলি এখানেই তোলা থাক, বাড়ি ফেরার সময় ঝেড়ে মুছে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : কার কথা বলছেন?

হালদার মশাই যেন সহসা সজাগ হয়ে বললেন : থাক সে কথা।

স্বাতি অন্য কথা জানতে চাইল, বলল : কী করলেন তারপর?

তারপর অমরনাথ যাত্রার উদ্যোগ। এ তো আর রামেশ্বর বা সোমনাথ যাত্রা নয় যে ট্রেন থেকে নেমেই ধুলো পায়ে দর্শন। এর একটা উদ্যোগ পর্ব আছে। তাঁবু চাই, রান্নার সাজ সরঞ্জাম খাদ্যদ্রব্য, গরম কাপড় ওষুধ পত্র, কী চাই না। তবে এ সব সংগ্রহের হাঙ্গামা কিছু নেই। সবই ভাড়া পাওয়া যায়, আর বইবার জন্যেও আছে কুলি আর ঘোড়া। পয়সা থাকলে নিজেও ঘোড়ায় চেপে কিংবা মানুষের কাঁধে যাওয়া যায় ডাণ্ডিতে চড়ে।

মামী বললেন : তবে তো আমরাও যেতে পারি।

হালদার মশাই বললেন : কেন পারবেন না! সঙ্গে করে গোটা সংসারটা নিয়ে যান না! ছোট বড় তাবু আছে, তার এক হপ্তার ভাড়া ছয় থেকে চোদ্দ টাকা, মাসের ভাড়া ষোল থেকে ছত্রিশ। স্নান পায়খানার আলাদা তাঁবু। পয়সা দিলে তাঁবু খাটাবার লোকও পাবেন। চেয়ার টেবিল খাট আলমারি সব নিয়ে যান সঙ্গে। রান্না খাবারের বাসন চায়ের সরঞ্জাম পেট্রম্যাক্স লণ্ঠন—কী চাই আপনার! শুধু পয়সার খেলা। আর শুধু—

শুধু কী?

চড়াই। পিষু ঘাঁটি আর মহাগুনস। উঠতে উঠতে বার বার মনে হবে যে ফিরে যাই।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: না না, ও রকম করে নয়, একেবারে গোড়া থেকে বলুন, পহলগাম থেকে।

হালদার মশাই খুব সংক্ষেপে পথের বর্ণনা দিলেন।

পহলগাম থেকে প্রথম পড়াও চন্দনবাড়ি প্রায় সাড়ে আট মাইল, উঁচু সা ড় ন হাজার ফুট। যাত্রীদের থাকবার জায়গা আছে। তাঁবু না খাটালেও চলে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: পহলগামে শেষনাগ নদী দেখেছেন?

দেখি নি তো।

দেখেন নি! আহা! শেষনাগ নদী এসে লীডাব নদীতে পড়েছে। আব এই শেষনাগ নদীতে আর একটা নদী মিলেছে চন্দনবাড়ি থেকে চাব মাইল দূরে অষ্টমমার্গ নামে একটা জায়গায়। গোপালবাবু এ সব জায়গা দেখলে ভাল করে বলতে পারতেন।

আমি বললুম: এ পথের বর্ণনা আমাদেব জানা। লোকালয় শেষ হয়ে গেল। উপত্যকাও হল সঙ্কীর্ণ। এক দিকে নীল গঙ্গা, আর অন্য দিকে পাহাড়। সরু পায়ে চলার পথ অসমতল। একজনের পিছনে আর একজনকে চলতে হচ্ছে সতর্ক ভাবে। প্রথমে ঘোড়াগুলো চলেছে, তার পরে তাদের রক্ষী, সবাব পিছনে আমরা।

হালদাব মশাই খুশী হয়ে বললেন: ঠিক ঠিক, এমনি করেই তো আমরা চলেছিলুম। চন্দনবাড়ি কেন, সমস্ত পথটাই এমনি, তবে চন্দনবাড়িতে আবার আমরা লোকালয় দেখলুম। আর দেখলুম, কী বলে সবাই—

আইসব্রিজ।

বরফের পুল। স্বাভাবিক বরফ এইখানেই আমরা প্রথম দেখলুম. পথে আর একটা সুন্দর গ্রাম দেখেছিলুম। কী যেন নামটা—

বললুম: ফাসলুন।

ঠিক ঠিক। আপনি জানলেন কী করে?

বইএ পড়েছি।

হালদার মশাই বললেন : তবে আপনার যাবার দরকার নেই।

স্বাতি বলল : আপনি আমাদের বলুন।

হালদার মশায় একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন : চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়েই পাহাড়ের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা। দেড় হাজার ফুট খাড়া উঠতে হবে। কোনও চালাকি চলবে না। পিছল পথ, পা হড়কালে গড়িয়ে একেবারে নিচে। ঘোড়া নয়, ডাণ্ডি নয়, নিজের পা দুখানাই সব চেয়ে নিরাপদ। পাহাড়ের শোভা দেখতে হয় তো একবার নিচে থেকে, আর একবার ওপরে উঠে। মাঝখানে দেখবার চেষ্টা করলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজীতে কী একটা অক্ষর আছে—

বললুম : Z।

জেডই তো বললে সবাই। পথ ঠিক ঐ রকম। পিঁপড়ের মতো মানুষ উঠছে। অন্য কিছু মনে হবে না। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। কেউ পকেট থেকে কিসমিস বার করে খাচ্ছে, কেউ লেবেন-চুষ। ঐ রসটুকুই অমৃত মনে হচ্ছে। বসে বিশ্রাম করবার উপায় নেই, একবার বসলে আর নাকি উঠে দাঁড়ানো যাবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দম নিতে হবে।

মামীর দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল : আমরা বোধহয় পারব না মা।

হালদার মশাই জোর দিয়ে বললেন : নিশ্চয়ই পারবেন। পাঞ্জাবী মেয়েরা উঠছে, বাঙালী মেয়েও তো উঠল দেখলুম। ওপরে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নেবার পর আর কোন কষ্ট থাকবে না। সঙ্গে চা খাবার থাকলে খেয়ে নিন, দেহে দ্বিগুণ বল পাবেন। তার পরে গল্প করুন, পিষু ঘাঁটি নাম কেন হল তাই নিয়ে। কাশ্মীরী ভাষায় পিসব কথার মানে পিছল, এই পথ অত্যন্ত পিছল বলেই চড়াইএর নাম পিষু ঘাঁটি।

হালদার মশায় একটু থেমে বললেন : একটা পৌরাণিক গল্পও আছে। দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে।

পাহাড়ের উপরে দেবতারা অমরনাথের ঘাঁটি আগলাচ্ছেন, আর নিচে থেকে দানবরা বলছে যে তারাও অমরনাথ দর্শনে যাবে। দু দলে তুমুল যুদ্ধ বাধল। কিন্তু দেবতারা ওপরে, দানবরা তাদের সঙ্গে পারবে কেন! দেবতারা তাদের পিষে ফেললেন। সেই থেকে এ জায়গার নাম হয়েছে পিষু ঘাঁটি।

কিন্তু যেখানে আমরা পৌঁছেছিলুম, তা প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। সামনেই জোজপাল উপত্যকা, তারপর কুট্টি-ঘাঁটির চড়াই পার হয়ে শেষনাগ হ্রদ। পুকুরের মতো ছোট হ্রদ, কিন্তু তার অপরূপ রূপ। চারি দিকে বরফের পাহাড় থেকে বরফের নদী নেমে এসে এই হ্রদে পড়েছে, আর সেখান থেকেই বেরিয়েছে শেষনাগ নদী।

আমি বললুম: এই দৃশ্য দেখেই স্বামী অভেদানন্দ বলেছিলেন, চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রি চূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষারনদী হচ্ছে তাঁর জটা।

হালদার মশাই বললেন: কথাটা মন্দ বলেন নি। আমার মতো বেরসিককেও খানিকক্ষণ বসে সেই শোভা দেখতে হয়েছিল।

বললুম: এবারে শেষনাগের গল্পটা বলুন।

শেষনাগের আবার কী গল্প?

বললুম:

দুগ্ধাব্ধিধবলং তেন সরো দূরগিরৌ কৃতম্।
অমরেশ্বর যাত্রায়াং জনৈরদ্যাপি দৃশ্যতে॥

হালদার মশাই ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

হেসে বললুম: রাজতরঙ্গিণীর শ্লোক। সুশ্রবস নাগ দূরের পাহাড়ে দুধের সাগরের মতো সাদা সরোবর রচনা করলেন। অমরনাথ যাত্রার পথে এখনও যাত্রীরা সেই সরোবর দেখে।

মামা আমাকে বললেন: গল্পটা তাহলে বলেই ফেল।

গল্প হল কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় বিভীষণের পুত্র নরের। নর রাজত্ব করতেন কিন্নর গ্রামে। তিনি ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু স্বভাব-

চরিত্র তত ভাল ছিল না। বিতস্তার তীরে একটি বাগানের মধ্যে যে সরোবর ছিল, তাতে বাস করতেন সুশ্রবস নাগ। তাঁর দুটি সুন্দরী কন্যা, নাম ইরাবতী ও চন্দ্রলেখা। তিনি বিশাখ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চন্দ্রলেখার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বাস করতেন নরের রাজধানীতে। চন্দ্রলেখা একদিন রোদে ধান শুকোতে দিয়েছিলেন। কোথা থেকে একটা ঘোড়া সেই ধান খেতে আসে। চন্দ্রলেখা সেই ঘোড়া তাড়াতে তার পিঠে হাত দিতেই একটা সোনালি ছাপ ঘোড়ার গায়ে পড়ে। চন্দ্রলেখার ওপরে রাজার দৃষ্টি আগেই পড়েছিল। এইবার তাঁর হাতের সোনালি ছাপ দেখে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। সরাসরি ব্রাহ্মণের কাছে এসে চন্দ্রলেখাকে চেয়ে বসলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ি তিনি ঘেরাও করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা স্বামী স্ত্রীতে সুশ্রবস নাগের কাছে পালিয়ে গেলেন। সমস্ত শুনে নাগ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা ও তাঁর রাজধানী ধ্বংস করে ফেললেন। তারপর অনেক নিরীহ প্রাণীর মৃত্যুতে অনুতপ্ত হয়ে দূর পর্বতে একটি সরোবর রচনা করলেন, তারই নাম শেষনাগ হ্রদ। এ দেশের লোক শেশ্রম নাগও বলে।

মামা বললেন : কবি কহ্লন কি এ সব গল্প তৈরি করেছেন!

বললুম : বোধ হয় না। এ দেশে প্রচলিত নীলমতপুরাণ হরবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। বলুন তারপরে!

বলে হালদার মশায়ের দিকে তাকালুম।

হালদার মশাই বললেন : শেষনাগ থেকে বায়ুযান দেড় মাইল দূরে। কেউ বলে বায়ু ব্যজন, কেউ বলে ওয়াবযান, আবার ঘোড়া-ওয়ালারা বলছিল ভাওজান। একটা খোলা মাঠের মাঝখানে একখানা ঘরে আমরা আশ্রয় পেলুম, কিন্তু বাতাসের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারলুম না। পাহাড় এখানে খানিকটা দূরে এবং সারাক্ষণ প্রবল বাতাস বইছে।

বললুম : দৈত্যের গল্পটা শুনেছেন তো?

না।

সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এক শিবভক্ত দৈত্য এখানে বাস করত। দেবতারা তার অত্যাচারে কাতর। বিষ্ণু শেষনাগকে পাঠিয়েছিলেন তাকে বধ করবার জন্য। তার মৃত্যুর পরেই ও জায়গাটা কিছু শান্ত হয়েছে।

হালদার মশাই বললেন ঃ ওর নাম শান্ত! রাতে যখন ঝড় উঠল তখন তো মরেই যাব ভেবেছিলুম। প্রথমে ঝড়, তারপর বৃষ্টি। ঠাণ্ডায় দেহটা বরফ হয়ে যাবে ভেবেছিলুম। কালীঘাটের মায়ের মানৎ করে রক্ষা পেয়ে গেলুম।

আমি হেসে বললুম ঃ বাবা অমরনাথের কথা মনে এল না?

আগে ঘরের মা, তারপর বাইরের বাবা।

হালদার মশায়ের কথার ধরনে সবাই হেসে উঠলেন।

আমি বললুম ঃ তারপর!

হালদার মশাই বললেন ঃ পরের দিনের পড়াও ভাওজান থেকে পঞ্চতরণী। পহলগাম থেকে পঞ্চতরণী প্রায় তেইশ মাইল পথ। আমরা তিন দিনে যাচ্ছি। ঘোড়াওয়ালাদের কাছে শুনলুম, সাহেব-মেমরা বেড়াতে এলে এক দিনেই পঞ্চতরণী আসে। ভারতীয়রা যে পারে না তা নয়, অনেক দলই দু দিনের পড়াও এক দিনে করে। সকালে একটা, আবার বিকেলে আর একটা। কিন্তু আমাদের কাছে একটা পড়াও অতিক্রম করাই কষ্টের মনে হচ্ছিল। উঁচু নিচু পথ পিছল, রাতে তুষারপাত হয়েছে। অত্যন্ত সতর্ক ভাবে আমাদের চলতে হচ্ছিল। আজ আমাদের দু হাজার ফুট উঁচু চড়াই পার হতে হবে। চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মহাগুনস এই পথের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। নিঃশ্বাসে টান ধরছিল। অনেকে নাকি বমিও করে, অসুস্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। অসুস্থ না হয়েও আমাদের ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। শুধু মনের জোরে আমরা সামনে এগোলুম, পৌঁছে গেলুম মহাগুনসের শীর্ষে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কী রকম দেখলেন সেখান থেকে ?

হালদার মশাই হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে, তারপরে বললেন ঃ ঠিক লোককেই এ কথা জিজ্ঞেস করেছেন। এক ঋষি ঐ পাহাড়ের মাথায় চারি দিকের শোভা দেখতে বসেছিলেন। এখনও বসে আছেন।

বলেন কি ?

এখন তাঁর নাম নগরপাল, বাবা অমরনাথের দ্বারপাল। তাঁর কাছে অনুমতি নিয়ে যাত্রীদের যেতে হয়।

অমরনাথ যাত্রার বর্ণনায় আমি এ কথা পড়েছি। বললুম ঃ ঋষি নয়, পাথর বলুন, বিরাট এক শিলাখণ্ড।

হালদার মশাই বললেন, সেই ঋষিই তো জমে বরফ হয়ে আছেন। আর অসংখ্য ফুল ফুটছে তাঁর চারি দিক ঘিরে। তেমন সুন্দর ফুল আমরা আর কোথাও দেখি নি।

তারপর ?

তারপরে আর চড়াই নেই। একে একে পাঁচটি নদীর বালি ও জল পেরিয়ে আমরা পঞ্চতরণীর প্রশস্ত মাঠে এসে পৌঁছে গেলুম। এখান থেকেই নাকি অমরগঙ্গার তীরে তীরে লাদাখের সীমান্ত বালতাল গ্রামে পৌঁছানো যায়। পথ মাত্র ন মাইল।

জোজিলা পাসের নিচে বালতাল গ্রামের কথা আমি পড়েছি, সোনমার্গ থেকে এই বালতাল গ্রামের উপর দিয়ে জোজিলা পাস পেরিয়ে লোকে কার্গিল যাচ্ছে। কার্গিল থেকে লে।

হালদার মশাই বললেন ঃ পঞ্চতরণী এই পথের শেষ পড়াও। তের হাজার ফুট উপরে অমরনাথে তো মানুষ থাকে না, দর্শন করেই পঞ্চতরণীতে আবার ফিরে আসে। কাজেই পঞ্চতরণীতে আমাদের দু রাত্রি বাস। এই পথে আর একটি আশ্চর্যের জিনিস হল জুনিপার নামে এক রকমের ঝাউ গাছ। শুধু কাঁচা নয় ভেজা কাঠও চমৎকার জ্বলে। গাছ থেকে ভেঙে এনে উনুনে দিলেই হল। সবাই তাই করছে। পরদিন সকালে মালপত্র পঞ্চতরণীতে ফেলে আমরা

অমরনাথ যাত্রা করলুম। প্রথমে ভৈরবঘাট বা বৈরাগীঘাট পাহাড়, তারপরে অমরনাথ পাহাড়, মাঝখানে অমরাবতী নদী। বরফের পুলের উপর দিয়ে এই নদী পেরতে হয়, নিচে দিয়ে স্রোত বইছে। কেউ জুতোয় কাঁটা লাগিয়েছে, কেউ ঘাসের চাপালি বেঁধেছে জুতোর সঙ্গে, হাতে লাঠি। লাঠি ঠুকে ঠুকে খুব সন্তর্পণে আমরা নদী পেরিয়ে গেলুম। এই অমরাবতী নদী মিলেছে অমরগঙ্গার সঙ্গে। তার সাদা জল দেখে অনেকে বলেন দুধগঙ্গা। সাদা মাটি আর খড়ি পাথর ধুয়ে ধুয়ে নদীর জল হয়েছে সাদা। খানিকটা চড়াই ভেঙেই আমরা অমরনাথের বিরাট গুহা দেখতে পেলুম।

এই গুহা কত বড় তা আমি বইএ পড়েছি। চওড়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট আর পঁচিশ ফুট উঁচু। গুহার মুখ থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট তফাতে অমরনাথের লিঙ্গমূর্তি প্রায় তিন ফুট উঁচু। তার দুদিকে আরও দুটি স্তূপ আছে, তা পার্বতী ও গণেশ রূপে পূজিত।

হালদার মশাই বললেন: আমরা অমরগঙ্গায় স্নান করে বনফুল তুললুম অঞ্জলি ভরে। তারপর পুজো করলুম অমরনাথের। যাত্রীরা কেউ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কাঁদল, কেউ তুষার লিঙ্গ জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুকল তার ওপরে। জীবন সার্থক হয়েছে সকলের।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ থামলেন, তারপরে বললেন: অমরনাথের বিভূতি দিচ্ছে মুসলমানরা। চুন পাথরের গুহা, সেই চুন দিচ্ছে বিভূতি বলে। নির্বিবাদে সমস্ত হিন্দু যাত্রী মুসলমানের হাত থেকে সেই বিভূতি নিচ্ছে পরম শ্রদ্ধায়। সব দেখে শুনে বিশ্বাস হল যে দেবতার কাছে মানুষের জাত ধর্ম সত্যিই নেই, ও আমাদেরই একচেটে। নিজেদের স্বার্থেই আমরা এই বিদ্বেষ বাঁচিয়ে রেখেছি।

আমার আর একটি কথা মনে পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার কথা। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আর এখন গুহা প্রবেশ করিয়া তাঁহার বোধ হইল, যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। অসংখ্য

যাত্রী কোলাহল করিয়া দলে দলে গুহা প্রবেশ করিতেছে এবং মাথার উপরে পারাবতকুল ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িতেছে। ইত্যবসরে তিনি অলক্ষিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই তিনবার প্রণাম করিয়া লইলেন; তৎপরে পাছে ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়েন এই ভয়ে তিনি উঠিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই কয়টি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে তিনি মহাদেবের নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে আশৈশব এই অস্ফুট ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে পর্বতমধ্যস্থ কোন শিবমন্দিরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। সম্ভবতঃ তাহা এইরূপেই ব্যর্থ, অথবা সার্থক হইয়াছিল। ··

স্বামীজী এই স্থানের মাহাত্ম্যে ভরপুর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি এমন সুন্দর আর কিছু কখনও দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলিলেন, কিরূপে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। গ্রীষ্মকালের কোন এক দিনে একদল মেষপালক তাদের নিরুদ্দিষ্ট ভেড়াগুলির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে এসে পড়ে থাকবে। তারপর তারা তাদের উপত্যকাস্থ ঘরে ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে, কি করে তারা হঠাৎ মহাদেবের দর্শনলাভ করেছে, তারই বর্ণনা করে থাকবে।

আমাদের গুরুদেবের নিজের সম্বন্ধে অন্তত এইরূপ কথা বলা চলে। এই তুষার লিঙ্গের পবিত্রতা ও ধবলতা তাঁহাকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়াছিল। গুহাটি তাঁহার নিকট কৈলাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি যাবজ্জীবন মনে রাখিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ-ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।'

৩২

অমরনাথের তীর্থপ্রসঙ্গে মন আমাদের ভরে উঠেছিল। পরম পরিতৃপ্তিতে আমরা রাত্রির আহার শেষ করেছিলুম। তারপরেই সেই পরিবেশটা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সালামার কাছে দেশলাই নিয়ে হালদার মশাই একটা বিড়ি ধরিয়েছিলেন। বিড়িটা শেষ করে তিনি ফিরে যাবেন। রেলের দল ফিরে গেছে, কিন্তু এখনও তিনি তাদের পরিত্যক্ত হাউসবোটেই আছেন। নতুন ভাড়াটে এলে ছেড়ে দেবেন, এই ব্যবস্থায়। সালামা খেতে বসেছে, আমাদের শিকারায় সে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ঠিক এই সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, মনের ভিতরটা যে ছটফট করছে তা তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। গলায় বো থাকলে সেইটে ধরে তিনি টানাটানি করতেন। স্বাতি তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছিল। বলল : আসুন আসুন।

বন্দ্যোপাধ্যায় হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার করে বললেন : অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করতে এলুম। কিন্তু সত্যি বলছি, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। খুবই বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ে তাঁর বিপদের কথা আমাদের শোনালেন। গণেশবাবুকে নাকি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি তাঁর জিনিসপত্র ফেলে রেখেই সরে পড়েছেন।

আমি বললুম : তাতে বিপদ কিসের ?

বন্দ্যোপাধ্যায় কাতর স্বরে বললেন : বিপদ নয় ! তাঁর সমস্ত পাওনা যে আমাকেই মেটাতে হবে !

কেন ?

আমরা যে এক সঙ্গে ছিলুম। মার্গারেটও বলছে যে এ দেশেব এই বীতি, পুরো পাওনা না মেটালে এরা ছেড়ে দেবে না।

গভীর মনোযোগে হালদার মশাই বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখছিলেন। এবারে ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে !

বললুম : বোধহয় খ্যাংরাপটির গণেশীলালের সঙ্গে।

মনে পড়েছে। সেই হতভাগা মেড়োই পালিয়েছে বুঝি !

তাইতো বলছেন।

মুহূর্তে হালদার মশাই সোজা হয়ে বসলেন। বিড়িটায় বড় বড় দুটো টান দিয়ে বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে বললেন : তা এঁরা আপনাকে কী সাহায্য করবেন ! আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

বলে আর অপেক্ষা না করেই বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁরই শিকারায় চেপে বসলেন। আমরা কী বলব ভেবে পেলুম না।

পরদিন সকালে মিসেস চৌধুরী এলেন শম্পাকে নিয়ে. বললেন : কাল এসেআমরা ফিরে গিয়েছি। আপনারা পহলগামে গিয়েছিলেন, তাই না ? কেমন দেখলেন ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম : শুধু যাওয়া আর আসাই হয়েছে, ভাল করে কিছুই দেখা হয় নি।

মিসেস চৌধুরী বললেন : খবর পেলে আমবাও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারতুম ! কোন একটা হোটেলে দু দিন থেকে আসা যেত। আবার যাবেন আমাদের সঙ্গে ?

বলে আবার আমার দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল : যাও না গোপালদা, দু একদিন ঘুরে এস। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত দেখে আসতে পারবে।

মামা গম্ভীর মুখে তাঁর পাইপ বার করেছিলেন। অ্যাশট্রেতে

ঠুকে ঠুকে ছাই ঝাড়লেন। তারপর নতুন তামাক ভরে আগুন জ্বাললেন। মামী ঘরে ছিলেন না, কলরব শুনে বেরিয়ে এলেন। মিসেস চৌধুরীকে দেখে প্রসন্ন মুখে বললেন: আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

মিসেস চৌধুরী বিগলিত ভাবে বললেন: তাই নাকি!

মামী বললেন: আজ আপনাদের এখানে খেতে হবে, না বলতে পারবেন না।

মিসেস চৌধুরী অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন: আমাদের জন্যে শুধু শুধু কেন কষ্ট করবেন!

তারপর মেয়েকে বললেন: তাহলে শম্পা, তোমরা একটু বেড়িয়ে এস।

মামী আমার দিকে চেয়ে বললেন: বেশি দেরি কোরো না যেন।

সেদিন আমাদের ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল, বোধহয় সেই কথাই মনে করিয়ে দিলেন।

স্বাতি বলল: আজ তোমাদের একখানা ছবি তুলব।

বলে তার ক্যামেরাটা সংগ্রহ করে আনল।

মামা কোন কথা কইলেন না, স্বাতিকেও যেতে বললেন না কেউ। যেন আমাদের দুজনকেই শুধু যেতে হবে, আমাদের সঙ্গে আর কারও যাবার অধিকার নেই। শম্পার সঙ্গে আমি শিকারায় উঠলুম, আর স্বাতি হাউসবোটের সিঁড়ির উপর বসে আমাদের ছবি তুলল। বলল: অত গম্ভীর হয়ে আছ কেন গোপালদা, একটু হাসো। আপনিও একটু হাসুন।

বলে নিজে হাসল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

আমরা নেহরু পার্কের দিকে এগিয়ে গেলুম।

শম্পা এক সময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল: লোকটা যে অমন সাংঘাতিক চরিত্রের তা আমাদের জানা ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কার কথা বলছেন?

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা।

শম্পা আজ আর বন্দ্যো বলল না, বলল বন্দ্যোপাধ্যায় আগের মতো প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বলল না, বলল বিরক্তিতে নাক ও ভ্রূ কুঞ্চিত করে। আমি যেন কিছুই জানি নে এমনি ভাবে বললুম: কেন, কী করেছেন তিনি?

আপনি জানেন না তার কথা!

মিথ্যা কথা আমি বলতে পারলুম না, তাই নীরব হয়ে রইলুম।

শম্পা বলল: একটা মেম নিয়ে হাউসবোটে আছে। এমন নির্লজ্জ যে তাকে নিয়ে শিকারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল আবার কাঁদুনি গাইতে এসেছিল।

কেন?

শম্পা মুখভঙ্গি করে বলল: বিপদে পড়েছে। নেশা করিয়ে নাকি মেম তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। তার মানে আমরা বুঝি নে!

কী বললেন আপনি?

আমি আবার বলব কী! যা বলবার মা নিজেই তাকে বলে দিলেন। খুব বেঁচে গেছি।

খুশী হবার ভান করে আমি বললুম: সত্যি কথা।

ফেরার পথে শম্পা বলল: আপনাকে দেখে খুব আশ্চর্য লাগে।

কেন?

কোন বিষয়েই আপনার কৌতূহল নেই, বড় নির্বিকার ভাব আপনার।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শম্পা বলল: মা-ও তাই বলছিলেন। কেমন যেন বৈরাগীর মতো ভাব।

আমি হেসে বললুম: বৈরাগী আমি কোনদিন দেখি নি।

আমরাই কি ছাই দেখেছি! আপনার মতো নির্বিকার লোককেই নাকি বৈরাগী বলে।

বৈরাগীরা ভাল গান গায় শুনেছি, অথচ আমি গানের গ জানি নে।

শম্পা বলল : গান শুনতে যে ভালবাসেন, তা বুঝেছি।

গান শুনতে কে না ভালবাসে! দেবতারাও গন্ধর্বের গান শুনতেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তুম্বুরু গন্ধর্বের গান শুনতেন মোহিত হয়ে। দেবতাদের মধ্যে শিব, আর মুনিদের মধ্যে নারদ, এঁরাও বিখ্যাত গায়ক। পড়েন নি পুরাণে?

শম্পা আশ্চর্য হয়ে বলল : পুরাণ আবার কী?

বললুম : মহাভারত পড়েছেন?

হ্যাট্ হরিব্‌ল্ বুক! কন্‌ভেন্টে পড়বার সময় শুনেছি, একটা আন্‌সিভিলাইজ্‌ড্ নেশনের কথা। বইটা দেখেছি মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। পুওর লেডি!

বলে শম্পা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললুম : পুরাণে আরও অসভ্য লোকের কথা। কৌপীন পরা সাধু দেখেছেন তো! পুরাণের মুনি ঋষিরা গাছের বাকল পরত, আর বনের মধ্যে চোখ বুজে বসে থাকত। কন্‌ভেন্ট কাকে বলে, তাদের মেয়েরা তা জানত না।

একটু থেমে বললুম : তবে একটা জিনিস তারা জানত।

কী?

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ। পৃথিবীতে তার চেয়ে পবিত্র কিছু আছে বলে তারা ভাবতে পারত না।

নেহরু পার্কের সামনে দিয়ে আমাদের শিকারা যাচ্ছে। বড় কৃত্রিম মনে হল এই বাগানটি। বিংশ শতাব্দীর জীবনের মতো মূল্যহীন।

শম্পা আর কোন কথা কইল না।

৩৩

আমার কাশ্মীরের জীবনের উপর যে এমন অকস্মাৎ যবনিকা পড়বে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কেউই ভাবেন নি। তাই সবাই অপরিসীম বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধু স্বাতি খুশী হয়েছিল। আনন্দে উচ্ছল হয়ে আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করেছিল পরম যত্নে। চাওলার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলুম, অবিলম্বে দিল্লী ফেরবার জন্য সে অনুরোধ জানিয়েছিল। কোন দায়িত্বপূর্ণ চাকরি নিয়ে আসামে যেতে রাজী আছি কিনা, কোম্পানীর মালিক তা নিয়ে আলোচনা করতে চান। চাওলা আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে যে রাজী থাকলে দুজন মানুষের হেসে খেলে চলে যাবে। আর অদূর ভবিষ্যতে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যেও সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে যে কোম্পানী তার নিজেব নয়, কাজেই অন্য কোন রকম অনিশ্চয়তার ভয় নেই।

স্বাতি বলেছিল: আপত্তি কোরো না গোপালদা, এক কথায় রাজী হয়ে যেও। এ দিকে শম্পার সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা পাকা করে রাখব।

মামীর সামনেই স্বাতি এই কথা বলছে, আর আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। গভীর ভাবে মামা শুধু পাইপ টানছেন, কথা কইছেন না কোনও।

আজকের সন্ধ্যাই আমার কাশ্মীরের শেষ সন্ধ্যা। চিঠি পাবার পরেই স্বাতি আমাকে টুরিস্ট অফিসে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। হাতে রিটার্ন টিকিট আছে। পরের দিন সকালের জন্য রিজার্ভ করল। মামা প্লেনে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বাতি বলেছিল, তার দরকার নেই। বেশি জরুরী হলে চাওলা চিঠি না লিখে 'তার' করত।

স্বাতির যুক্তি মামা মেনে নিয়ে বলেছিলেন: কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে।

মামী বলেছিলেন: চিন্তা আবার কিসের?

আসাম থেকে বাঙালী খেদাচ্ছে, আর ওরা বাঙালী কেন পাঠাতে চাইছে বুঝতে পারছি না।

মামী বললেন: দরকার আছে বলেই পাঠাচ্ছে।

যাত্রার ব্যবস্থা করে ফিরে আসার পর মামা বলেছিলেন: একটা কথা কিন্তু মনে রেখো গোপাল, ও দেশে আশীর্বাদ কারও কাছে নিও না। শাস্ত্রে বারণ আছে।

মামী প্রশ্ন করেছিলেন: কেন?

খুব গম্ভীর ভাবে মামা বলিছিলেন: তাহলে শাস্ত্রের বিধানটাই তোমাদের বলতে হয়

আশীর্বাদং ন গৃহ্লীয়াৎ পূর্বদেশনিবাসিনঃ।
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতিবাদিনঃ॥

বলেই সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

শ্লোকের মানে মামী বুঝতে পারেন নি, তাই রেগে উঠলেন: মানেটা বলবে, না হা হা করে শুধু হাসবে!

হাসতে হাসতেই মামা বললেন: পূর্ব দেশের লোকের কাছে আশীর্বাদ কোন দিন নেবে না। 'শতায়ু ভব' এই কথাকে তারা 'হতায়ু ভব' বলে

এবারে স্বাতিও হেসে উঠল। ও দেশের লোক সত্যিই শ-কে হ বলে। কিন্তু মামী হাসলেন না। আর আমার মনে হল যে মামার হাসির উৎস তাঁর মন নয়, এটা তাঁর বাহিরের রূপ। ভিতরের কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব এই পরিহাসের আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্বাতিকে যেন আমি আর বুঝতে পারছি না।

টুরিস্ট অফিস থেকে ফেরার পথে স্বাতি আমাকে হালদার মশায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল: মিস্টার

বন্দ্যোপাধ্যায়ের খবরটা নেওয়া দরকার। ভদ্রলোক বিদেশে এসে খুবই বিপদে পড়েছেন।

একটু থেমে বলেছিল: তাঁর এই বিপদের জন্যে আমিও কতকটা দায়ী।

কেন?

গণেশবাবুকে তিনি তো চিনতেন না, আমিই পরিচয় করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু তোমার কথায় তো তিনি সেখানে যান নি, গিয়েছিলেন—

বলে থেমে গেলুম। শম্পার মতো অবলীলায় আমি মেন সাহেবের নাম করতে পারলুম না।

স্বাতি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল: বল

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললুম: স্বেচ্ছায়

স্বাতি সকৌতুকে হেসে বলল: নিজে নির্লোভ কিনা, তাই অন্যের লোভের কথা বলতেও লজ্জা পাও।

সত্যিই তাই। এই লোভ কথাটিই আমার মনে এসেছিল, কিন্তু মুখে আটকে গিয়েছিল। স্বাতির সামনে আমি লোভের কথা উচ্চারণ করতে পারি নি।

স্বাতি বলল: তুমি আজও একটা কল্পনার জগতে বাস করছ, সেখানে সব সত্য যুগের মানুষের বাস। পৃথিবী যে পালটে গেছে, সে খবর তুমি রাখো না। এ কালের মানুষ তোমাকে কী ভাবে জান?

বোকা।

এ শব্দটা খুব ভদ্র। আসল কথাটা আমার মুখে শুনলে তুমি চমকে উঠবে, আমাকেই অভদ্র ভাববে। এ যুগে বাস করেও যে আমরা আধুনিক হতে পারি নি, এই সত্য কথাটা মনে রেখো।

ডাল গেটের উপবই হালদার মশায়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক চা খাবার জন্য হাউসবোট থেকে বেরিয়েছিলেন, আর একটা বিড়ি খাবেন। এই বিড়ি ধরাবার জন্যই তাঁকে অনেক

সময় ঘরের বাহিরে বেরতে হয়। ভদ্রলোক মনের আনন্দে বিড়ি টানছিলেন, আমাদের দেখতে পান নি। স্বাতি এগিয়ে গিয়ে বলল : কোথায় গিয়েছিলেন?

এইবারে মুখ তুলে বললেন : আরে আপনারা যে!

তারপরই বললেন : এক ভাঁড় চা খেতে বেরিয়েছিলুম, আর এই বিড়িটা ধরালুম। বিড়ি ধরাবার জন্যে দেশলাই যে আজ পর্যন্ত কিনি নি, গোপালবাবু তা জানেন। বাড়িতে গিন্নীর দেশলায়ে কাজ চলে, আর বাইরে সহযাত্রীর।

স্বাতি বলল : মিসেস হালদার দেশলাই নিয়ে কী করেন?

স্বাতির প্রশ্ন শুনে হালদার মশাই হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। দূর থেকেও অনেকে দেখলেন তাকিয়ে। তারপর হাসি থামলে বললেন : মিসেস হালদারই বটে। এবার একটা ঠোঁটে মাখা সিঁদুর-কাঠি কিনে নিয়ে যাব।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

হালদার মশাই বললেন : এর পরে কলকাতায় এলে এক দিন গরিবের বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যাব। আমাদের প্রথম পেশাটা গিন্নীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছি। জানেন তো আমাদের পেশার কথা?

আমি বললুম : না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন : সেকি, ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের পেশা আপনি জানেন না! আমাদের পেশা তিনটি—উনুনে ফুঁ, শাঁখে ফুঁ, আর কানে ফুঁ। উনুনে ফুঁএর কাজটা গিন্নীর ঘাড়ে চাপিয়েছি। তার জন্যেই তিনি একটা দেশলাই রাখেন।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি হেসে বললুম : ভাল দুটোই নিজের হাতে রেখেছেন দেখছি।

হালদার মশাই হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে বললেন : ভাল আর আছে

কোথায় বলুন! ঘণ্টা নেড়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে তো আজকাল পেট ভরে না, আর কানে ফুঁ দিয়ে মন্তর দিচ্ছে যত সব মঠের ভণ্ডরা।

আমি বাধা দিয়ে বললুম : সাধু সন্ন্যাসীদের ভণ্ড বলছেন কেন?

আমি বললেই দোষ। কিন্তু কল্কিপুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী তো আপনি গেরুয়ার খাতিরে মিথ্যা বলতে পারবেন না!

স্বাতি বলল : কল্কিপুরাণ কী বলেছে?

সংস্কৃত শ্লোক আমার মনে থাকে না। তবে শঠ আর মঠ-নিবাসীকে যে এক গোত্রে ফেলেছে তা মনে আছে।

হালদার মশায়ের এই মন্তব্য আমার কাছে বেদনাদায়ক মনে হল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। অকারণে আরও অনেক অপ্রিয় কথা বলবেন, তাই আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

ডাল লেকের ধারে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছিলুম।

স্বাতি বলল : আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

হালদার মশাই বললেন : যাচ্ছিলুম একবার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কলকাতা থেকে কোন টাকা এল কিনা সেই খবর নিতে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাঁর বাড়িতে 'তার' করেছেন?

পাগল হয়েছেন! ঐ হতভাগা মেড়োর টাকা দিয়েই আমি তার দেনা শুধব। তার বাপের কাছেই 'তার' করেছি।

বলে সাড়ম্বরে তাঁর ফন্দীর কথা ঘোষণা করলেন। গণেশের অসুখ বলে তার বাপ চমনলালের কাছে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করেছেন, সেণ্ডার গণেশ। গণেশ নিজেই যেন নিজের অসুখের কথা বাপকে জানিয়েছে। হয় টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে টাকা আসবে, নয় কেউ টাকা নিয়ে উড়ে আসবে। হাউসবোটের মালিক বলেছে যে তাতে অসুবিধা হবে না। টাকা এলে পোস্ট অফিস থেকে পাইয়ে দেবে; গণেশের নামে সই করে নিলেই হল। আর সামান্য

কিছু নমস্কারী, যেমন রেট আছে। যদি কোন লোক আসে, তাহলে হাউসবোটের মালিকই তাকে সামলাবে। টুরিস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে নিজের পাওনা সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেবে, মেম সাহেবকেও পাইয়ে দেবে তার টাকা।

আমি বললুম: ওর বাবা যদি কিছুই না করে?

হালদার মশাই বললেন: তারও একটা উপায় ঠাওরেছি। মগের মুল্লুক তো নয় যে যা চাইবে তাই দিতে হবে। বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে টুরিস্ট অফিসারের সঙ্গে গোপনে দেখা করেছি। সে ভদ্রলোক সুবিচার করবেন বলে ভরসা দিয়েছেন। দরকার হলে আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

স্বাতি বলে উঠল: গোপালদা তো কাল ভোর বেলাতেই পালিয়ে যাচ্ছে।

হালদার মশাই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন: তাই নাকি!

স্বাতি বলল: দিল্লী থেকে ডাক এসেছে, ওরা কনে দেখবে।

হালদার মশাই হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন: হোক হোক, একটা ভাল চাকরি হোক গোপালবাবুর। পাত পাড়বার জন্যে আমরা জোলাপ নিয়ে বসে আছি।

বলে পরম কৌতুকে তাকালেন স্বাতির দিকে।

স্বাতি বলল: আজ রাতেই আমরা গোপালদাকে টুরিস্ট অফিসের একটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব। ডাল লেক থেকে অত ভোরে উঠে বাস ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়।

হালদার মশাই বললেন: রাতে তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারবেন।

৩৪

কিন্তু রাতে আমি ঘুমতে পারলুম না।

এমন সুন্দর সাজানো ঘর, এমন আরামদায়ক শয্যা, এমন নির্জন শান্ত পরিবেশেও আমার ঘুম এল না। টুরিস্ট রিসেপ্‌শন সেণ্টাবের বিরাট প্রাঙ্গণে পাশাপাশি দুতিনখানি বাড়ি আছে। তারই একখানির দোতলায় আমি স্থান পেয়েছিলুম। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। মেঝেয় তার দামী কার্পেট বিছানো। কাশ্মীরী কার্পেট, দু আড়াই হাজার টাকা তার দাম। খাটের উপরে মোটা ডানলপিলো গদি, ধপধপে ফর্সা বিছানা। বাতি নিবিয়ে পাখা চালিয়ে আমি শুয়েছিলুম। কিন্তু মনে হয়েছে যে সারা রাত আমাকে মশা আর ছারপোকা কামড়েছে। দু পা জ্বালা করেছে, মাথা গবম হয়ে উঠেছে, ঘুম আসে নি এক মুহূর্তের জন্য।

রাতে খাবার পরে মামা মামী আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাতি এসেছিল সঙ্গে। আমার ঘর দেখে মামী খুশী হয়ে প্রশংসা করেছিলেন ব্যবস্থার। বলেছিলেন ঃ এই ভাল হল, শেষ রাতে ওঠবার জন্যে রাত জাগতে হবে না।

শ্রীনগর থেকে ফেরার যাত্রীদের নিশ্চিন্তে ঘুমোবার উপায় নেই। সকাল সাতটার মধ্যেই সব বাস ছেড়ে যায়, তার জন্যে এক ঘণ্টা আগে হাজিরা দিতে হয়। টিকিট থাকলেই বাসে ওঠা যায় না, তার কারণ বাসের নম্বর আর সীটের নম্বর নেই। সঙ্গের মালপত্র বুক করার পর সেই নম্বর পাওয়া যায় মাল না থাকলেও টিকিট দেখিয়ে ছাড়পত্র নিতে হয়। তাই দূরে থাকার সমস্যা আছে। ডাল লেকের হাউসবোটে থাকলে জল পেরোবার জন্য শিকারা চাই, তারপর টাঙ্গা, মালপত্র বেশি হলে কুলিরও সমস্যা। অবশ্য

হোটেলওয়ালা বা হাউসবোটের মালিকেরা এ সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি থাকেন। টাঙ্গাওয়ালারা নাকি নির্ভরযোগ্য, বলে রাখলে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির থাকে। শিকারার ভার নেন হাউসবোটের মালিকেরাই। সালামা আমাকে সাহস দিয়ে বলেছিল যে আমার কোন ভাবনা নেই। অনেক যাত্রীকে সে সময় মতো জাগিয়ে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে বিদায় করেছে, আমার জন্যেও করবে। বলেছিল যে তাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, নির্ভর করতে পারি তার দায়িত্ব জ্ঞানের উপর। স্বাতি বলেছিল: না, টুরিস্ট সেণ্টারে থাকাই নিরাপদ। তার আগ্রহেই আমাকে রাতে এই ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ঘরের সঙ্গে বাথরুম আছে। পরিষ্কার ঝকঝক করছে মেঝে। জলের অভাব নেই। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়ে মামী বলেছিলেন: যাবার সময় আমরাও এমনি একটা ঘরে এসে থাকব।

কিন্তু তবু আমি রাতে ঘুমতে পারি নি। এক রকমের অদ্ভুত যন্ত্রণায় আমার ঘুম আসে নি। মামা মামীকে আমার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে স্বাতিকে। শম্পা মিসেস চৌধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও হালদার মশাই—তাঁদের কথাও মনে পড়েছে। তাঁরা সকলেই শ্রীনগরে রইলেন, আরও কিছুদিন তাঁরা এখানে থাকবেন। শুধু আমি ফিরে চলেছি। আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে।

কাল রাতে হাউসবোটে ফিরে যাবার জন্য মামা মামী যখন উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁদের প্রণাম করলুম। মামা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই বললেন: কিছু টাকা তোমার সঙ্গে রাখো।

বলে নিজের পকেটে হাত দিলেন।

স্বাতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলে উঠল: তার দরকার হবে না বাবা। আমার স্কলারশিপের কিছু টাকা গোপালদার কাছে জমা রাখছি, পরে চেয়ে নেব।

বলে একখানা সাদা খাম আমার পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজে দিল।

আমি কিছু বলবার সময় পেলুম না, প্রতিবাদ করবার কথা ভুলে গেলুম। স্বাতির হাতের স্পর্শে আমার চেতনা বুঝি মুহূর্তের জন্য লোপ পেয়েছিল।

আমি তখন জেগে ছিলুম, না ঘুমিয়ে ছিলুম জানি নে, দরজার উপর মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনে উঠে বসলুম। তারপর আর একবার করাঘাত শুনেই বুঝতে পারলুম যে ভুল শুনি নি। ঘরের বাতি জ্বেলে দরজার খিল খুলে দিলুম।

পৃথিবীর আকাশ তখনও অন্ধকার, কিন্তু আমার আকাশ এক মুহূর্তে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। প্রসন্ন হাসি নিয়ে স্বাতি এসেছে আমার দুয়ারে। একা নয়, সালামাও সঙ্গে এসেছে, সলজ্জায় সে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কিছু বলবার আগেই স্বাতি বলল: অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

বললুম: তোমায় দেখে।

আমি না এলে যে সব গোলমাল হয়ে যেত! সারা রাত জেগে ভোর বেলাতেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। ওধারে এরই মধ্যে অসংখ্য লোক জমে গেছে।

স্বাতি ঘরে এল। সালামাও ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর একটা সঙ্গে আনা চায়ের সরঞ্জাম রাখল। তারপরে আমাকে বলল: টিকিটটা দিন, আমি গিয়ে লাইন দিচ্ছি।

সেই সঙ্কোচ, সেই আধো আধো হিন্দী কথা। অত বড় মানুষটার আচরণ ঠিক শিশুর মতো। আমি আমার টিকিটটা তাকে বার করে দিলুম। কৃতার্থ হয়ে সালামা বেরিয়ে গেল।

স্বাতি বলল: মুখ ধুয়ে তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি অপেক্ষা করছি।

চা ঢালতে গিয়ে স্বাতি আশ্চর্য হল। দুটো পেয়ালায় দুজনের চা এসেছে, চা আর খাবার। বলল: সালামা কাল রাতে

বলেছিল, বাস ছাড়বার আগে রেস্তোরাঁ খোলে না। যাত্রীদের ভারি কষ্ট। তারই ইচ্ছায় এই ব্যবস্থা হয়েছে।

চা খেতে খেতে আমি বললুম: বুঝেছি।

স্বাতি বলল: কী বুঝেছ?

আমাকে চা খাওয়াবার জন্যে তুমি আস নি। সালামা আসতে চেয়েছিল, তাই একটু বেড়িয়ে গেলে।

স্বাতি হাসল, কোন উত্তর দিল না। তার এই মিষ্টি হাসি আমি অনেকবার দেখেছি। এই হাসিতে তার অনেক কথা আছে, যে সব কথা মুখে বলা যায় না। অথচ এই হাসি দিয়েই সে সব কথা আমাকে বুঝিয়ে দেয়।

আমরা দুজনে এক সঙ্গে চা খেলুম। তারপর সব গুছিয়ে নিলুম। স্বাতি চায়ের সরঞ্জাম নিল, আমি নিলুম আমার ঝোলাঝুলি।

নিচে নেমে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। টুরিস্ট সেণ্টারের বাঁধানো প্রাঙ্গণে যেন রথের মেলা বসেছে। এক দিকে অসংখ্য বাস, অন্য দিকে লোকে লোকারণ্য। টিনের চালার নিচে তিল ধারণের স্থান নেই। প্রচণ্ড কলরব, প্রবল ভাবে ঠেলাঠেলি হচ্ছে। বাচ্চাদের নিয়ে মহিলারা একটু তফাতে থাকবার চেষ্টা করেও ধাক্কাধাক্কি খাচ্ছেন, পুরুষেরা যুদ্ধ করছেন হাতে টিকিট নিয়ে। তিন চারটে কোম্পানীর বাস ছাড়বে একই সময়ে, সমস্ত যাত্রী এক সঙ্গে সমবেত হয়েছেন। যারা বুকিং করবে, তারা বোধহয় দেরিতে এসেছে। কোন নাম লেখা কাউণ্টার নেই, কোন কিউ হয় নি, কোন নির্দেশ না পেয়ে যাত্রীরা একেবারে বন্য হয়ে উঠেছেন।

আমি সালামার খোঁজে একটু ভিতরে যাবার চেষ্টা করেছিলুম। স্বাতি বলল: ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যেও না যেন।

বলে হাসল। সেই মিষ্টি হাসি। মনে হল, সে আমাকে এই শ্রীনগরের ভিড়ের কথা বলছে না, বলছে পৃথিবীর ভিড়ের কথা। পৃথিবীর মানুষের ভিড়ে আমার হারিয়ে যাওয়া চলবে না।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই হালদার মশায়ের গলা শুনলুম। সহাস্যে তিনি বললেন: ভিড়ের ভেতর হারিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা পারবেন না। লক্ষ লোকের ভিড়েও আমি আপনাদের ঠিক খুঁজে পাব।

টিকিটের ব্যবস্থা করে সালামা ফিরে এল। তার হাত থেকে টিকিট নিয়ে স্বাতি অন্য কিছু গুঁজে দিল। বলল: তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা কর, আমি হালদার মশায়ের সঙ্গে ফিরব।

হালদার মশাই হেঁ হেঁ করে হাসলেন, তারপরে বললেন: এর পরে আমি আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসব না।

*

কাশ্মীর পর্ব সমাপ্ত

*

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বে তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুস্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর কেরল পর্বে তাঁদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্নাকুলম কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে কালিন্দী পর্বে। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জীর সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি রাজস্থান পর্বে। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে সৌরাষ্ট্র পর্বে। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ কোঙ্কণ পর্বেও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সান্নিধ্যলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।